এই সংকলনের লেখাগুলো ভাষা ও সমাজের সম্পৃক্ততাকে তিনটি মাত্রা (dimension) ধরে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। সেই মাত্রাগুলি হল:

- তথ্য: ভাষাবৈচিত্র্য, ভাষাবিলোপ, জৈবিক-প্রাকৃতিক সংকট, জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতির সংকট সম্পর্কিত তথ্য, যার কিছুটা আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানে পাওয়া, আর বাকি বেশির ভাগটাই বিশ্বজুড়ে সমাজভাষাতাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবিদদের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল হিসেবে পাওয়া।
- তত্ত্ব: তথ্য চিহ্নিত করা ও তথ্যাবলী থেকে ঘটমান বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করার জন্য আবশ্যক যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের অনুসন্ধান। সমাজদেহ ও ভাষাদেহ, উভয়ের বিবিধ স্তর-ধাপ-ফাটল বরাবর ক্ষমতা (power) কীভাবে উৎপন্ন, প্রবাহিত ও প্রসারিত হয়, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সক্রিয়তাকে তা কীভাবে প্রভাবিত বা নির্দ্ধারিত করে, তত্ত্ব-অনুসন্ধান এই প্রশ্নগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।
- অভিজ্ঞতা: ভাষাবিলোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাষিক পুনরুজ্জীবন, জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতি বিলোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজ গোষ্ঠীগত জ্ঞানপরম্পরায় শিকড় ছড়িয়ে বিশ্বের আকাশে ডালপালা মেলে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসী অস্তিত্ব গঠনের প্রয়াস যেখানে যতটুকু চোখে পড়েছে, তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা। কারণ, শেষাবধি এহেন সক্রিয়তাই আমাদের লক্ষ্য।

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

ভাষার সামাজিকতা
তথ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞতা

সম্পাদনা :
সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

ভাষার সামাজিকতা
তথ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞতা

‘মাতৃভাষা’-র দশ বছরের অর্জন
সংকলন: ১

সম্পাদনা :
সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

‘মাতৃভাষা’-র দশ বছরের অর্জন সংকলন: ১

ভাষার সামাজিকতা:
তথ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞতা

‘মাতৃভাষা’-র দশ বছরের অর্জন সংকলন: ১

ভাষার সামাজিকতা: তথ্য-তত্ত্ব-অভিজ্ঞতা

সম্পাদনা
সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২৫

সম্পাদনা
সজল রায়চৌধুরী
বিপ্লব নায়ক

প্রকাশক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড
কলকাতা ৭০০০৪৭

প্রচ্ছদ
ইন্দ্রনাথ মজুমদার

অক্ষর ও পৃষ্ঠাবিন্যাস
সত্যজিৎ দাস

মুদ্রণ ও বাঁধাই
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি.
১৪৩ ওল্ড যশোর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা ৭০০১৩২

মূল্য : ??? টাকা

সূচি

সম্পাদকীয়-১: 'মাতৃভাষা'-র পথচলা	৭	সজল রায়চৌধুরী
সম্পাদকীয়-২: বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে	৯	বিপ্লব নায়ক
ভাষা ও লোকজীবন: প্রমিতি বনাম প্রবহমানতা	১১	বিপ্লব নায়ক
ভাষার স্বাস্থ্য কীভাবে বুঝব	৩৩	সজল রায়চৌধুরী
কর্ণাটকে মাতৃভাষা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০১৩, ২০১৪)	৪৯	অনু. বিপ্লব নায়ক
শিক্ষার ভাষামাধ্যম, ভাষা শিক্ষা ও 'স্বাধীনতা'-র অধিকার সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আলোচনা	৬৯	বিপ্লব নায়ক
ভাষিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবস্থান ও অবয়ব পরিকল্পনা	৯২	সজল রায়চৌধুরী
ভাষাবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য ও 'সভ্যতা'র আস্ফালন	১০৪	বিপ্লব নায়ক
ভাষাক্ষতের খতিয়ান: ভারতের বিপন্ন ভাষাদের একটি প্রাথমিক তালিকা	১১৮	বিপ্লব নায়ক
আদিবাসীদের ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের উপায় কী?	১৪০	অনওয়া ম্যাকাইভর
ভাষা-সাম্য ও বহুত্ব প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাসূত্র	১৫৫	বিপ্লব নায়ক
ভাষিক মানবাধিকার ও শিক্ষা	১৬৬	আলমা ফ্লোর আদা
ইংরেজি পড়ে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে?	১৭৫	বিপ্লব নায়ক
ভাষা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কী হারিয়ে যায়?	১৮৪	জোশুয়া ফিশম্যান

বৈচিত্র্যের জন্য লিখন	২০৮	ন্‌গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো
আত্মহননের বহুৎসব ও জাতি-রাষ্ট্রের কারাগার	২১৮	বিপ্লব নায়ক
ভাষা ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় রোধের জন্য জনজাতীয় জ্ঞানের গুরুত্ব	২৩৩	বেঞ্জামিন টি. ওয়াইলডার, ক্যারোলিন ও' মিয়ারা, লরি মন্টি ও গ্যারি পল নাভান
বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনা: কিছু উপাত্ত	২৫৭	আনদনি বাররেনা, ইতজিয়ার ইদিয়াজাবাল, পাতহি জুয়ারিস্তি, কারমে জুনিয়েন্ট, পল ওরতেগা, বেলেন উরাঙ্গা
ভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু ভাবনা	২৭১	সমীর কর্মকার

সম্পাদকীয়-১

‘মাতৃভাষা’-র পথচলা

‘মাতৃভাষা’ পত্রিকার দশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৪ সালে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে ‘ভাষিক মানবাধিকার রক্ষার’ এই কাজটি আমরা কয়েকজন বন্ধু প্রকাশ করি। প্রদীপ জ্বালার সলতে পাকানোর একটা পর্বও আমরা ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি। ‘ভাষা শহিদ স্মারক সমিতি’ নামে একটি সংগঠনে আমরা কয়েকজন যুক্ত ছিলাম। সবাই নয়। এই সংগঠনে বাংলার সাহিত্য ও শিল্প জগতের দিকপাল মানুষরা ছিলেন। বাংলাভাষার বঞ্চনার বিরুদ্ধেই ছিল সংঘের অভিমুখ। জেলায় জেলায় শাখা গড়ে ওঠে। উজ্জ্বল তারকাখচিত ‘বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব’ বছর বছর অনুষ্ঠিত হয়। সাইনবোর্ড হোর্ডিংয়ে বাংলা অক্ষরও মর্যাদার সঙ্গে রাখতে হবে, এই দাবিতে পথেও নামা হয়। কুশীলব ও অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতা থাকলেও তাত্ত্বিক উপলব্ধি আমাদের ছিল অগভীর। কেন ভাষাগুলো মান হারায়? কেন লুপ্ত হয়? কীভাবে ভাষা সংরক্ষণ করা যায়? ভাষা হারিয়ে গেলে সেই গোষ্ঠীর মানুষ কী হারায়, বিশ্ব সংস্কৃতি কী হারায়? এসব প্রশ্ন কোনোদিন সামনে আসেনি। অনুষ্ঠানের সাময়িক ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে ভেতরের শূন্যতা কিছুদিন চাপা ছিল। পরে ভাঙনের শব্দ ওঠে। মুড়মুড় করে আপাত বিশাল ধাঁচাটা ভেঙে যায়। সলতে হয়তো পাকানো হয়েছিল। কিন্তু ‘জ্বলেনি আলো অন্ধকারে’।

ইতিমধ্যে ডেভিড ক্রিস্টালের ‘ল্যাঙ্গোয়েজ ডেথ’ বইটা আমাকে খুব নাড়া দিয়ে যায়। অনুপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বই ‘মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গোয়েজ’ প্রকাশিত হয়েছে একটু আগেই। অরূপ দত্তও নতুন কিছু করতে চাইছিলেন। এই তিনজন মিলে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। প্রথম সংখ্যা থেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু উদ্যমী যুবক বিপ্লব নায়ক।

আমরা পত্রিকার দৃষ্টিকোণ হিসেবে একটা ঘোষণা তৈরি করি। প্রথম সংখ্যা থেকেই সেটি প্রতি সংখ্যার চতুর্থ প্রচ্ছদে ছাপা হয়ে এসেছে। সমাজভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তি ও

পৃথিবীর নানা প্রান্তের ভাষিক মানবাধিকারের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে যেভাবে পৌঁছেছে তাকে অবলম্বন করে এই ইশতাহারটি তৈরি হয়েছিল। আমরা বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সামগ্রিকতার দিক থেকে দেখার কথা বলি। 'বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নটি আজ এক বিশ্বমাতৃভাষার বিপন্নতার অংশ হিসেবে দেখতে হবে। তাই ভারতের বিপন্নতর মাতৃভাষাগুলোর জন্য সোচ্চার হতে হবে। ভাষার অধিকার রক্ষা অনেকাংশেই নিম্নবর্গের ক্ষমতায়নের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং ভাষা রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রশ্নটির সম্মুখীন হতেই হবে।'

এই সংকল্প নিয়ে পাঁচ বছর ডিঙ্গা চলল। প্রতি সপ্তাহে একদিন পত্রিকার খোলামেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক। দু-মাস একটা করে সারাদিনবাপী ভাষাবৈঠক। বইমেলাগুলোতে পত্রিকার স্টল দেওয়া। ডাকযোগে পত্রিকা পাওয়ার ব্যবস্থা। জনজাতিদের ভাষা সম্বন্ধে পত্রিকার পাতায় গুরুত্ব দিয়ে লেখা ছাপানো। জনজাতিজীবন সম্বন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ। সবই চলছিল। তবে অনুভব করছিলাম পত্রিকার ভাবধারায় পাঠকদের মানসিক সংযুক্তি কমে আসছে।

পত্রিকাও ভাষিক অধিকারের প্রশ্নের গণ্ডী ছাড়িয়ে সাধারণভাবে ক্ষমতার প্রশ্ন, ক্ষমতার দর্শন, উন্নয়নের দর্শন, হিংসা-অহিংসার প্রশ্নে ডানা মেলেছে। সেটা পাঠকসাধারণের পক্ষে দুষ্পাচ্য লেগেছে কিনা যাচাই করে দেখা হয়নি।

পৃথিবীর কোথাও ভাষিক মানবাধিকারের আন্দোলনের বড়ো মাপের কোনো বিজয় দেখা যাচ্ছে না। বিপুল সাহায্যভাণ্ডার, সরকারি সহায়তা স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলী— সব কিছু থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া ভাষিক পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায়নি। এক বৈচিত্র্যবিনাশী ক্ষমতাতন্ত্র ও মোহগ্রস্ত অক্ষমের বাতাবরণে 'মাতৃভাষা' অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে।

তবুও আমরা হাল ছাড়িনি। পত্রিকা ও প্রকাশনা চালিয়ে যেতে চাইছি। শুধু আকার প্রকারের কিছুটা বদল আনছি। প্রকাশনা থাকছে। পত্রিকাটা সংকলন আকারে পুস্তকের চেহারায় মাঝে মাঝে বেরোবে। বর্তমান সংকলনটি একাদশ বর্ষ প্রথম সংকলন হিসেবে গণ্য হবে।

এই সংকলনে দেশ-বিদেশের ভাষাভাবুকদের সমাজভাষা সংক্রান্ত কিছু লেখা সংকলিত হল। এগুলো গত দশ বছর ধরে 'মাতৃভাষা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। এবার দু-মলাটের মধ্যে একসঙ্গে পেয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকরা উপকৃত হতে পারেন।

সজল রায়চৌধুরী

সম্পাদকীয়-২

বর্তমান সংকলন প্রসঙ্গে

অস্তিত্বের বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্ততায় ভাষা ও সমাজ বিভিন্নভাবেই পরস্পর-সম্পৃক্ত। আলাদা-আলাদা ভাবে যদি ভাষা ও সমাজকে বিমূর্তায়িত করে গণ্য করা হয়, তাহলেও ভাষা ও সমাজ উভয়েরই কোনো সমসত্ত্ব রূপ অসম্ভব। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন সমাজ যেমন একে-অপরের সঙ্গে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের চির-জায়মান নকশাজালে অবস্থিত, সখ্য ও বিরোধের চিরচঞ্চল সম্পর্কে গ্রথিত; তেমনই, একটি কোনো ভাষা ও একটি কোনো সমাজও তার নিজ অভ্যন্তরে বিবিধ স্তর, ধাপ, গহ্বর ধারণ করে পার্থক্য-বৈচিত্র্য-সখ্য-বিরোধ-এর টানাপোড়েনে বিন্যস্ত। ভাষাগত ও সমাজগত এই বৈচিত্র্যবিন্যাসকে পরস্পর-সম্পৃক্ততায় বিচার করলে দেশ-কাল-প্রেক্ষাপট জুড়ে জায়মান সম্পর্কসমূহের যে লেখচিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা যেমন ভাষা ও সমাজ নামক এই দুই প্রতীতিকে আরো গভীরে গিয়ে বুঝতে সাহায্য করে, তেমনই ভাষা ও সমাজের বিভিন্ন ফাটল বরাবর সংকটরেখাগুলোকেও স্পষ্ট করে তোলে। আমাদের বর্তমানতায়, এহেন সংকটরেখাগুলো ভাষাবিলোপ, জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতি বিলোপ এবং জীবপ্রজাতির বিলোপের মধ্য দিয়ে জানান দিচ্ছে। 'মাতৃভাষা' পত্রিকার দশ বছরের যাত্রায় শুরু থেকেই আমাদের মনোযোগ এই প্রকৃতি-সমাজ-ভাষা-দেহের ফাটল বরাবর সংকটরেখাগুলোর উপর নিবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন ভাবে আমরা খুঁজতে চেয়েছি, বুঝতে চেয়েছি কীভাবে এই সংকট আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্নতার মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে আর সংকটমোচনের লক্ষ্যে সক্রিয়তার প্রকরণের অনুসন্ধান করতে চেয়েছি, সাধ্যমতো চর্চাও করতে চেয়েছি। 'মাতৃভাষা-র দশ বছরের অর্জন' সূচক সংকলনের প্রথম খণ্ডে তাই আমরা এই বিষয়ে গত দশ বছর ধরে গড়ে ওঠা আমাদের ভাবনাচিন্তা-অর্জন-গুলোকেই সংকলিত করতে চেয়েছি।

এই সংকলনের লেখাগুলো ভাষা ও সমাজের সম্পৃক্ততাকে তিনটি মাত্রা (dimension) ধরে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। সেই মাত্রাগুলি হল:

- তথ্য: ভাষাবৈচিত্র্য, ভাষাবিলোপ, জৈবিক-প্রাকৃতিক সংকট, জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতির সংকট সম্পর্কিত তথ্য, যার কিছুটা আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানে পাওয়া, আর বাকি বেশির ভাগটাই বিশ্বজুড়ে সমাজভাষাতাত্ত্বিক ও প্রকৃতিবিদদের বিভিন্ন ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল হিসেবে পাওয়া।
- তত্ত্ব: তথ্য চিহ্নিত করা ও তথ্যাবলী থেকে ঘটমান বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা নির্মাণ করার জন্য আবশ্যক যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বের অনুসন্ধান। সমাজদেহ ও ভাষাদেহ, উভয়ের বিবিধ স্তর-ধাপ-ফাটল বরাবর ক্ষমতা (power) কীভাবে উৎপন্ন, প্রবাহিত ও প্রসারিত হয়, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সক্রিয়তাকে তা কীভাবে প্রভাবিত বা নির্দ্ধারিত করে, তত্ত্ব-অনুসন্ধান এই প্রশ্নগুলোকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে।
- অভিজ্ঞতা: ভাষাবিলোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাষিক পুনরুজ্জীবন, জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতি বিলোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজ গোষ্ঠীগত জ্ঞানপরম্পরায় শিকড় ছড়িয়ে বিশ্বের আকাশে ডালপালা মেলে দেওয়ার আত্মবিশ্বাসী অস্তিত্ব গঠনের প্রয়াস যেখানে যতটুকু চোখে পড়েছে, তার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা নেওয়ার চেষ্টা। কারণ, শেষাবধি এহেন সক্রিয়তাই আমাদের লক্ষ্য।

দশ বছরের অর্জনের এই সংকলন সম্পাদনা করার মধ্য দিয়ে 'মাতৃভাষা'-র কর্মী হয়ে পথ চলা আমাদের গুটিকয়েকজনের কাছে নিজেদের কাজের ভাবনা-অবস্থান-লক্ষ্য-কে আর একবার নিজেদের কাছে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে। পথ চলতে চলতে অভাবিত আকস্মিক নানা ঘটমানতার অভিঘাত ভাবনাকে আচ্ছন্ন করে, অবস্থান গুলিয়ে দেয়, লক্ষ্য সরিয়ে দেয়—তাই, আমাদের জন্য এটা প্রয়োজন ছিল। আগামীদিনে পথ-হাঁটার ধরন-ধারণ হয়তো আর ঠিক আগের মতো থাকবে না, কিন্তু তা এই সারসংকলিত অর্জন থেকেই উৎসারিত হবে।

আর 'মাতৃভাষা'-র যে পাঠক ও সঙ্গীরা এই দশ বছর ধরে নানাভাবে সমর্থন/বিরোধিতা সমালোচনা/প্রশংসা করে সঙ্গে থাকার মধ্য দিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্কের গাঁটছড়াটাও আবার এর মধ্য দিয়ে নতুনভাবে বাঁধা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। দশ বছর পার করে পুনর্বিচার/পুনর্বিবেচনা করে নেওয়ার জন্য আমরা একটু থমকে দাঁড়িয়েছি। এমন সংকলনের আরো দুটো খণ্ড (যাদের বিষয়মুখ ভিন্ন) আমরা প্রকাশ করব। তারপর আবার কোমর বেঁধে নতুনভাবে হাঁটতে শুরু করব। সঙ্গীসাথীর অভাব হবে না বিশ্বাস করি।

৩০/১২/২০২৪ **বিপ্লব নায়ক**

ভাষা ও লোকজীবন: প্রমিতি বনাম প্রবহমানতা

বিপ্লব নায়ক

প্রথম পর্ব

ভাষার কারাগার, ভাষার মুক্তক্ষেত্র

কবীরের দোহার পদ দিয়ে শুরু করা যাক:

> সংস্কৃত কুপজল কবীরা ভাষা বহতা নীর।
> জব চাহৌ তবহি ডুবৌ শান্ত হোয় শরীর।।[১]

এই দোহার কথা আমাদের বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করলে দাঁড়ায়:

> হে কবীর, সংস্কৃত হল কুয়োর জল (বা গর্তে বন্দি জল)। খুঁড়তে খুঁড়তে জল পাওয়ার আগেই সময় (বা উদ্যম) ফুরিয়ে আসে। জল পেলেও, সে ওই এক ঘটি তোল আর ব্যবহার কর—তাতে গা ভাসিয়ে, দেহ ডুবিয়ে তলিয়ে যাওয়ার সুখ নেই। 'ভাষা' অর্থাৎ প্রাকৃত কথ্য ভাষা হল অনায়াস-লভ্য 'বহতা নীর' (বা বহমান জলস্রোত)। তা প্রবহমান, কাজেই নির্মল, নির্দোষ। তাতে দেহ ডুবাও, দেহ ভাসাও, যা খুশি কর। কোনো কাজ না থাকলেও তার গীত, ভাষার সঙ্গীত, তার তীরে বসে শোন। কুয়োয় (কূপে) তো এসব চলবে না।

কবীরের অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশভঙ্গিতে এখানে ব্যক্ত হয়েছে একটি বোধ: সংস্কৃত ভাষা কারাগার আর প্রাকৃত কথ্য ভাষা মুক্তক্ষেত্র। এই বোধ অবশ্য কেবল কবীরের একান্ত নয়, কবীরের হাজার হাজার বছর আগে থেকেই সাধারণ

প্রাকৃতজনের বোধ এইটি। কীভাবে এই বোধের জন্ম? কীভাবে সংস্কৃতের নির্মিতি একটি ভাষা-কারাগার হিসেবে? সেই অতীতে চোখ ফেরানো যাক।

বেদ পরবর্তী যুগে জৈমিনি, পাণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণেরা ভাষার যে প্রমিত রূপ নির্ধারণ করেছিলেন পণ্ডিত ও সুধীজনদের ব্যবহার, বিশেষত লেখার কাজে ব্যবহারের জন্য, তাই-ই হল সংস্কৃত। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের লেখনীতে আমরা পাই:

> ...বর্ষীয়সী ভাষা 'সংস্কৃত' নামে অভিহিত হইবার পূর্বে যে ইহার একটি রূপ বা আকৃতি ছিল তাহা নিঃসংকোচে বলা যাইতে পারে।... অনুমান হয়, সে সময়ে সংস্কৃতের এই ভূতপূর্ব মূর্তির নানারূপ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতে থাকে, যে সময় তদানীন্তন সমাজবিশেষে প্রচলিত শব্দসমূহের অনুশাসনের আবশ্যকতা মানবের চিন্তারাজ্য অধিকার করিতে থাকে, যে সময় যদৃচ্ছ ব্যবহৃত শব্দসমন্বিত ভাষার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কথিত ও লিখিত ভাষা-এতদুভয়ের পার্থক্য ভারতীয়গণ (পূর্বাচার্যগণ) ভাবিতে থাকেন, মনে হয় সেই সময়েই এই ভাষা 'সংস্কৃত' নামে আখ্যাত হয় এবং এই অবসরে ভারতবাসীদিগের প্রথম ব্যাকরণের জন্মলাভ হয়।[২]

এই বিদুষী অনুমানের অনুবর্তী হলে আমরা দেখতে পাই যে তৎকালীন লোকজীবনে প্রচলিত কথ্য ভাষার বিভিন্ন 'বৈলক্ষণ্য' 'অনুশাসন'-এর মাধ্যমে রদ করে ভদ্রকথন ও লিখনের জন্য একটি সু-সংস্কৃত রূপ গঠনের চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা থেকেই সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণের জন্ম। ভাষা-সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রমিত একটি ভাষারূপ গঠনের এই প্রচেষ্টা লোকজীবন- উদ্ভূত ভাষাসমূহের মধ্য থেকেই তো তার উপাদানসমূহ নিয়েছিল, কিন্তু লোকজীবন ও লোকজীবনের ভাষার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী দাঁড়াল?

ক্রমশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাকে ভাষার এক এবং একমাত্র শুদ্ধ রূপ বলে দাবি করতে থাকেন। তাঁরা দাবি করেন যে একমাত্র সংস্কৃত শব্দের সঙ্গেই অর্থের সম্পর্ক 'অনাদি'। জৈমিনির পূর্বমীমাংসার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ভাষ্যকার শবরস্বামীর মতে:

> মহাপ্রযত্নে শব্দ উচ্চারণ করা হয়। বায়ু নাভি হইতে উত্থিত হইয়া বক্ষঃস্থলে বিস্তীর্ণ ও কণ্ঠে বিবর্তিত হইয়া মূর্ধাকে আহত করে। তাহার পর পরাবৃত্ত হইয়া বক্ষে বিচরণ করিতে করিতে বিবিধ শব্দ অভিব্যক্ত করে। যেমন কোনো

> ব্যক্তি শুষ্ক স্থলে পতিত হইতে গিয়া কদমে পতিত হয়, একবার উপস্পর্শন করিতে গিয়া দুইবার উপস্পর্শন করিয়া ফেলে, সেইরূপ উচ্চরয়িতার অসামর্থ্য বা অপরাধহেতুই, গো-শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া গাবী, গোনী প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া থাকিবে।...এই সকল অপভ্রংশ শব্দের অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য নাই। একার্থপ্রকাশক সদৃশ শব্দের সকলগুলিই যে অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য বা অনাদি হইবে, এইরূপ কোনো নিয়ম নাই। সাধু শব্দ অবগত হইলে, সাদৃশ্যবশতঃ ওইসকল শব্দ হইতে অর্থপ্রত্যয় হয়।[৩]

অর্থাৎ, বৈয়াকরণেরা ভাবতেন যে সাধু শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করতে গেলে যে সামর্থ্য দরকার, সেই সামর্থ্য যাদের নেই তাদের উচ্চারণে মূল সাধু শব্দ বিকৃত হয়ে যায় ও সেই বিকৃতি থেকেই বিভিন্ন লোকসমাজ-উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষার শব্দ তৈরি হয়। সেইজন্য সাধু শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য সমস্ত শব্দ অপভ্রংশ, যা আসলে উচ্চারণকারীর অক্ষমতাকেই নির্দেশ করে। সাধু শব্দই একমাত্র অর্থ প্রতিপন্ন করে। অপভ্রংশ শব্দ অর্থ নির্দেশ করে পরোক্ষভাবে, অর্থাৎ, অপভ্রংশ শব্দের উচ্চারণ শুনলে মগজে তা সেই সাধু শব্দের অনুরণন তৈরি করে যে সাধু শব্দ থেকে তা অপভ্রংশ হয়ে এসেছে। কেবলমাত্র সাধু শব্দেরই অর্থ প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা আছে কেন? কারণ, সাধু শব্দ 'অনাদি, অর্থাৎ, তার উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ, মানুষ নয়, ঈশ্বরের দ্বারাই তা নির্দিষ্ট। যে কারণে বৈয়াকরণ মাধবাচার্য তাঁর জৈমিনীয়ন্যায়মালায় বলেছেন:

> একটি (সাধু) শব্দ সম্যক জ্ঞাত এবং সুপ্রযুক্ত হইলে স্বর্গলোক কামধুক্ হয়।[৪]

সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারকারী বা কথক নয় যারা, সেইটা তাদের অক্ষমতার লক্ষণ, তারা হীন বা নীচ। এদেরই বিষ্ণুপুরাণে 'পাষণ্ডীগণ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি' অনায়ত্ত থাকার 'অপরাধ'-এ যেহেতু তারা দুষ্ট, তাই এই 'শূদ্র' বা 'অনার্য'-দের সাথে বাকবিনিময়ও নিষিদ্ধ হয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ বিধান দেওয়া হয়েছে যে:

> ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণই কেবল আর্য, কেন না তাঁহারা যজ্ঞক্রিয়াধিকার প্রাপ্ত। তাঁহারা কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সহিতই কথা কহিবেন। এই তিন বর্ণ ভিন্ন অন্য যাহার তাহার সহিত কথা কহিবেন না। যদি শূদ্রের

> সহিত কথা কহিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যকে বলিবেন, "এই শূদ্রকে এইরূপ বল..."—ইহাই নিয়ম।[৫]

এইভাবে, বৈয়াকরণদের দ্বারা ভাষা-সংস্কারের মাধ্যমে ভাষার প্রমিত রূপ হিসেবে সংস্কৃত ভাষার প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল সমাজের উপর একটি অসাম্য-ভিত্তিক সোপানতান্ত্রিক কাঠামো আরোপ করার যুক্তি-যৌক্তিকতা উৎপাদনের সঙ্গে। এই সম্পর্কে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর লেখনীতে আমরা পাই:

> এইরূপ অনুমিত হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ এই বেদাদি শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়াই দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। একালের দৃষ্টি কেবল বেদাদিশাস্ত্রের দিকেই নিবদ্ধ ছিল, তাঁহারা শাস্ত্রকে অভ্রান্ত, সুতরাং একমাত্র আশ্রয়ণীয় বলিয়া মনে করিত, শাস্ত্রকেই অন্ধের ন্যায় গতানুগতিকভাবে অনুসরণ করিত, কোনোরূপ স্বাধীন চিন্তার বালাই-ই তাহাদিগের ছিল না, ইহারাই আস্তিক আখ্যা লাভ করিয়াছিল, আচার্য্য জৈমিনি ছিলেন এই আস্তিক দলের মুখপাত্র, তাই তিনি প্রাণপণে বেদের অপৌরুষেয়তা ও নিত্যতা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যদল শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তিকেই প্রবল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন: 'যুক্তিমদ্ বচনং গ্রাহ্যম্।' তীর্থঙ্কর শ্রমণগণ, বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক লোকায়তিক বা বার্হস্পত্য সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারাই নাস্তিক আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি এবং তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্য চার্বাকাদি ছিলেন এই দলের মুখপাত্র।[৬]

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর এই পর্যবেক্ষণে একইসঙ্গে সোপানতান্ত্রিক আধিপত্যবাদী কাঠামোর পক্ষের এবং বিপক্ষের উভয় শক্তিই চিহ্নিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরোধিতাকারীদের মধ্যে অন্যতম, বিতণ্ডাকারী চার্বাক জয়রাশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মত খণ্ডন করে দীর্ঘ তর্ক বিস্তারের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তজ্ঞাপন করেছিলেন:

> কেবল সাধুপদ এবং সাধুশব্দ হইতেই অর্থপ্রতিপত্তি হয়, অসাধু পদ এবং অসাধু শব্দ হইতে অর্থপ্রতিপত্তি হয় না, বৈয়াকরণ এবং মীমাংসকগণের এই মত স্বীকার্য্য নহে।[৭]

বৌদ্ধ, জৈন ও লোকায়ত সম্প্রদায়সমূহও কথ্য প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন রূপকে আশ্রয় করেই নিজেদের দর্শনচিন্তা নির্মাণ ও প্রচার করেছিল। বুদ্ধদেব মৃত্যুকালে

বলে গিয়েছিলেন যে তিনি যে ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন, সেই ভাষাতেই যেন তা লিপিবদ্ধ হয়। এই আদেশেরই ফল 'ধম্মপদ'। শুধু 'ধম্মপদ' নয়, হীনযানাবলম্বী বৌদ্ধদের রচিত অত্যন্ত সমৃদ্ধ পল্লীসাহিত্যের ভাষাও কথিত প্রাকৃতের একটি রূপ, পালি।

কিন্তু এই প্রাকৃত ভাষাসমূহের ক্ষেত্রে আবার নতুন করে ঘনিয়ে উঠল ভাষা-সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রমিতিকরণ ও প্রাকৃতজনের মুখের ভাষার দ্বন্দ্ব। সেই দিকটা এইবার দেখা যাক। ক্ষিতিমোহন সেন-এর লেখনীতে আমরা পাই:

> ধর্মবুদ্ধির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও মুক্তি অনিবার্য।... বৌদ্ধ ও জৈনগণ যে কারণে প্রথাবদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া সহজ চলন্ত প্রাকৃত ভাষা আশ্রয় করিলেন, সেই কারণেই যুগে যুগে তাঁহাদের ভাষা বদল করা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা সেই পালি বা বুদ্ধভাষিতের মধ্যে ও অর্ধমাগধী বা জিনভাষিতের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। যদি বলা যায় বদল করিতে হইলেই মহাবীর, বুদ্ধ প্রভৃতি মনীষীগণের রত্নভাণ্ডার হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়, তখন বুঝা উচিত তাঁহারা যখন প্রথমে বিদ্রোহ করেন, তখনও যে প্রাচীন মতবাদীরা বাধা দিয়েছিলেন তাহাও সেই পূর্বসঞ্চয়ের মোহবশতই। পূর্বসঞ্চয়ের মোহে নতুন পথ ধরা কঠিন হইয়া উঠে। বিদ্রোহ করিয়া মানুষ হয়তো প্রথমে একবার বন্ধনের বাহির হইয়া আসে, ক্রমে সেও আবার আপনারই রচিত ঐশ্বর্যের কঠিনতর বন্ধনে আরও দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়া পড়ে।[৮]

সঞ্চিত 'ঐশ্বর্য'-এর মোহে শ্লথ গতি হয়ে পড়া, নতুন বন্ধন তৈরি হওয়ার বিবরণ আমরা পাই দীনেশচন্দ্র সেন-এর লেখনীতেও:

> পণ্ডিতেরা যে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং যাহা পাণিনি ও অপরাপর বৈয়াকরণ বহু গবেষণা ও বিজ্ঞানসংগত অনুশীলন দ্বারা সুধীমণ্ডলীর গ্রাহ্য এবং একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর সেই ভাষার নিম্নস্তরে আর এক ভাষা লিখিত ভাষায় পরিণত হইয়া গেল এবং তাহাও কালে এতটা বিশুদ্ধ ও উন্নত হইয়া গেল যে তজ্জন্যও পুনরায় ব্যাকরণ সংকলনের প্রয়োজন পড়িল।...ক্রমে পালি ও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের অনধিগম্য হইয়া উঠিল। অলংকারশাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া বসিল, সুতরাং জনসাধারণের সুখদুঃখ ও মনের ভাব

> বুঝাইবার পক্ষে ইহারা আর উপযোগী রহিল না। তখন জনসাধারণের কথিত ভাষায় পুনরায় সঙ্গীত ও প্রবচনাদি রচিত হইতে লাগিল।[৯]

এই সময়ে এসে লোকজীবনের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষার মুক্তক্ষেত্র আবার নতুনভাবে তৈরি হল। কবীর, নানক, দাদু, রজ্জবজী প্রভৃতি সাধক ও দার্শনিকরা সেখানে হাত লাগালেন। ক্ষিতিমোহন সেন এই বিষয়ে লিখেছেন :

> তারপর আসিল কবীর প্রভৃতির যুগ। তাঁদের মধ্যে নাথপন্থী গোরখপন্থী ভাষার ও প্রকাশের প্রভাব। আর দেখি কবীর-ভাষিত সেই ভাষা তখন উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দক্ষিণে কর্ণাটে এবং পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পুবে জগন্নাথের ভক্তদের মধ্যে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানকের ভাষাও তো ঠিক পাঞ্জাবের ভাষা নয়। গুরুমুখের ওইরকমের ভাষার নামই হইল গুরুমুখী। কাঠিয়াঝাড়, গুজরাত, মহারাষ্ট্রেও ওই ভাবের ভজনাদির মধ্য দিয়া সেই কবীর ভাষিত ভাষা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই ভাষা ও সাহিত্যই ভক্তদের ভাবের একটি যোগ-প্রাঙ্গণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার ও বৃন্দাবনের মধ্যেও পদাবলি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বেশ একটি যোগ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি এমন করিয়াই মধ্যপ্রদেশে, উত্তর-পশ্চিমে রাজপুতানায়, এমনকি সিন্ধ গুজরাতেও বৈষ্ণবদের দ্বারা গীত হইয়াছে। আসাম উড়িষ্যায় তো কথাই নাই। এই ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিকতার ছাপ যথেষ্ট থাকিত, তবু পরস্পরের ভাব বুঝতে বাধা হইত না।[১০]

ক্ষিতিমোহন সেন-এর পর্যবেক্ষণে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবার মতো একটি বিষয় আছে। বিষয়টি হল সাধারণ বোধ্যতার প্রয়োজনীয়তা ভাষা কীভাবে মেটাতে পারে, সেই প্রসঙ্গ। ভাষা-সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি প্রমিত ভাষা-রূপ প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি জোরালো সওয়াল এই যে কথ্য ভাষা বা লোকভাষা যেহেতু আঞ্চলিকতা ভেদে বিভিন্নতা ধারণ করে ও প্রায়শ বোধ্যতার গণ্ডীও পেরিয়ে যায়, তাই একটি প্রমিত ভাষারূপ নির্ধারণ ও আরোপ ছাড়া আঞ্চলিকতার গণ্ডীকে ছাপিয়ে বোধ্যতা প্রসারিত করা সম্ভব নয়। এই সওয়াল 'জোরালো' কারণ আমাদের 'সাধারণ জ্ঞানের বিচার'-এ তাকে প্রায় অকাট্য মনে হয়। অথচ ক্ষিতিমোহন সেন-এর পর্যবেক্ষণ এখানে এমন একটি উদাহরণ তুলে এনেছে

যেখানে ভাষার বোধ্যতা একটি আরোপিত প্রমিত ভাষারূপের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করেনি, অতিক্রম করেছে লোকজীবনের মধ্যবর্তী প্রক্রিয়ায় জাত বিভিন্ন লোক-ভাষারূপের মধ্য দিয়ে। তাই, প্রমিত ভাষারূপ আরোপের মধ্য দিয়েই একমাত্র আঞ্চলিকতার গণ্ডীকে অতিক্রম করে বোধ্যতা বিস্তৃত হতে পারে—এই সওয়াল দুর্বল হয়ে পড়ে।

এযাবৎ আলোচনা দেখায় যে ব্যাকরণ যখন বৈয়াকরণদের ভাষার প্রমিতিকরণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে লোকজীবনের গোষ্ঠীচর্চার ঊর্ধ্বে কোনো 'শাশ্বত' ভাষারূপ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছে, তখন তা লোকজীবনের কাছে 'কূপজল' বা 'শৃঙ্খল' রূপে হাজির হয়েছে এবং তা নিষিক্ত থেকেছে সমাজজীবনে সোপানতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যুক্তি দ্বারা। লোকজীবন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই শৃঙ্খল নির্মাণের প্রয়াসের বিরোধী চর্চা, কুয়ো (কূপ) ছাপিয়ে বহতা স্রোতে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা। এইভাবেই ভাষা প্রবহমান থেকেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

বাউলকে কহিও লোকে হইল অউল

'শ্রী গৌরাঙ্গপ্রভুর বিরহপ্রলাপ মুখসংঘর্ষণাদিবর্ণন' পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর অন্ত্যলীলা-র ১৯শ পরিচ্ছেদ-এ। এই অংশে বর্ণিত হয়েছে যে 'প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ'-এর মাধ্যমে নদীয়ার 'আচার্য্য গোসাঞি' একটা 'তরজা প্রহেলী' শ্রীচৈতন্য-র কাছে পাঠান। তরজা প্রহেলীটি এইরকম:

প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।।
বাউলকে কহিও লোকে হইল অউল।
বাউলরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥[১১]

নীলাচলে এসে জগদানন্দ এই প্রহেলী চৈতন্যর কাছে নিবেদন করলে চৈতন্য তা শুনে ঈষৎ হেসে মৌন থাকেন। জগদানন্দ, স্বরূপ গোসাঞি ও অন্য ভক্তগণ

এই প্রহেলীর অর্থ করতে না পেরে চৈতন্যকে প্রশ্ন করলে চৈতন্য বলেন যে তিনিও এর ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। কিন্তু তার পর থেকেই:

সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাঢ়িল।।
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে।।
আচম্বিতে স্মরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্‌ঘুর্ণা দশা হৈল উন্মাদলক্ষণ॥[১২]

শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত-এর এই অংশটি বেশ রহস্যাবৃত: কী অর্থ এই প্রহেলীর যা স্বরূপ গোসাঞি অবধি অনুধাবন করতে পারেন না আর যা চৈতন্যকে রাধাভাবাবেশে বিরহদশায় নিক্ষিপ্ত করে? মূলধারার বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকাররা এর ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন আর মূলধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী বিভিন্ন লোকায়ত বা সহজিয়া ধারার ব্যাখ্যাকাররা যেভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন তা সম্পূর্ণতই একে অপরের বিপরীত। এই বৈপরীত্যে তাঁদের স্ব স্ব সামাজিক অবস্থান ও চর্চার পূর্ণ প্রতিফলন পড়েছে।

রাধাগোবিন্দ নাথের মত মূলধারার বাখ্যাকারের মতে, 'লোকে হইল অউল' পদের অর্থ এই যে সমস্ত মানুষ পরম প্রেমের আনন্দে বিভোর হয়েছে, 'হাটে না বিকায় চাউল' পদের অর্থ এই যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রেমভক্তি সবার অন্তরে রয়েছে, কোনো অভাব নেই, আর, 'কাজে নাহিক আউল' কথার অর্থ এই যে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। যে 'বাউল'-কে বলা হচ্ছে তিনি চৈতন্য আর যে বাউল বলছেন, তিনি 'অদ্বৈত আচার্য্য'। এই অর্যনির্মাণ এহেন ব্যঞ্জনা বহন করে যে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার ব্যাপ্ত চেহারা ধারণ করে সাধারণজনকে আত্মিক আনন্দে পূর্ণ করে তুলেছে।[১৩]

এই শেষোক্ত ব্যঞ্জনাই উপরোক্ত অর্থনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। আর লোকায়ত বা সহজিয়া ধারার বৈষ্ণবরা সম্পূর্ণ বিপরীত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে অর্থনির্মাণ করেছেন। সেই ভিত্তি হল এই যে চৈতন্যের মৃত্যুর পর ক্রমশ বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ছাঁচে ঢেলে সাজানো হয়, যার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের বিশেষ উচ্চ সামাজিক অবস্থান ও সম্মান, জাতপাতভেদ এই সমস্ত

কিছুর পুনঃপ্রবেশ ঘটে, ফলে সাধারণ প্রাকৃতজন যে সামাজিক সাম্যের নির্মাণ বৈষ্ণবধর্মের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশা করেছিল, তার অপমৃত্যু ঘটে এবং সোপানতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থারই পুনর্নির্মাণ ঘটে। এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্ফুরণ হিসেবেই মূলধারার বৈষ্ণবধর্ম ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন লোকায়ত ও সহজিয়া চর্চার বিকাশ ও প্রসার। এই লোকায়ত ও সহজিয়া চর্চার ব্যাখ্যাকারেরা তাই উপরের প্রহেলীর অর্থ করেছেন তাঁদের নিজেদের মতো করে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাকারেরা এর কী অর্থ করেছেন। তাঁদের মতে, 'হাটে না বিকায় চাউল' পদের অর্থ হল এই যে বৈষ্ণব মূলধারায় ভাবচর্চার হাট দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে, বৈষ্ণব গোস্বামীরা আর গরিব সাধারণজনকে ভাবের 'চাল' বিতরণ করছেন না, তার মজুতদারি করে নিজেদের অর্থ-সম্মান-ক্ষমতা সঞ্চয় করছেন, 'কাজে নাহিক আউল' পদের অর্থ হল এই যে জ্ঞানী (আউল)-রা অর্থাৎ গোস্বামীরা তাঁদের করণীয় কাজ করছেন না, 'লোকে হইল অউল' পদের অর্থ হল যে সাধারণজন আজ দুর্দশাগ্রস্ত।[১৪]

অর্থ উৎপাদনের এই দুই প্রতিস্পর্ধী প্রক্রিয়া কেবলমাত্র পদের অর্থনির্মাণে রূপক-উপমার অর্থ নির্ধারণেই বিপরীত অবস্থান নেয়নি, এমনকি এক একটি শব্দের ক্ষেত্রেও বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। তার কিছু উদাহরণ দেখা যাক। মূলধারার ভাষ্যকার রাধাগোবিন্দ নাথ 'অউল', 'আউল' শব্দগুলোকে সংস্কৃত শব্দ 'আকুলা'-র অপভ্রংশ হিসেবে বিচার করেছেন এবং সেই সূত্রেই তাদের অর্থ নির্দিষ্ট করেছেন 'ভাবের আতিশয্য হেতু অবস্থা' বলে। অন্যদিকে, লোকায়ত বা সহজিয়া ধারার ব্যাখ্যাকারদের কাছে 'অউল' শব্দ বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার অউলানো, আউলানো, আউলা-ঝাউলা শব্দের সন্নিবর্তী, যার অর্থ 'অগোছালো' বা 'অবিন্যস্ত', আর 'আউল' শব্দের উৎস পারস্য 'আউলিয়া' শব্দ, যার অর্থ 'ঈশ্বরের বন্ধু" অর্থাৎ 'ঈশ্বরের চরিত্র সম্যকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এমন জন', যে সূত্র ধরে 'আউল', 'বাউল' শব্দগুলো তাঁদের কাছে 'সমাজধারার বাইরে দাঁড়ানো জ্ঞানী' অর্থে 'পাগল' হিসেবে গৃহীত। ফলে ইতিহাসপথের এই অনুক্ষণেও দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী পথে আধিপত্যের কাঠামো পুনর্নির্মাণের পন্থীরা সংস্কৃতের সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র নির্মাণ করেছেন আর তার বিরোধিতাকারী প্রাকৃতজনের পথ প্রাকৃতভাষাক্ষেত্রেই নিজস্ব ইতিহাস ও পরিচয়ের সন্ধান করেছে।

প্রহেলীর অর্থনির্মাণের উপরই নির্ভর করেছে পরবর্তী অংশে বর্ণিত চৈতন্যের অবস্থার ব্যাখ্যা। মূলধারার ব্যাখ্যাকাররা তাকে 'রাধাভাব'-এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নিয়ে যান। কিন্তু সহজিয়া লোকায়ত ব্যাখ্যাকারদের মতে, নদিয়ার আচার্য্য গোসাঞির প্রহেলীর মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবধর্মের অধঃপতিত অবস্থার বিবরণ শুনে চৈতন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এর প্রতিবিধানের ভাবনায়, যা তাঁর তৎকালীন রাধাভাবের অন্তর্বস্তু। কর্তাভজা সম্প্রদায় মনে করে যে এই প্রতিবিধানকে রূপ দেওয়ার জন্যই চৈতন্য তাঁর তিরোভাবের ১৫০ বছর পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবার 'আউলচাঁদ' রূপে আবির্ভূত হন এবং 'কর্তাভজা' ধর্মের প্রবর্তন করেন।

ফলত দেখা যাচ্ছে যে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিষয়ক লোক-উপাখ্যান আধিপত্য-বিরোধী সামাজিক গোষ্ঠীচর্চা নির্মাণের প্রচেষ্টার আভাস দেয়। সুধীর চক্রবর্তীর লেখনীতে আমরা পাই:

> বেদ কোরান পুরাণ ব্রাহ্মণ মৌলবি মন্দির মসজদি বৈধী সাধনা সবকিছু খারিজ করতে করতে আঠারো শতকের শেষদিকে আমাদের এই বাংলায় যত উপধর্ম জেগে উঠেছিল, তার তালিকা বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর। 'বৈষ্ণব ব্রতদিন নির্ণয়' বইয়ে উদ্ধৃত সেই তালিকা এইরকম : বাউল, ন্যাড়া, দরবেশ, সাঁই, আউল, সাধ্বিনীপন্থী, সহজিয়া, খুশিবিশ্বাসী, রাধাশ্যামী, রামসাধনীয়া, জগবন্ধু-ভজনীয়া, দাদু-পন্থী, রুইদাসী, সেনপন্থী, রামসেনহী, মীরাবাঈ, বিখলভক্ত, কর্তাভজা, স্পষ্টদায়িক বা রূপ কবিরাজী, রামবল্লভী, সাহেবধনী, বলরামী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, বড়ী, অতিবড়ী, রাধাবল্লভী, সধিভাবুকী, চরণদাসী, হরিশ্চন্দ্রী, সাধনপন্থী চহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, বৈরাগী, নাগা, আখড়া, দুয়ারা, কামধেন্বী, মটুকধারী, সংযোগী, বার সম্প্রদায়, মহাপুরুষীয় ধর্মসম্প্রদায়ী, জগমোহনী, হরিবোলা, রাতভিসারী, বিন্দুধারী, অনগুলী, সংকুলী, যোগী, গুরু বৈষ্ণব, খণ্ডিত বৈষ্ণব, করণ বৈষ্ণব, গোপ বৈষ্ণব, নিহঙ্গ বৈষ্ণব, কালিন্দী বৈষ্ণব, চামার বৈষ্ণব, হরিব্যাসী, রামপ্রসাদী, বড়গল, নস্করী, চতুর্ভুজী, ফারারী, বাণশয়ী, পঞ্চধুনী, বৈষ্ণব তপস্বী, আগরী, মার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী, সৎনামী, পরিয়াদাসী, বুনিয়াদাসী, আহমদদদী, বীজমার্গী, ভাবী, ভিঙ্গল, মানভাবী, কিশোরীভজনী, কুলিগায়েন, টহলিয়া বা নেমো বৈষ্ণব, জোন্নী,

শার্ভল্লী, নরেশপন্থী, দশামাগী, পাঙ্গুল, বেউড়দাসী, ফকিরদাসী কুম্ভপাতিয়া, খোজা, গৌরবাদী, বামে কৌপীনে, কপীন্দ্র পরিবার, কৌপীনছাড়া, চূড়াধারী, খাকী, কবীরপন্থী ও মুলুকদাসী।[১৫]

এইসমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে চর্চাকারীর সংখ্যা ও ভৌগোলিক প্রসারের বিচারে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের চর্চা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ব্যাপ্তি অর্জন করেছিল এবং অন্যান্য গোষ্ঠীচর্চা, যেমন, বাউল, মারফতি ফকিরি, সুফি, তান্ত্রিক নানা চর্চার সঙ্গে সহজ আদানপ্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। তাই এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভাবনা ও অনুশীলনের বৃত্তান্ত কিছুটা বিস্তৃতিতে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে আমরা লোকজীবনের মধ্যে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীচর্চার স্ফুরণের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে দেখে নেওয়া যাক ইতিহাসের কোন অনুক্ষণে এই স্ফুরণ ঘটেছিল।

লোক-উপাখ্যানে আউলচাঁদের আবির্ভাবের সময়ের যে আভাস পাওয়া যায় তা থেকে বলা যায় যে সেই সময় হল পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত আগের কোনো সময়। সুতরাং উপরোক্ত গোষ্ঠীচর্চাসমূহের লোকজীবনে স্ফুরণ হওয়ার পর্যায় বাংলার ইতিহাসের সেই পর্যায় যখন ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড ক্রমশ রাজদণ্ড রূপে প্রোথিত হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটাচ্ছিল। ঔপনিবেশিক শাসক মানদণ্ড ও রাজদণ্ডকে কেন্দ্র করেই গোটা সমাজকে পুনর্বিন্যস্ত করে নিতে উদ্যোগী হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ এক দেশীয় জমিদারকুল তৈরি করা, দেশীয় শিল্প ও কুটিরশিল্পের ধ্বংসসাধন করে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রসার— মানদণ্ডের এই সমস্ত চাহিদা মেটানোর উপযোগী রাজদণ্ড তৈরির জন্য পুরানো শাসনব্যবস্থার বদলে তাদের শাসন চালানোর উপযোগী এক শাসনব্যবস্থা গড়ে-পিটে নেওয়ায় ছিল তাদের অগ্রাধিকার। এই কাজে ভাষার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মানদণ্ড-বাহক ও রাজদণ্ড-বাহক বিদেশীদের দরকার হয়ে পড়েছিল এ দেশের ভাষা সম্পর্কে একটা চলনসই শিক্ষা।

পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানুয়েল দ্য'স সাঁপোসাঁ ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে এখনকার ঢাকা শহরের পার্শ্ববর্তী ছোট শহর ভাওয়ালে বসে প্রণয়ন করেন বাংলাভাষার প্রথম শব্দকোষ ও ব্যাকরণ, যা ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে লিসবন থেকে প্রকাশিত হয়

'ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেলগল্লা ই পর্তুগিজ : দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস' নামে। বাংলাভাষা এর মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছিল রোমান অক্ষরে। বছর তিরিশ পর, ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে নাথানিয়েল হ্যালহেড রচিত 'এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশিত হয়, যাকে কেন্দ্র করেই প্রথম 'আধুনিক' পদ্ধতিতে উদাহরণ সহযোগে বর্ণমালা প্রকাশিত হয়। এর বছর দশেক পর ব্রিটেনে প্রকাশিত হয় কোনো এক অজানা লেখকের লেখা 'দ্য ইন্ডিয়ান ভোকাবুলারি', যাতে প্রায় দেড় হাজারের মতো শব্দ সংগ্রহ করা হয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে হেনরি পিটারস ফস্টার-এর অভিধান 'এ ভোকাবুলারি ইন টু পার্টস : ইংলিশ অ্যান্ড বেঙ্গলি অ্যান্ড ভাইসি ভার্সা'-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, যার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতার কাছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের মতো এদেশের পণ্ডিত বৈয়াকরণদেরও যুক্ত করে নেওয়া হয় প্রশিক্ষণযোগ্য একটি বাংলা ভাষার রূপ তৈরি করে নেওয়ার জন্য। প্রাথমিকভাবে এইসমস্ত শব্দ সংকলিতা ও ব্যাকরণ-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ব্যবসা ও প্রশাসন চালানোর উদ্দেশ্যে এ দেশে আসা বিদেশীদের এ দেশীয় ভাষার প্রাথমিক পাঠ হিসেবে। কিন্তু ক্রমশ তা দেশীয় ভাষার একটি প্রমিত লেখ্য ও কথ্য রূপ নির্ধারণের মধ্য দিয়ে এমন একটি ভাষারূপকে নির্দিষ্ট করল যা প্রশাসনিক কাজে ও ঔপনিবেশিক শাসকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকা শিক্ষিত উচ্চকুলের ব্যবহারে প্রযুক্ত হতে পারে। অবশ্য ম্যাকলে সাহেবের ভাষানীতির মধ্য দিয়ে এর পরেই ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রশাসনের ভাষা হয়ে উঠল বিদেশী ইংরেজি। ঔপনিবেশিক প্রশাসন দেশীয় উচ্চবর্গের মধ্যে একটা অংশকে ইংরেজি ভাষাশিক্ষায় শিক্ষিত করে নেওয়ার ব্যবস্থা বহাল করে নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দেশীয় উচ্চবর্গের মধ্যে একটা করণিক সরবরাহকারী সামাজিক উপস্তর তৈরি করল। শিক্ষিত উচ্চবর্গের প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা হয়ে উঠল ইংরেজিই। এর ফলে দেশি ভাষার প্রমিতিকৃত রূপের প্রশাসনিক ভাষা হয়ে ওঠা আর না হলেও, ক্রমশ ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ও তাকে কেন্দ্র করে মুদ্রণবাণিজ্যের বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই প্রমিতিকৃত ভাষা হয়ে উঠল উচ্চবর্গীয় 'ভদ্র'-জনের সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যম। এর ফলে ভাষাজগতে তিনটি স্তরকে ক্রমশিলীভূত হয়ে উঠতে আমরা দেখেছি। এই তিনটি স্তর হল :

১. ঔপনিবেশিক রাজভাষা ইংরেজি, যা হল মানদণ্ড ও রাজদণ্ডকে ঘিরে প্রশাসন ও বাণিজ্যের ভাষা।

২. তার নীচের স্তরে প্রমিত দেশীয় ভাষা-রূপ, মুদ্রণবাণিজ্যের কিছুমাত্রায় সহায়তা পাওয়ার মধ্য দিয়ে যা সেই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ভাষার 'ক্ষমতা' অর্জন করল।

৩. এই দুইয়ের নীচে লোকজীবন-ভুক্ত অগণিত ভাষারূপ, যারা প্রায় কেউই 'শুদ্ধ' শব্দভাণ্ডার নির্ধারণ ও ব্যাকরণ-নির্মিতির মধ্য দিয়ে প্রমিতিবদ্ধ নয়, লোকচর্চায় ও কথ্য সাহিত্যের মধ্যেই মূলত যাদের বিস্তার।

এই তিনটি স্তরের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্বন্ধ সোপানতান্ত্রিক এমন এক কাঠামো রচনা করল যা আধিপত্যের বয়ান পুনর্বিধৃত করল। ঔপনিবেশিক ইংরেজি ভাষাশিক্ষা সমাজে উচ্চবর্গীয়দের মধ্যে করণিক সরবরাহকারী একটি উপস্তরই যে কেবল গড়ে তুলল, তা নয়, সেই 'শিক্ষিতকুল'-এর মধ্যে ইউরোপীয় দর্শন ও সমাজচিন্তাকে 'আধুনিকতা' ও 'অগ্রগতি'-র সঙ্গে সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ইউরোপের পশ্চিম কূল থেকে 'উন্নতির মন্ত্র' আহরণের এই প্রয়াসের অনুষঙ্গ হয়ে উঠল দেশীয় লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে 'অজ্ঞান' ও 'অন্ধকার'-এর বদ্ধভূমি হিসেবে দেখার ভঙ্গি। দেশীয় ভাষার প্রমিত রূপ অনুশীলনকারী দেশীয় শিক্ষিত অভিজাতকুলের কাছে তাই যেমন একদিকে ইংরেজি ভাষা-পঠনপাঠনের সঙ্গে 'অগ্রগতি'-র বৈষয়িক, দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হল, তেমনই অন্যদিকে, তার ফলে, তৃতীয় স্তরে থাকা অগণিত অপ্রমিত লোকভাষা প্রমিত ভাষার 'অপভ্রংশ" বা 'উপভাষা' আখ্যাপ্রাপ্ত হয়ে 'ছোটলোকদের ভাষায়' পরিণত হল। মুদ্রণবাণিজ্যের লক্ষ্মীর কৃপাপ্রাপ্ত প্রমিত ভাষায় লিখিত সাহিত্য গরিমাভরে অপ্রমিত ভাষারূপের অসংখ্য লোকজীবননিষিক্ত লোকসাহিত্যকে 'তুচ্ছ' প্রতিপন্ন করে নিজেকে জাহির করল।

সমাজজীবন জুড়ে প্রমিতিবদ্ধতার নির্মাণের এই আধিপত্যবাদী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেই স্ফুরিত হল লোকায়ত উপধর্মের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীচর্চার অনুশীলন। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ভাবনা ও অনুশীলনের বৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে এবার সেই স্ফুরণের তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করা যাক।

আউলচাঁদ সম্পর্কে প্রচলিত লোকগাথা কতটা ঐতিহাসিক আর কতটা কল্পনা তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব হলেও, ছিন্নবস্ত্র পাগল ফকির আউলচাঁদের লোকগাথার মধ্যে সত্য পীর বা সত্যনারায়ণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রচলিত লোকগাথার বিশোষণ লক্ষ্য করার মতো। ষোড়শ শতাব্দী থেকে গরিব খেটে খাওয়া হিন্দু ও মুসলমান অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য পীর বা সত্যনারায়ণকে কেন্দ্র করে যে লোকধর্মের প্রসার ঘটেছিল, যে লোকধর্ম হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিভাজন অস্বীকার করেছিল, বেদ-পুরাণ বা শরিয়তের কোনো বিধিসংগত ক্ষমতা অস্বীকার করে লোক-অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিয়েছিল, সেই লোকধর্মের স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা আমরা কর্তাভজা মতের মধ্যেও পাই, অবশ্যই তার সমসাময়িক প্রেক্ষিত—ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রেক্ষিতের উপযোগী ভাবে পাই। চৈতন্য-প্রচলিত বৈষ্ণবমতের জাতপাতবিরোধী অনুশীলনেরও সার্থক ধারাবাহিকতা-রক্ষাকারী হিসেবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের চর্চা নিজেকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল, সে চাহিদারই প্রতিফলন ঘটে আউলচাঁদকে চৈতন্যের নব অবতার রূপে দাবি করার মধ্য দিয়ে। এছাড়াও কর্তাভজাদের মত-পথে সংমিশ্রণ ঘটেছিল বৌদ্ধিক তান্ত্রিক ও কাপালিক সাধনার নানা রীতিনীতির। এই সমস্ত নিয়ে গড়ে উঠেছিল কর্তাভজাদের গোষ্ঠীচর্চা। এই সংমিশ্রণ ও নির্মাণ কোনো গুরু/কর্তা বা নেতার পরিকল্পনা বা ভাবনা অনুযায়ী ঘটেছিল এমনটা ভাবা দুষ্কর। এইটাই ভাবা সঙ্গত হবে যে বৈদিক/ব্রাহ্মণ্য প্রাতিষ্ঠানিকতা বিরোধী, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও জাতপাতবিরোধী এই সমস্ত চর্চা-অনুশীলন সমাজের নীচুতলার সামাজিক অস্তিত্বে ও লোকজীবনে এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছিল যে কর্তাভজাদের চর্চায় তা স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছিল।

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এই গোষ্ঠীচর্চার ক্ষেত্রটিকে তাঁরা নিজেরা নাম দিয়েছিলেন 'মানুষচাঁদের সত্য-হাট'। কর্তাভজা তাত্ত্বিক মনুলাল মিশ্র এই মানুষচাদের সত্য-হাট সম্পর্কে বলেছেন :

> এই হাটে শুদ্ধ প্রেমের বেচাকেনা ছাড়া আর কিছুই নেই। আসল শিষ্য যাঁরা, সেই সাধু-সন্তরা এই হাটে সত্যের দাঁড়িপাল্লা হাতে সত্যকারের ব্যবসায় নিয়োজিত হন... লোভে মাতাল হয়ে কোনো ব্যবসায়ী এ হাটে আসে না...এ কেবল কাঙালের হাট। যখন কেউ এ হাটে বেচাকেনা

> করে, কখনও কোনো লোকসান হয় না, সবার সব বাসনা পূর্ণ হয়, অসীম ধনে সে ধনী হতে পারে।... পরম সুখের এই হাটে রাজা-প্রজার পার্থক্য নেই, ধনী-দরিদ্রে পার্থক্য নেই।[১৬]

এই মানুষচাঁদের সত্য-হাট-এ সমাবেশিত হত কারা? ঘোষপাড়ার অবস্থাপন্ন সদগোপ পরিবারের রামশরণ, সতীমা (সরস্বতী) ও দুলালচাঁদ (লালশশী) এই সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিত্ব বা কর্তা ছিলেন বটে, কিন্তু এই সম্প্রদায় নিজেদের আখ্যায়িত করত 'কাঙালদের পল্টন' নামে। কাদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই কাঙালদের পল্টন? ইতিহাসবিদ সুমন্ত ব্যানার্জির লেখায় পাওয়া যায়:

> সমস্ত সমসাময়িক দলিল-দস্তাবেজ থেকে দেখা যায় যে কর্তাভজারা এসেছিলেন সমাজের নীচুতলা থেকে, মূলত নীচু জাত, অস্পৃশ্য, মুসলমান কৃষক ও কারিগরদের মধ্য থেকে।[১৭]

১৮৬৪ সালে তৎকালীন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাতেও বলা হয়:

> তলাকার শ্রেণিদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে এই (কর্তাভজা) ধর্ম। ভদ্রলোকেরা মান রক্ষার্থে এর থেকে দূরেই থাকেন।... এই ধর্মের জনপ্রিয়তার কারণ স্পষ্ট : তা স্বাধীনতার বড় সুযোগ করে দেয়। হিন্দুদের নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে এদের (তলাকার শ্রেণিদের) খুব অল্পই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে....কিন্তু কর্তাভজা ধর্মে তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা খুঁজে পায়।[১৮]

ইতিহাসবিদ সুমন্ত ব্যানার্জিও অন্যত্র লিখেছেন:

> কর্তাভজা গোষ্ঠী হল একটি লোকপ্রিয় গোষ্ঠী যাদের নিয়ে প্রচুর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যদিও এই গোষ্ঠীর কেন্দ্র ছিল কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ঘোষপাড়ায়, তবুও তা কলকাতা শহরের গরিব শ্রেণিদের মধ্য থেকে প্রচুর লোককে টেনে নিয়েছিল....জাতপাতবর্ণ নির্বিশেষে সাম্যের উপর জোর নীচুতলার মানুষদের বড় সংখ্যায় টেনেছিল।[১৯]

এই সমস্ত থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কর্তাভজা ধর্ম ছিল 'ছোটলোক'-দের লোকধর্ম, 'ভদ্রলোকেরা যার থেকে ভয়ে বা বিতৃষ্ণায় দূরত্ব বজায় রাখতেন।

আর এই আভাসও পাওয়া যায় যে সমাজের গরিব অন্ত্যজ মানুষেরা এখানে এক গোষ্ঠী-চর্চা বা গোষ্ঠী-অনুশীলনে মিলিত হয়েছিল বৈষম্য-বিরোধী চাহিদা ও তাগিদ থেকে। তাঁরা তাঁদের এই সম্মেলনের যে নাম সাব্যস্ত করেছিলেন, সেই 'মানুষচাঁদের সত্য-হাট' নামটাই অনেক কথা বলে। 'মানুষচাঁদ' কথাটার মধ্য দিয়ে জাত-পাত-ধর্ম ও বিত্তের সমস্ত বিভেদকে অস্বীকার করে মনুষ্যত্বের পরিচয় ও অধিকারকে সামনে নিয়ে আসা হয়। আর 'সত্য-হাট'-এর যে চিত্রায়ন আমরা মনুলাল শর্মায় পাই তা তখনকার অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও একটি সমালোচনা তির্যকভাবে আভাসিত করে। যেমন, যখন বলা হয় যে সত্যের দাঁড়িপাল্লা হাতে সত্যকারের ব্যবসায় সাধু-সন্তরা নিয়োজিত হন, লোভে মাতাল কোনো ব্যবসায়ী এখানে আসেন না, কারও লোকসান হয় না, সব কাঙালদের বাসনা পূর্ণ হয়, তখন, যার বিপরীত হিসেবে এই ছবি আঁকা হচ্ছে, সেই সমাজজোড়া বাজার-হাট-এর একটা ছবিও কি অনুচ্চারিতভাবে আঁকা হয়ে যায় না? সমাজজোড়া বাজার-হাট-এ লোক-ঠকানো দাঁড়িপাল্লা নিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুনাফার নেশায় মাতাল ব্যবসায়ীরা যে কেবল কাঙালমানুষদের লোকসানই করে যায়, কাঙাল মানুষদের কোনো বাসনাই পূর্ণ হয় না—এ বুঝতে কি কোনো ফাঁক থাকে? ইংরেজদের কোম্পানি ও তার ধামাধরা ভদ্রবাবুদের এই আদবের বিরুদ্ধে কর্তাভজা 'কাঙালের পল্টন'-এর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের গোষ্ঠীচর্চার মধ্য দিয়ে এক 'গরিব কোম্পানি' গড়ে তোলা। এই 'গরিব কোম্পানি' গড়ে তোলার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে কর্তাভজারা কী ধরনের গোষ্ঠী অনুশীলন গড়ে তুলেছিল? সেইটাই এবার দেখা যাক।

প্রথমে তাদের এক ঘোর নিন্দুকের মুখ থেকেই শোনা যাক। এই ঘোর নিন্দুক হলেন উঁচুজাতের ভদ্রলোক পরিবার থেকে আসা দাশরথি রায়। তিনি উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, অর্থাৎ ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে কর্তাভজাদের 'কুকীর্তি' বর্ণনা করে ও সাধারণজনকে সে সম্পর্কে সাবধান করে এক পাঁচালি রচনা করেন, যা 'কর্তাভজা পাঁচালি' নামে পরিচিত। সেই পাঁচালিতে তিনি বর্ণনা করেছেন যে প্রতি শুক্রবার কর্তাভজারা একসাথে মিলিত হয়। এমনকি বাড়ির মা-বৌ- মেয়ে-রাও দুধ, দই বা মিষ্টি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। প্রথমত, কর্তাদের (রামশরণ, সতীমা, লালশশী) বাণী ও গান এবং অন্যান্য 'ভাবের গান'

চর্চা হয়, তারপর প্রেমভাবে আকুল হয়ে সবাই একে অপরের সাথে নির্বিচারে মেলামেশা করে। জাতবিচার না করে ধোপা-জোলা-মুচি-ডোম-দের সঙ্গে একসাথে বসে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা খাওয়াদাওয়া করে। ব্রাহ্মণ বা ঈশ্বরে তাদের ভক্তি নেই, খোদায় বা মৌলবিতেও তাদের ভক্তি নেই, বেদ-পুরাণ-কোরান কিছুতেই তাদের জ্ঞান নেই, তারা সব ধর্মকেই কলুষিত করে।[২০]

দাশরথি রায়ের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় পূর্বোদ্ধৃত সোমপ্রকাশ পত্রিকার প্রতিবেদনে যে নীচুতলার মানুষদের 'স্বাধীনতা'-র কথা বলা হয়েছিল তার রূপের পরিচয়। সেই রূপ হল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাতের বিভাজনকে অমান্য করে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আচার-অনুষ্ঠান অনুশীলন। দ্বিতীয় একটি রূপের ইঙ্গিতও এর মধ্যে আভাসিত—তা হল মেয়েদের জন্য একটি মুক্তক্ষেত্র নির্মাণ। যে মেয়েরা কেবল জাতপাত ধর্মের বাঁধনে নয়, পুরুষ প্রভুত্বের দাপটেও অন্দরমহলের অভ্যন্তরে বা ঘোমটা-বোরখার আড়ালে বন্দি জীবনে দণ্ডিত, সেই মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি খোলামেলাভাবে মেলামেশা করছে, খাওয়া-দাওয়া করছে, নাচ-গান করছে—কর্তাভজাদের আড্ডা এইভাবে মেয়েদের জন্য একটা মুক্তক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই অনুষঙ্গে যৌনতা বিষয়েও সমাজ-প্রচলিত ধারণা ও রীতিনীতির থেকে ভিন্নতর ধারণা ও চর্চা গড়ে উঠেছিল কর্তাভজাদের গোষ্ঠীচর্চার অভ্যন্তরে। একদিকে যেমন সমাজে পতিতা বলে চিহ্নিত মেয়েরা থেকে শুরু করে বিধবা, সধবা, অনূঢ়া সবাই এই গোষ্ঠীচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই সমাজের উচ্চকুলের ভদ্রজনেরা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মেয়ে মানেই 'মাগি' বা 'বারোভাতারি' বা 'পতিতা' বলে চিহ্নিত করত। নানা তান্ত্রিক (বা বৌদ্ধ তান্ত্রিক) বা সহজিয়া যৌন আচার কর্তাভজাদের মধ্যে চর্চিত হত। সেই সমস্তের প্রতি আপন সংস্কারে বদ্ধ ভদ্রলোকেরা দূর থেকে নাক শিটকে বলত যে নির্বিচার ইন্দ্রিয়সুখভোগের প্রলোভনই কর্তাভজাদের চালিত করে। খোলা মনে দেখলে অবশ্য এ কথা মানা যায় না। কর্তাভজাদের নিজেদের শাস্ত্রীয় বচন 'ট্যাকশালি বুলি'-তে পাওয়া যায়: 'নারী হিজড়া, পুরুষ খোজা। তবে হবে কর্তাভজা।।' সান্ধ্যভাষায় বলা এই বুলির অর্থ যৌন সংযমের দিক থেকে করা যেতে পারে, আবার সহজিয়া-তান্ত্রিক উপায়ে বীর্য-সংযমের দিক থেকেও করা যেতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই তা নির্বিচার ইন্দ্রিয়সুখভোগের সঙ্গে মেলানো যায় না।

এইভাবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীচর্চা 'ছোটলোক'-দের জন্য তাদের নিজস্ব একটা সামাজিক ক্ষেত্র গড়ে তুলতে চাইছিল, যে ক্ষেত্রমধ্যে 'ছোটলোক'-রা সম্মান ও স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচয় নির্মাণ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বা শরিয়তি বিধান মতে সামাজিক আধিপত্য নির্মাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ রূপ নিয়েছিল, তেমনই রূপ নিয়েছিল ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পীড়নের বিরোধিতা। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ব্রিটিশ কোম্পানি, শহুরে বাবুসমাজ, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের উদরস্ফীতি ঘটিয়েছিল আর ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল কৃষক, কারিগর ও ছোটো ব্যাপারীদের উপর। এই কৃষক, কারিগর ও ছোটো ব্যাপারীদের দৃষ্টিকোণই প্রতিফলিত হয়েছে কর্তাভজাদের 'ভাবের গীত'-এর গানে বা 'ট্যাকশালী বুলি'-র কথনে। 'বানিয়া', (সুদখোর) 'মহাজন', 'দালাল', 'পাইকার', 'গোমস্তা' ইত্যাদিরা যে কীভাবে 'বাজার', 'গঞ্জ' জুড়ে বসে 'কাঙাল'-দের সর্বনাশ করছে তার বৃত্তান্ত ও বিরোধিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 'ভাবের গীত'ও 'ট্যাকশালী বুলি'-র ছত্রে ছত্রে ছড়ানো আছে।

উপরতলার সমাজকর্তা ও ধর্মীয় নীতি-পাহারাদারদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের এই গোষ্ঠীচর্চা যত না খোলামেলা বিদ্রোহের চরিত্রের, তার থেকে অনেক বেশি গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধের। গোপনীয়তা তার অন্যতম হাতিয়ার। বহিঃস্থভাবে সামাজিক প্রথানুবর্তিতায় মিশে থাকার ভান বজায় রাখার অন্তরালে গোপ্যে-গোপনে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত চর্চার মধ্য দিয়ে নিজস্ব 'স্বাধীন' অস্তিত্ব নির্মাণ—এই-ই তার মূল সুর। 'ট্যাকশালী বুলি'-তে বলা হয়েছে : 'গুপ্ত যে মুক্ত সে, বে-পর্দা ব্যভিচারিণী।' তার সাধনার ভাব ও তত্ত্ব নির্মিত হয়েছে, যুগ যুগ ধরে পরিবাহিত হয়েছে যে 'ভাবের গীত'-এর গান ও 'ট্যাকশালী বুলি'-র কথনের মধ্য দিয়ে, তার ভাষাও তাই সন্ধ্যাভাষা, যে ভাষার মধ্যে ঢোকার পথ কর্তাভজা গোষ্ঠীচর্চার মধ্যে ঢোকার পথের সঙ্গে নিবিড়ভাবে বাঁধা, যে ভাষা তার শিকড় ছড়িয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে লোকজীবনে প্রবহমান বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, সহজিয়া বিভিন্ন ধারার মধ্যে। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নির্মাতারা অবিশ্বাসে-অশ্রদ্ধায় এই ভাষাকে অচ্ছুৎ, 'অপরিণত' বলে সরিয়ে রাখলেও লোকজীবনের মধ্য দিয়ে তা যে ব্যাপ্তি লাভ

করেছিল। তার চিহ্ন আজ দেগে বসে গেছে বাংলা ভাষার গায়েও। 'ট্যাকশালী বুলি'-র সান্ধ্যভাষায় রচিত বহু প্রবচন আজ প্রচলিত বংলায় নিজের স্থান করে নিয়েছে, যেমন, 'সব শিয়ালের এক রা', 'চুল টানলে মাথা আসে', 'পরের মুখে ঝাল খেয়ো না' ইত্যাদি। গোপ্য-গোপনীয়তার আড়াল টেনে সামাজিক অস্তিত্বকে দ্বি-বিভাজিত করে আধিপত্যের বিরুদ্ধতা নির্মাণের অনুশীলন বিশোষিত হয়েছে ভাষার মধ্যেও।

তৃতীয় পর্ব

রোমন্থন

কালকূট (সমরেশ বসু) একবার লিখেছিলেন :

> ...রূপকথার গায়ে যখন নামধাম সাল-তারিখের দাগ লাগে, তখন তা ইতিহাস।[২১]

নামধাম সাল-তারিখের দাগে ঢেকে রূপকথাকে ইতিহাস বলতে চাইলেও আসলে তা রূপকথাই। এমন রূপকথা যার নির্মাণ-বিনির্মাণ-পুনর্নির্মাণ হয়েই চলে। অতীতের দিকে মুখ ঘোরানো থাকলেও, তা ঘটে আসলে বর্তমানেরই তাগিদে। এমন দুইটি টুকরো রূপকথা দুইটি পর্ব জুড়ে আলোচনা করার হেতু কী? সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ জবাবদিহি করার জন্য এই পর্ব।

ভাষা ও লোকজীবনে প্রমিতিকরণ ও বহমানতা কীভাবে দ্বন্দ্ব রচে তা দেখা-বোঝার আগ্রহ থেকেই দুইটি ইতিহাসখণ্ডকে নির্বাচন করে দুইটি পর্বে আলোচনা। প্রথম পর্বে সেই সময়কাল যাকে কেন্দ্র করে বর্তমানের হিন্দুত্ববাদীরা সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের গৌরবময় উৎসকাল হিসেবে রূপকথা রচেছেন। আমাদের আলোচনা কিছুটা তার পাল্টা-রূপকথা, যা হিন্দুত্ববাদীদের রচিত রূপকথার ছায়ায় ঢাকা দিকগুলোতে আলো ফেলতে চেয়েছে, আভাসে থাকা ইঙ্গিতকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ উপলব্ধিতে এসেছে যে সংস্কৃত ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র যেভাবে কেবল মানুষের বাক-কে নয়, গোটা লোকজীবনকেই প্রমিতিবদ্ধ কাঠামোয় বেঁধে আধিপত্যের বয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, তার বিপরীতে সেই আধিপত্যের বিরোধী বয়ানও লোকজীবন থেকে

স্ফুরিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া থেকেছে চির-বহমান। এক সময়ের বিরোধিতা-বিদ্রোহ যখন প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে প্রমিতিকরণের নয়া বন্ধনে লোকজীবন ও লোকভাষাকে বাঁধতে চেয়েছে, লোকজীবনের বহমানতার স্রোত তাকে ছেড়ে দূরে সরে গেছে, প্রমিতিকরণ প্রচেষ্টা পড়ে থেকেছে ঐশ্বর্যগর্বী ব-দ্বীপ হিসেবে, আর লোকজীবনের প্রাণময়তা কলরব করে বহে গিয়েছে নতুন খাতে। ভাষার বহমানতাও রয়েছে এই একই খাতে। আঞ্চলিকতার গণ্ডী পেরিয়ে বোধ্যতার বিস্তারও ভাষার ক্ষেত্রে ঘটেছে প্রমিতিবদ্ধতার মধ্য দিয়ে নয়, লোকজীবন-সংলগ্নতার মধ্য দিয়েই।

এই পাঠ প্রশ্ন তুলে দেয় যে প্রমিতি নির্মাণ ও আধিপত্য নির্মাণের এই পরস্পরে নিষিক্ত থাকার অর্থ কি এই যে প্রমিতি মানেই ক্ষমতার নির্মাণ? লোকজীবন বহুভাষে বলে, বহু ছন্দে চলে। তার মধ্যে স্থির একক কোনো রূপকে প্রমিত করার মধ্য দিয়ে বহু অপরকে অনাকাঙ্ক্ষিত, তাই দমনযোগ্য করে তোলা হয় না কি? প্রমিত রীতি নীতি, প্রমিত ভাষা তাই-ই কি ক্ষমতার ভাষা, আধিপত্যের বয়ান হয়ে ওঠে? এসব প্রশ্নের উত্তরসন্ধানে পূর্ণযাত্রায় নামা এই আলোচনার অভিসন্ধি ছিল না। তাই এইসমস্ত প্রশ্নকে নিয়েই আমরা ইতিহাস-রূপকথার দ্বিতীয় এক সময়পর্যায়ে প্রবেশ করেছিলাম আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে।

সেই সময়পর্যায় হল বঙ্গদেশে বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ প্রতিষ্ঠার সময়। ঔপনিবেশিক শাসক-প্রশাসক-পণ্ডিত এবং বঙ্গসমাজের (বিশেষ করে ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতার সন্নিকটবর্তী বঙ্গসমাজের) উপরের তলার বাবু ও পণ্ডিতদের উদ্যোগে যখন ভাষা প্রমিত হল, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় ছাঁচই প্রমিত বলে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন লোকজীবন কীভাবে বহেছিল? এই প্রমিতিকরণের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব কী উপস্থিত হয়েছিল? উত্তরের ইঙ্গিত পেতে আমরা লোকজীবনের একটি অংশ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুশীলন নিয়ে আলোচনা করেছি। দেখেছি যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের প্রমিত ইউরোপীয় ছাঁচ অবজ্ঞা করে সেখানে রস আহরণ করা হয়েছে লোকজীবনে প্রবাহিত বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ও সহজিয়া বিভিন্ন ধারা থাকে, তা নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করে নিয়েছে আর তার মধ্য দিয়ে সমাজের আধিপত্যকারী ক্ষমতার বিরোধিতা রচনা হয়েছে। শিক্ষিত/অশিক্ষিত, আগুয়ান/পশ্চাৎপদ এইরকম ক্ষমতা-নিষিক্ত দ্বিত্বে

ফেলে একে বিচার করার মূঢ়তা বা উন্নাসিকতা যদি আমরা সাময়িকভাবে হলেও মুলতুবি রাখি, তাহলে এর মধ্য দিয়ে কি আমরা সেই প্রমিতি বনাম বহমানতার দ্বন্দ্বই ভাষিত হতে দেখি না? আর তা যদি দেখি, তাহলে নিজেদের সামাজিক অস্তিত্ব অবস্থানও কি এই প্রমিতি বনাম প্রবহমানতার দ্বন্দ্বের নিরিখে নতুনভাবে বিচার করা জরুরি হয়ে ওঠে না?

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৫

সূত্রনির্দেশ

১. এই পদ ক্ষিতিমোহন সেন 'কবীর' প্রবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। প্রবন্ধটি প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ক্ষিতিমোহন সেন-এর প্রবন্ধাবলি 'সাধক ও সাধনা' (পুনশ্চ দ্বারা প্রকাশিত)-র ৫৫-৭৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।
২. অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলি, ১ম খণ্ড, 'পাণিনি' প্রবন্ধ, পৃ. ৪০৩।
৩. মূল সংস্কৃত থেকে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী কর্তৃক সাধু বাংলায় অনূদিত এবং তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে উদ্ধৃত।
৪. মূল সংস্কৃত থেকে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী কর্তৃক সাধু বাংলায় অনূদিত এবং তাঁর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে উদ্ধৃত।
৫. অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ রচনাবলি, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।
৬. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থ, পৃ. ৭৯।
৭. জয়রাশি-র তর্কের পূর্ণ বয়ান দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীয় 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। ওই গ্রন্থেরই পৃ. ৬৭ থেকে এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে।
৮. ক্ষিতিমোহন সেন-এর 'জৈনমরমী আনন্দঘন' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, প্রবন্ধটি পূর্বোক্ত 'সাধক ও সাধনা' গ্রন্থে সংকলিত।
৯. দীনেশচন্দ্র সেন-এর বৃহৎবঙ্গ', পৃ. ৯৫৯-৯৬০।
১০. ক্ষিতিমোহন সেন-এর 'জৈনমরমী আনন্দঘন' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, প্রবন্ধটি পূর্বোক্ত 'সাধক ও সাধনা' গ্রন্থে সংকলিত।
১১. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৩।
১২. উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী কৃত শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৩।

১৩. রাধাগোবিন্দ নাথের শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষ্য, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৫২-৬৫৩।

১৪. দেবেন্দ্রনাথ দে-র কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত, ১৯৬৮; পৃ. ২৫-২৬।

১৫. সুধীর চক্রবর্তীর গভীর নির্জন পথে, পৃ. ১৯-২০।

১৬. মনুলাল মিশ্র 'সত্যধর্ম উপাসনা' গ্রন্থে এমন লিখেছিলেন। গ্রন্থটি কলকাতার ইন্দ্রলেখা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। চেষ্টা করেও এখনও অবধি আমি মূল গ্রন্থটি জোগাড় করে উঠতে পারিনি। এই গ্রন্থের অংশবিশেষের ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মার্কিন গবেষক হিউগ বি আরবান। সেই ইংরেজি অনুবাদ থেকেই আবার বাংলায় অনুবাদ করলাম এইখানে। কর্তাভজাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা সম্পর্কে সচেতন থেকে এই অনুবাদ করার চেষ্টা সত্ত্বেও অবধারিতভাবেই মূল লেখার সঙ্গে কিছু ফারাক ঘটে যাবেই। সেইজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

১৭. Calcutta Historical Journal 6 no. 2 (1994)-এ প্রকাশিত সুমন্ত ব্যানার্জির প্রবন্ধ 'From Aulchand to Sati Ma: The Institutionalization of the Syncretist Kartabhaja Sect in Nineteenth Century Bengal' থেকে উদ্ধৃত এই অংশটি মূল ইংরেজি থেকে বর্তমান লেখকের দ্বারা বাংলায় অনূদিত।

১৮. ২০ চৈত্র ১২৭০ বঙ্গাব্দের 'সোমপ্রকাশ' থেকে এই অংশ হিউগ বি আরবান-এর 'The Economics of Ecstasy Tantra, Secrecy and Power in Colonial Bengal' বইয়ের ৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১৯. সুমন্ত ব্যানার্জির 'The Parlour and The Streets : Elite and Popular Culture in Nineteenth Cen- tury Calcutta' বইয়ের পৃ. ৬৯ থেকে উদ্ধৃত ও মূল ইংরেজি থেকে বর্তমান লেখক দ্বারা অনূদিত।

২০. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হরিপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দাশরথি রায়ের পাঁচালি'-তে কর্তাভজা পাঁচালির পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে।

২১. কালকূট (সমরেশ বসু)-র 'কোথায় পাবো তারে', পৃ. ২২৮।

ভাষার স্বাস্থ্য কীভাবে বুঝব

সজল রায়চৌধুরী

মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের প্রথম সম্বোধন-সম্ভাষণে যে 'এলেবেলে' কথাটা বাঙালি ব্যবহার করে থাকে তা হলো 'ভালো আছেন?' প্রশ্নকর্তা যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বা দাঁতব্যথা নিয়ে জানতে চাইছেন, তা নয়। নেহাতই সৌজন্যমূলক কথা। কিন্তু ভালো থাকাথাকির ব্যাপারটা সৌজন্যের মধ্যেও যে ঢুকে গেছে তাতে বোঝা যায় স্বাস্থ্যের ভালোমন্দ একটা জরুরি ব্যাপার।

এই স্বাস্থ্যের বিভিন্ন মাত্রাও চিহ্নিত করা হয়েছে—'রামবাবু এখনো দারুণ ফিট', 'রামবাবুর শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না', 'রামবাবু অসুস্থ', 'রামবাবু গুরুতর অসুস্থ', 'ডাক্তার রামবাবুকে জবাব দিয়েছেন', 'রামবাবু চলে গেলেন'।

রামবাবুর স্বাস্থ্যের মতো ভাষার স্বাস্থ্যেরও নানা মাত্রা আছে। শুধু ভাষা বিপন্ন বললে প্রকৃত চেহারাটা বোঝা যায় না। যেমন বাংলা ভাষার সমস্যা ও সংকটের সঙ্গে সাঁওতালি, সাদরি, কুরুখ, টোটো বা ধিমাল ভাষার বিপন্নতা একরকম নয়। ভাষার ক্ষেত্রে বলা হয় নিরাপদ, দুর্বল, ভঙ্গুর, মুমূর্ষু, মৃত। যে ভাষায় 'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন', যার শেষ কথকের মৃত্যু ঘটেছে—সে ভাষা মৃত। এটা বোঝা যায়। কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরগুলো কী দিয়ে চিহ্নিত করব? সামগ্রিকভাবে ভাষার প্রাণশক্তির পরিমাত্রাগুলো কী তা আগে বুঝে নেওয়া যাক।

ভাষার প্রাণশক্তি নির্ণয়ের উপাদান

সাধারণ অভিজ্ঞতার নিরিখেই আমরা বুঝতে পারি ইংরেজি, ফরাসি, চিনা, জাপানি ইত্যাদি সবল প্রাণবন্ত ভাষা। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু ভাষা ঝরে পড়ার জন্য ম্রিয়মাণ হয়ে অপেক্ষা করছে। এই অনুমানটা হয়তো ঠিক কিন্তু শুধু আন্দাজ বা অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চলে না। কেন কোনো কোনো ভাষা প্রাণবন্ত, কোনো ভাষা 'হীনবল দিন দিন'— তার পরিমাত্রাগুলো নির্ধারিত হওয়া দরকার। আশির দশক থেকেই ভাষার মৃত্যু মিছিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই তাগিদ প্রবল হয়ে ওঠে। নানারকম ভাবনাচিন্তা চলে। অবশেষে ২০০৩ সালে ভাষাবিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত ইউনেসকোর অ্যাডহক এপার্ট গ্রুপ 'ভাষার প্রাণশক্তি ও বিপন্নতা' নামে একটি দলিল প্রকাশ করে। সেই দলিলে ভাষার প্রাণশক্তির ন'টি উপাদান চিহ্নিত করা হয়:

১. এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে ভাষার প্রবাহ।
২. গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা।
৩. মোট জনসংখ্যার মধ্যে বাচকদের অনুপাত।
৪. ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রগুলির প্রবণতা।
৫. নতুন ক্ষেত্র ও গণামাধ্যমে অবস্থান।
৬. ভাষাশিক্ষা ও সাক্ষরতার জন্য সরঞ্জাম।
৭. দাপ্তরিক ক্ষেত্রে মর্যাদা ও প্রয়োগসহ সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাষানীতি।
৮. নিজ ভাষার প্রতি মনোভঙ্গি।
৯. তথ্যায়নের পরিমাণ ও গুণমান।

আন্তর্প্রাজন্মিক ভাষাপ্রবাহ

কোনো ভাষার প্রাণশক্তির মাত্রা ঠিক করতে গেলে সাধারণত প্রথমেই দেখা হয় ভাষাটা এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হচ্ছে কি না। দাদু-ঠাকুর্দারা যে মাত্রায় মাতৃভাষা ব্যবহার করে, বাবা-কাকাদের মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহারের সেই ধারাটা অক্ষুণ্ণ থাকছে কি না, আর তাদের সন্তানসন্ততিও একইভাবে মাতৃভাষায় কথা বলছে কি না এটাই লক্ষ্য করা দরকার। যদি দেখা যায় শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত মাতৃভাষায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত, তাহলে বলা

যায়, পর্যবেক্ষণের সময়ে ভাষাটি নিরাপদ। পর্যবেক্ষণের সময় নিরাপদ হলেই যে ভাষাপ্রবাহ বুড়ো ও মাঝবয়সী হয়ে শিশুদের ধাপ পর্যন্ত চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে তা বলা যায় না। আজকের বেগবতী নদী যেমন প্রাকৃতিক দুর্বিপাক বা মানুষের কেরামতির ফলে অনেক সময় নিম্নপ্রবাহে শুকিয়ে যায়, শেষে একদিন বিলুপ্ত হয়, তেমন-ই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে পরের প্রজন্মে অনেক ভাষা আর সাবলীলভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না। শিশুকিশোরদের ভাষিক আচরণেই ক্ষয়টা চোখে পড়ে। এভাবে যে কোনো ভাষা আজ নিরাপদ, কাল-পরশু বিপন্ন হতেই পারে। আক্ষরিক অর্থে 'কাল-পরশু' শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হচ্ছে না। পরবর্তী প্রজন্মে ভাষার প্রবাহ রুদ্ধ হতে সময় লাগে। কোনো ক্ষেত্রে কম সময়, কোনো ক্ষেত্রে বেশি। নিম্ন থেকে নিম্নতর প্রজন্মে ভাষাক্ষয় ধাপে ধাপে ঘটে। এজন্য মাঝে মাঝে সমীক্ষা করে নিম্ন প্রজন্মে মাতৃভাষা ব্যবহারের হালহকিকত বুঝে নিতে হয়।

বিভিন্ন প্রজন্মে মাতৃভাষা ব্যবহারের আপেক্ষিক পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ভাষার প্রাণশক্তির ছ'টি মাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে:

বাচক সংখ্যা	**স্তর**	**বিপন্নতার মাত্রা**
শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সে ভাষাটি ব্যবহৃত হয়।	৫	নিরাপদ
কোনো কোনো শিশু সব ক্ষেত্রেই এই ভাষা ব্যবহার করে, সব শিশু কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাষাটি ব্যবহার করে।	৪	নিরাপত্তা অনিশ্চিত
বাবা-কাকাদের ও তার ও পরের প্রজন্মেই ভাষাটি প্রধানত ব্যবহার হয়।	৩	অবশ্যই বিপন্ন
পিতামহ ও তাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মেই প্রধানত ভাষাটির ব্যবহার দেখা যায়।	২	মারাত্মক বিপন্ন
প্রপিতামহ প্রজন্মের মুষ্টিমেয় বাচকই টিঁকে থাকে।	১	সংকটজনকভাবে বিপন্ন
কোনো বাচক নেই।	০	মৃত

গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা বেশি হলেই তাদের ভাষার নিরাপত্তা সেই পরিমাণে বেশি হবে এমন কোনো কথা নেই। বঙ্গভাষার চেয়ে ফরাসি, জার্মান, জাপানি বা কোরিয়ান ভাষাভাষী সংখ্যায় অনেক কম। কিন্তু বাংলা ভাষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র হারিয়ে ওইসব তুলনামূলক সংখ্যালঘু ভাষাগুলির চেয়ে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছে। তবুও মোট জনসংখ্যা খুব কম হলে মহামারি, যুদ্ধ, ব্যাপক দেশান্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসব কারণে ঝাড়েবংশে নির্মূল হতে পারে। পাপুয়া নিউগিনি অঞ্চলের বেশ কিছু ছোটো ছোটো ভাষাগোষ্ঠী সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে লুপ্ত হয়ে গেছে। তা ছাড়া ছোটো ভাষাগোষ্ঠী সহজেই অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে অন্যভাষিক হতে পারে।

মোট জনসংখ্যায় বাচকদের অনুপাত

জনসংখ্যার মধ্যে কত শতাংশ মাতৃভাষায় কথা বলে, বোঝে ও কাজকর্ম চালায়, এটা ভাষার স্বাস্থ্যনির্ধারণে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দূর থেকেই একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। দক্ষিণ চীনে তুজা জনগোষ্ঠীর প্রায় দুলক্ষ লোক বাস করে। এদের স্বাভাবিক ভাষা ভোট-বর্মী গোত্রের তুজা ভাষা। কিন্তু এলাকায় চিনা ভাষার কোনো কোনো উপভাষার বাচক তুজাদের প্রায় দশগুণ। এদের প্রভাবে মাত্র ৩% তুজ নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে। মোটামুটি ভালো জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও ভাষাটি তাই মারাত্মকভাবে বিপন্ন।

একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার। মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দ হয়েও লোকে এক বা একাধিক অন্যভাষা শিখতে পারে। এটা কিন্তু ভাষা সরণ বা ভাষার স্বাস্থ্যহানির পরিচায়ক নয়। মূল কথাটা হচ্ছে স্বাভাবিক মাতৃভাষা কতজন জানে আর কতজনের মুখ থেকে তা হারিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের পরিস্থিতি দেখতে পাই—১) শিশুসহ সব প্রজন্ম সাবলীলভাবে মাতৃভাষা বলতে পারে। ২) বাবা-কাকা আর দাদু-দিদারা এ ভাষাটি ব্যবহার করে। শিশুরা ভাষাটি বুঝলেও সেটা ব্যবহার করে না। ৩) শুধু দাদু-দিদাদের মুখেই ভাষাটা টিকে আছে।

এক্ষেত্রে আবার শিশুদের মুখে কতটা টিকে আছে মাতৃভাষা, সেটা সবচেয়ে গুরুত্বের দাবি রাখে। ১৯৮০ সালে দেখা গিয়েছিল হাওয়াইয়ান জনগোষ্ঠীর ১৮

বছরের নীচের প্রজন্মে মাত্র ৫০ জন হাওয়াইন ভাষা বলতে পারে। বলাই যায় ভাষাটি তখন ছিল মুমূর্ষু। এই মুমূর্ষু অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ফলে হাওয়াইয়ান আবার সব প্রজন্মের মুখে ফিরে এসেছে, সে এক অসাধারণ উৎসাহ, উদ্যম ও মাতৃভাষা প্রীতির কাহিনি।

এখানে আমরা আবার আন্তর্প্রাজন্মিক ভাষাপ্রবাহের তটে এসে পড়লাম। গবেষক ক্রাউস গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা জাতির মাতৃভাষাবাচক সংখ্যা ও বয়সের দিক থেকে দশটি বৈশিষ্ট্যবাচক স্তরের কথা বলেছেন:

ক+ প্রতিটি বা প্রায় প্রতিটি শিশুসহ সব প্রজন্মে ভাষাটি কথিত হয়।
ক– ভাষাটি সব বা প্রায় সব শিশু শেখে।
খ+ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক (বাবা, কাকা ও তদূর্ধ) ভাষাটি বলে কিন্তু খুব কম শিশুই শেখে বা কোনো শিশুই শেখে না।
খ– তিরিশ ও তদূর্ধ বাপ-মায়েরা ভাষাটা বলে, কিন্তু নিম্নতর বয়সের দম্পতিদের বলতে দেখা যায় না।
গ+ চল্লিশের ঘরের ও তার ওপরের বয়স্করাই শুধু ভাষাটা বলে।
গ– সব কথকরাই পঞ্চাশ বা তদূর্ধ।
ঘ+ বাচকরা ষাট বা তদূর্ধ।
ঘ– সত্তর ও তদূর্ধ বাচকই দেখা যায়।
ঘ= সব বাচক সত্তর বা তদূর্ধ, এবং সংখ্যা ১০ জনের কম।
ঙ কোনো বাচক নেই, ভাষাটি মৃত।

ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রগুলির প্রবণতা

এই উপাদানের আলোচনার আগে আমাদের একবার পরিভাষার দিকটা দেখে নেওয়া দরকার। ভাষাবিপন্নতার পরিস্থিতিতে যে ভাষাগুলো জড়িত থাকে তাদের এক একজন লেখক এক একভাবে নামকরণ করেন। এতে প্রচুর বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

ভাষা বিপন্নতার পরিস্থিতিতে সাধারণত দুটো ভাষা ও সংস্কৃতি পরস্পরের মুখোমুখি হয়—একটা আগ্রাসী আর একটা আক্রান্ত। ধরা যাক 'খ' ভাষার বাচকরা 'ক'ভাষা গ্রহণ করছে। 'ক'ভাষা 'খ' ভাষাকে স্থানচ্যুত করছে।

দিনে দিনে কম লোক 'খ' ভাষা ব্যবহার করছে। 'ক' ভাষার সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 'খ' ভাষাকে কোন নামে চিহ্নিত করব—এ নিয়ে একটা সমস্যা আছে। একে নানাভাবে উল্লেখ করা হয়—সংখ্যালঘু ভাষা, ঐতিহ্যগত ভাষা, মাতৃভাষা, দমিত ভাষা, হুমকিগ্রস্ত ভাষা বা বিপন্ন ভাষা।

অন্যদিকে 'ক' ভাষাকে সংখ্যাগুরু ভাষা, মাতৃভাষা, অধিপতি ভাষা, ঘাতক ভাষা, অথবা ছাঁচ (matrix) ভাষা বলা হয়।

কতকগুলো কারণে এর সবকটা তকমাকেই আমরা এড়িয়ে যেতে চাই।

প্রথমত, সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু ভাষা ভুলপথে পরিচালিত করতে পারে, কখনো কখনো তা যথাযথও নয়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে কমসংখ্যক লোকের ভাষাকে সংখ্যালঘু ভাষা বলে, আসলে কিন্তু সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু ভাষা কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করে অর্থটা। ঐতিহাসিকভাবে কোনো অঞ্চলে একটা ভাষা হয়তো সংখ্যাগুরু ছিল, কিন্তু ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কারণে অঞ্চল বিভাজিত হওয়ায় সংখ্যাগুরু ভাষা নতুন অঞ্চলে সংখ্যালঘু ভাষা হয়ে যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যালঘু বললেই মনে হয় মোট বাচক জনসংখ্যার ওপরই ভাষিক প্রাণশক্তি নির্ভর করছে। কিন্তু আসলে তো ব্যাপারটা সেরকম নয়। অনেকগুলো উপাদানের মিলিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ওপর ভাষার জীবনমরণ নির্ভর করে।

শেষত, সংখ্যালঘু ভাষা বলতে অভিবাসী ও দেশজ দুধরনের সংখ্যালঘুকেই বোঝায়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হিস্পানি ভাষা সংখ্যালঘু কিন্তু বিপন্ন নয়।...এখানে আমরা অভিবাসীদের নয়, দেশজ ভাষাগুলোর বিপন্নতা ও পুনরুজ্জীবন নিয়েই ভাবিত। অভিবাসীদেরও ভাষাসরণ হতে পারে কিন্তু ছেড়ে আসা দেশে তাঁদের একটা বাচকভিত্তি রয়ে গেছে। দেশজ বলতে আমরা সেইসব ভাষাকেই বোঝাতে চাই যোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে শুরু হওয়া ইউরোপীয় উপনিবেশীকরণের আগে থেকেই যেসব ভাষা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল।

'মাতৃভাষা' কথাটার মধ্যেও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী প্রথম যে ভাষা লেখে তাকে মাতৃভাষা বলা হয়। বিপন্নতার পরিস্থিতিতে লোকে 'ক' ভাষাটা বেশি বেশি করে প্রথম ভাষা হিসেবে শিখছে

এমন দেখা যায়। পাশাপাশি 'খ' ভাষাটাও অন্যরা প্রথম ভাষা হিসেবে শিখছে। এমন ক্ষেত্রে 'ক' বা 'খ' যে কোনো একটা মাত্র ভাষার গায়ে 'মাতৃভাষা'র তকমা এঁটে দেওয়া সমস্যা সৃষ্টি করে।

'খ' ভাষা প্রসঙ্গে ঐতিহ্যিক ভাষা শব্দটিও আমরা ব্যবহার করিনি। উত্তর আমেরিকার গবেষকদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। শব্দগুচ্ছটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে।

আমাদের পছন্দের শব্দ 'স্থানীয় ভাষা'। 'স্থানীয় ভাষার' সুবিধে হচ্ছে, এতে বোঝা যায় পুনরুজ্জীবনের কাজ একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। ...'ক' ভাষাকে আমরা বলছি 'ব্যাপকতর সংজ্ঞাপনের ভাষা।' (গ্রেনোবল ও হোয়ালে/সেভিং ল্যাঙ্গোয়েজেস/কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস/ ২০০৬ পৃ. ১৪–১৫)।

এবার ফিরে আসা যাক ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র ও সুস্থতার সম্পর্কে। ভাষার সম্ভাব্য ব্যবহারের এলাকাই তার প্রয়োগ ক্ষেত্র। ঘরে কথা বলা, বাইরে গোষ্ঠীর অন্যলোকের সঙ্গে কথা বলা উৎসব অনুষ্ঠান ও পূজার্চনার ক্ষেত্রে ব্যবহার, শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভাষা ব্যবহার, সরকারি কাজকর্ম ও আদালতের কাজকর্মে ব্যবহার, আধুনিক গণমাধ্যম বেতার, দূরদর্শন ও কম্পিউটারে ব্যবহার ইত্যাদি কোনো ভাষার সম্ভাব্য প্রয়োগক্ষেত্র।

যে-ভাষার বিচরণ যত বেশি প্রয়োগক্ষেত্রে সে ভাষা তত শক্তিশালী। অন্যদিকে যে ভাষা যত কমক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল তার দুর্বলতা তত আশঙ্কাজনক। শক্তি ও দুর্বলতার কতকগুলো স্তরে ইউনেসকো ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রভিত্তিক ভাগ করেছে এভাবে:

সর্বজনীন ব্যবহার : সংযোগ, সংজ্ঞাপন, আত্মপরিচয়, চিন্তা, সৃজনশীলতা ও বিনোদনের ভাষা স্থানীয় ভাষা। তাছাড়া সবধরনের প্রতর্কক্ষেত্রেও সক্রিয়ভাবে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। বড়ো বড়ো ভাষার কথা বাদই দিলাম, ৭ কোটি বাচকের ভাষা কোরিয়ান গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে তো বটেই ব্যাবসাবাণিজ্য, সরকারি কাজ, উচ্চশিক্ষা, কম্পিউটার ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়।

ভিয়েতনামের মতো প্রাক্তন উপনিবেশ ও যুদ্ধবিক্ষত দেশ গড়জাতীয় উৎপাদনে অগ্রণীদের মধ্যে পড়ে। সেখানে ভিয়েতনামী ভাষা সর্বজনীন ক্ষেত্রে

ব্যবহৃত হয়। ষষ্ঠ শ্রেণির আগে কোনো বিদেশি ভাষা পড়ানো হয় না। বিদ্যালয় শিক্ষা তো বটেই উচ্চশিক্ষার মাধ্যমও স্থানীয় ভাষা। সর্বজনীন প্রয়োগক্ষেত্রের গুণে এ ধরনের ভাষাই শক্তির মাপকাঠিতে সর্বোচ্চ স্থানে আছে।

বহুভাষিক সমতা : এরকম হতে পারে যে এক বা একাধিক অধিপতি ভাষা সরকারি বা বেসরকারি দপ্তরে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু স্থানীয় ভাষাটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে, পাড়ার দোকানে, হাটে বাজারে বা স্থানীয় লোকের সামাজিক মিলনক্ষেত্রে চলতি আছে। এরকম ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা ও অধিপতি ভাষার সহ অবস্থান চলতে দেখা যায়। বাচকরা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বিভাষিক নীতি নিয়ে চলে। স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতা দেখা যায়। গোষ্ঠীর বয়স্ক লোকেরা শুধু নিজ ভাষাই চালিয়ে যায়। মনে রাখতে হবে বহুভাষিক সমতা ভাষাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নাও দিতে পারে। নিজের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষাটা দুর্বল অবস্থায় টিকে থাকতেই পারে। আবার হঠাৎ ভারসাম্য টাল খেয়ে দ্রুত ভাষাসরণ ও অবলুপ্তি ঘটতে পারে।

ক্ষীয়মান ক্ষেত্র : স্থানীয় ভাষা ক্রমে জমি হারাতে থাকে। বাবা-কাকার প্রজন্ম বাড়িতেও অধিপতি ভাষায় প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন চলোয়। এসব শুনে বাড়ির শিশুরা আধা-বাচকে পরিণত হয়। তারা ভাষাটা বোঝে কিন্তু ঠিকঠাক বলতে পারে না। যেসব পরিবারে স্থানীয় ভাষাটাও সক্রিয়ভাবে কথিত হয়, সেখানে দ্বিভাষিক শিশুর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

সীমিত বা আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র : একমাত্র আনুষ্ঠানিক বা উৎসব অনুষ্ঠান বা বয়স্কসমাবেশ ছাড়া ভাষার বিচরণের অন্য ক্ষেত্র নেই। আশ্রমে 'ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা'-এ ধরনের ক্ষেত্র যেখানে বাংলা অপরিহার্য, তেমন একটা ক্ষেত্র। (এটা শুধু তুলনা। বাংলার হাল এখনো এই চতুর্থ পাতালে পৌঁছায়নি।)

অতি সংকীর্ণ ক্ষেত্র : স্থানীয় ভাষাটির অল্পকিছু লোক কোনো বিশেষ উপলক্ষে মিলিত হয়ে দু-চারটি প্রায় ভুলে যাওয়া পদ্য বা গান আওড়ায়। সামান্য কিছু লোক ভাষাটা মনে রাখে কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্র পায় না।

বিলুপ্তি : ভাষাটা কোথাও কখনো আর ব্যবহৃত হয় না। যদি তাদের কোনো লিখিত রূপ না থাকে তাহলে কোনো দিন যে এই ভাষা এই ধরাধামে জীবনলীলার নানা সুর বাজিয়েছিল তার কোনো প্রমাণই থাকে না।

বিপন্নতার মাত্রা	স্তর	প্রয়োগক্ষেত্র
সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার	৫	ভাষাটি সব ক্ষেত্রে ও সর্বকর্মে নিয়োজিত হয়।
বহুভাষিক সমতা	৪	দুটি বা তার বেশি ভাষা বেশির ভাগ সামাজিক ক্ষেত্র ও বেশির ভাগ কর্মে ব্যবহৃত।
ক্ষীয়মান ক্ষেত্র	৩	ভাষাটি ঘরোয়া ব্যবহারে ও অনেকগুলো কাজে প্রয়োগ হয় কিন্তু অধিপতি ভাষা ঘরোয়া ক্ষেত্রেও ঢুকতে শুরু করে।
সীমিত ও আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র	২	সীমিত সামাজিক ক্ষেত্রে এবং কয়েকটা কাজেই ভাষার ব্যবহার।
অতিসংকীর্ণ ক্ষেত্র	১	খুব সামান্য ক্ষেত্রে খুব সামান্য কাজেই ভাষাটির ব্যবহার।
বিলুপ্ত	০	কোনো ক্ষেত্রে কোনো কাজে ভাষাটি ব্যবহৃত হয় না।

নতুন ক্ষেত্র ও গণমাধ্যমে ভাষাটির স্থান

একটা ভাষাগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ধরন যেমন যেমন বদলাতে থাকে তেমন ভাষাকে নতুন নতুন ক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। স্কুল, নতুন কাজের পরিবেশ, বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেট এসব এক একটা অভিনব ক্ষেত্রে যেমন দুর্বল ভাষাগুলো খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, অন্যভাবে বললে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না বলেই পিছিয়ে থাকে, দুর্বল হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে প্রায় ৭০০ ভাষার মধ্যে মাত্র ৪৮টি ভাষায় স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ বাকি মাতৃভাষাগুলোর জন্য এই ক্ষেত্রে কোনো প্রবেশাধিকার নেই। শুধু উত্তরবঙ্গেই ১০৮টি জনজাতির ভাষা আছে। বেতারে বা দূরদর্শনে তাদের কোনো স্থান নেই। বাংলাসহ ভারতের সংবিধানসম্মত কোনো ভাষারই সাইবার পরিসরে উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। ইংরেজি ও মান্দারিন দখল করে আছে সবচেয়ে বেশি জায়গা। হিস্পানি, ফরাসি, জার্মান, আরবি ও জাপানির যথাযথ স্থান আছে। কোরিয়ান ভাষা দখল করে

আছে বিশ্বসাইবার পরিসরের ২% স্থান। অথচ ভারতের সবকটা ভাষা মিলেও কোনো দশমিক বিন্দু পরিমাণ জায়গায় নেই এই সাইবার মহাসিন্ধুতে।

এই আধুনিক ক্ষেত্রগুলিতে দখলদারি কায়েম করে অধিপতি ভাষাগুলো স্থানীয় ভাষার অগ্রগতি রুদ্ধ করে দেয়। পুরোনো ক্ষেত্রগুলো হয়তো ক্ষয় পায় না, কিন্তু ইন্টারনেট বা দূরদর্শনের ভাষা এক জাদুকরি সম্মোহন সৃষ্টি করে।

স্থানীয় ভাষা আধুনিকতার এই চ্যালেঞ্জকে যদি গ্রহণ না করে তবে ক্রমশ সেই ভাষা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আধুনিক ক্ষেত্রে ভাষার অবস্থানের সঙ্গে ভাষার প্রাণশক্তির মাত্রা খুঁটিয়ে দেখা যাক:

প্রাণশক্তি বা বিপন্নতার মাত্রা	**স্তর**	**বিপন্ন ভাষা নতুন ক্ষেত্র ও গণমাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে**
প্রাণচঞ্চল	৫	সব নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
বলবান / সক্রিয়	৪	অধিকাংশ নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
গ্রহণশীল	৩	অনেক নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
মানানোর চেষ্টারত	২	কয়েকটি নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
যৎসামান্য	১	দু-একটা নতুন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত।
নিষ্ক্রিয়	০	কোনো নতুন ক্ষেত্রেই ব্যবহার নেই।

স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী এইসব প্রয়োগক্ষেত্রের ধরন ও ব্যবহার বিভিন্নরকম হয়। ধরা যাক একটা ভাষায় প্রথম বেতার ও দূরদর্শনে সম্প্রচার শুরু হল, কিন্তু মাত্র দিনে আধঘণ্টার জন্য। এত অল্প সময়ের ভাষিক উন্মোচন খুব কাজে লাগবে না। বড়োজোর ২ বা ৩-এর স্তরে সে উঠতে পারে। সাঁওতালি ভাষা খুব অল্পসময়ের জন্য প্রায় অসময়ে দূরদর্শনে পাওয়া যায়। এতে প্রশাসনিক অবহেলারই পরিচয় মেলে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিপন্ন ভাষাটি শুধু ব্যবহার হলে তা দিয়ে কিছু বোঝা যাবে না। দুটি মাত্রায় মাপকাঠি ঠিক করতে হবে (১) কোন স্তর পর্যন্ত সেই ভাষায় লেখাপড়া হয়। (২) পাঠ্যসূচি সর্বাঙ্গীণ ব্যাপকতায় অথবা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ভাষাটি ব্যবহার হয় কিনা। কোনো বিপন্ন ভাষা সর্বস্তরে, সব পাঠ্যবিষয়ে ব্যবহার হলে তার শক্তির স্তর অনেক বেশি। হবে। অন্যদিকে সপ্তাহে একদিন একঘণ্টার জন্য ভাষাটি পড়ালে গুরুত্ব অনেক কমে যাবে।

যে-কোনো একটা বৈশিষ্ট্য ধরলে বিপন্ন ভাষার, 'নতুন ক্ষেত্রে সাড়া' বোঝা যাবে না। চাকরি, শিক্ষা, গণমাধ্যম- সবগুলো মিলিয়ে বিচার করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা ও সাক্ষরতার জন্য সরঞ্জামের সুলভতা

ভাষার প্রাণশক্তির জন্য সেই ভাষায় শিক্ষা অত্যাবশ্যক। এমন কিছু ভাষাগোষ্ঠী আছে যাদের শক্তিশালী মৌখিক সাহিত্য থাকায় তারা তাদের ভাষা লিখিত হওয়ার পক্ষে নয়। আবার কোনো কোনো ভাষা সম্প্রদায়ে নিজেদের ভাষায় সাক্ষরতা অর্জন একটা গর্বের বিষয়। সাধারণভাবে সাক্ষরতার সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক বিকাশ যুক্ত।

সব বয়সের জন্য সব বিষয়ের বই এবং অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম থাকা দরকার। এদিক থেকেও ভাষার প্রাণশক্তির স্তরনির্ণয় করা যায়।

স্তর	স্তর লিখিত সরঞ্জামের সুলভতা/দুর্লভতা
৫	একটি প্রতিষ্ঠিত লিখন ব্যবস্থা আছে সাক্ষরতার পরম্পরায় ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক এবং দৈনন্দিন গণমাধ্যমের প্রচলন আছে। এই ভাষার লিখিত রূপ প্রশাসন ও শিক্ষায় ব্যবহার হয়।
৪	লিখিত বই, কাগজপত্র পাওয়া যায়, স্কুলে শিশুরা নিজ ভাষায় সাক্ষরতা লাভ করে। প্রশাসনে এই ভাষার ব্যবহার নেই।
৩	লিখিত সামগ্রী পাওয়া যায়। শিশুরা হয়তো স্কুলে নিজেদের ভাষায় লিখিত রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাক্ষরতাকে দৃঢ় করার কোনো উদ্যোগ থাকে না।
২	লিখিত সামগ্রীর অস্তিত্ব আছে। কিন্তু ভাষাগোষ্ঠীর অল্পকিছু সদস্যের কাছে তার গুরুত্বও থাকতে পারে, অন্যদের কাছে এর প্রতীকী গুরুত্ব ছাড়া কিছু নেই। স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের মধ্য দিয়ে সাক্ষরতা প্রসারের কোনো কর্মসূচি নেই।
১	ভাষা গোষ্ঠীর কাছে কাজ চালানোর মতো একটা লিখন রীতি জানা আছে। কিছু কিছু জিনিস লেখাও হচ্ছে।
০	কোনোরকম লিখন পদ্ধতি নেই।

ভাষা মনোভঙ্গি ও নীতি :

ভাষা মনোভঙ্গি নানাস্তরে বিরাজ করে : জাতীয় স্তরে, সরকারি স্তরে, সংখ্যাগুরু ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এবং স্থানীয় ভাষাগোষ্ঠীর স্তরে। সরকারি আর প্রাতিষ্ঠানিক মনোভঙ্গি অনেক সময়ই সংখ্যাগুরুর মনোভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়াও এই মনোভঙ্গির প্রভাব স্থানীয় ভাষাভাষীরা নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কী ভাবছে তার ওপর প্রভাব ফেলে।

আঞ্চলিক বা জাতীয় ক্ষেত্রে অধিপতি ভাষা সংস্কৃতিই শেষ বিচারে নির্ধারণ করে স্থানীয় ভাষাগুলো বাঁচবে, উন্নত হবে না কালগ্রাসে হারিয়ে যাবে। প্রকৃত উৎসাহ পেলে স্থানীয় ভাষাগুলি চনমনে হয়ে ওঠে, আবার উল্টোদিকে অধিপতি ভাষার চাপে স্থানীয়রা নিজ ভাষা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

অধিপতি সংস্কৃতি একটা মতাদর্শগত আবহাওয়া তৈরি করে। এমন একটা মূল্যতন্ত্র বানিয়ে নেয় যাতে তাদের নিজেদের ভাষাটাই অঞ্চল বা রাষ্ট্রের ঐক্যদায়ক প্রতীকে পরিণত হয়। যেখানে একাধিক ভাষা এই একই পরিসর দখল করার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের সংঘাতময় ভাষিক মনোভঙ্গি দেখা যায়। সাধারণ মানুষ মনে করতে থাকেন যে বহুভাষা থাকা জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, জাতীয় ঐক্যের পক্ষের তা ক্ষতিকারক। ধারণাটা অবশ্যই ভুল। একটা মাত্র অধিপতি ভাষাকে উৎসাহিত করে ঝগড়াঝাটির অবসান ঘটানোর চেষ্টা বিপজ্জনক। আইনসভায় এ নিয়ে বিল পাশ হতে পারে। সেই অনুসারে ভাষা নীতি আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে নিরুৎসাহ করতে পারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধও করতে পারে।

দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় ভাষা নীতি হিসেবেই তুরস্কে কুর্দ ভাষায় প্রকাশ্য স্থানে কথা বলাও নিষিদ্ধ ছিল। ভারতের ভাষানীতিও নিঃসন্দেহে দমনমূলক। পরাধীন ভারতে একসঙ্গে দুটো প্রবণতা কাজ করেছে। একদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় ভাষাগুলো শক্তিমান হয়ে উঠেছে—বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া/ তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও মালয়ালম/মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, উর্দু তাদের ভাষিক স্বাতন্ত্র্যের পতাকা তুলেছে। অন্যদিকে বিদেশি শাসকরা যেহেতু গোটা ভারতে শাসন চালাচ্ছে তাই একটা ভারতবোধও তাদের মধ্যে ছিল। এজন্য দেখি বাঙালি কবি উচ্চারণ করেন—'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার

দেশ'। আবার বাঙালির গানেই "ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র" লিখে দেশবন্দনা করেন। বহুজাতিক রাষ্ট্রে বোধের এই দ্বিমুখিতা স্বাভাবিক। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা প্রান্তগুলির এই আত্মপরিচয়ের টান কখনো ভালো চোখে দেখেনি। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে সারা ভারতের কংগ্রেস সার্কেলগুলোকে ভাষার ভিত্তিতে ২০টা ভাগে ভাগ করা হয়। তলার চাপে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রস্তাবও সমর্থন করে কংগ্রেস। ১৯২৮ সালে জওহরলাল, বল্লভ ভাই, পট্টভি (JVP) কমিটি পিছু হটার রাস্তা তৈরি করতে শুরু করেন—'কংগ্রেস দল যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি সমর্থন করেছিল তখন তারা এই নীতি কার্যকরী করার সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। অতএব এর ফলাফল ও পরিণতির কথা তারা বিচার করে দেখেনি।'

তখনকার নেতারা ভবিষ্যতের দেশশাসকদের শ্রেণিস্বার্থে একটা শক্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র চাইছিল। এজন্য একজাতি এক প্রাণের ধুয়া তুলেছিল। হিন্দিভাষাকে এই কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের কেন্দ্রমণি করে তুলেছিল। বৈষম্য তখন থেকেই শুরু। বড়ো বড়ো ভাষাগুলো আন্দোলনের পর আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। কেন্দ্রীয় শাসন বিনাযুদ্ধে সূচি পরিমাণ জমিও ছাড়েনি।

এরপর যারা বাকি রইল তাদের কয়েকটা ভাষাকে অষ্টম তফশিলভুক্ত করেও অবহেলায় ফেলে রাখা হল। ১০ হাজারের কম জন সংখ্যার কোনো ভাষাকে আদমশুমারির সময় গণনা করা হবে না বলে সরকারি নীতি ঘোষিত হল। নামহীন, পরিচয়হীন অন্ধকারে তাদের ছুড়ে ফেলা হল।

এই সবকিছুর ওপর আছে বিরাট ইংরেজি লবির ধার ও ভার। আফ্রিকার পর এশিয়ায় ভারতীয় উপমহাদেশ 'ঘাতক ভাষা'র থাবার নীচে কার্যত চলে যাচ্ছে।

তাত্ত্বিকভাবে ভাষার প্রতি সরকারি মনোভঙ্গির স্তরচিত্রটা দেখা যায়:

ভাষার প্রতি সরকারি মনোভঙ্গি	সমর্থনের ধরণ	স্তর
সবকটি ভাষাই সুসংরক্ষিত।	সমান সমর্থন	৫
সংখ্যালঘু ভাষাগুলি ব্যক্তিগত পরিসরে সংরক্ষিত। সেই ভাষা ব্যবহার কিন্তু সম্মানজনক।	বৈষম্যমূলক সমর্থন	৪

ভাষার প্রতি সরকারি মনোভঙ্গি	সমর্থনের ধরণ	স্তর
সংখ্যালঘুদের জন্য কোনো স্পষ্ট ভাষানীতি নেই, কাজকর্মের ক্ষেত্রে অধিপতি ভাষারই একাধিপত্য।	নিষ্ক্রিয় আত্মীকরণ	৩
অধিপতি ভাষার সঙ্গে আত্মীকরণের সক্রিয় আত্মীকরণ জন্য সরকার উৎসাহ দেয়। সংখ্যালঘু ভাষার কোনো নিরাপত্তা নেই।	সক্রিয় আত্মীকরণ	২
অধিপতি ভাষাই একমাত্র সরকারি ভাষা অন্য ভাষার স্বীকৃতিও নেই, সুরক্ষাও নেই।	বাধ্যতামূলক আত্মীকরণ	১
সংখ্যালঘু ভাষাগুলো নিষিদ্ধ।	নিষিদ্ধকরণ	০

নিজ ভাষার প্রতি মনোভাব

নিজ ভাষার প্রতি মনোভাব ভাষার স্বাস্থ্য নির্ণয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিজের ভাষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব একটি সর্বজনীন মনোভাব নয়। ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের আত্মপরিচয়ের পতাকা হিসেবে ভাষাকে গর্বের সঙ্গে বহন করতে পারেন, ভাষার উন্নতির জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালাতে পারেন, অথবা ভাষাটা তারা ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু উন্নয়নের চেষ্টায় হাত নাও লাগাতে পারে, অথবা নিজের ভাষাকে জঘন্য বলে মনে করে সক্রিয়ভাবে তাকে এড়িয়ে যেতে পারেন।

ভাষা জনসমষ্টির মনোভাব খুব ইতিবাচক হলে মাতৃভাষাকে তাঁদের গোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের প্রধান চিহ্ন হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করেন। ভাষাকে তারা সংস্কৃতির কোষকেন্দ্র হিসেবে দেখতে শুরু করে। অন্যপক্ষে, গোষ্ঠীর লোকজন যদি নিজ ভাষাকে আর্থিক উন্নতি ও সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে, তাদের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে।

আর একটা বড়ো কারণের কথা ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন—"পৃথিবী জুড়ে দেখা যাচ্ছে বহিরাগতরা বহু আদিবাসী গোষ্ঠীকে 'আদিম' পিছিয়ে পড়া ইত্যাদি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এর ফলে কয়েক প্রজন্ম ধরে বাচকরা স্থানীয় ভাষায়

কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছে। নিজেদের সন্তানসন্ততির সঙ্গেও নিজ ভাষায় কথা বলতে চায় না। ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা মূল্যায়নে নিজ ভাষা যে কোনোভাবেই হোক মূলত 'খারাপ' বলে মনে হয়, বিপরীতে বহিরাগত অধিপতি ভাষা/সংস্কৃতি 'ভালো'। (Danchenhaur and Danchenhauer/Technical, ideological issues in reversing language shift 1998.)

বাংলার বাইরে কিছু বাঙালি নিজেদের আর বাঙালির পরিচয় দিতে চাইছেন না। কলকাতা শহরেই কলেজে ইংরেজি মাধ্যম থেকে আসা পড়ুয়ারা বাংলা মাধ্যম থেকে আসা পড়ুয়াদের ব্যাঙা বলে ডাকে (সেই কলেজের প্রত্যক্ষ শ্রোতা শিক্ষকের কাছে শোনা)। ইংরেজি মাধ্যম বাংলা মাধ্যমের চেয়ে কুলীনগোত্রের হয়ে গেছে। ইংরেজি বলা কওয়ার সঙ্গে সামাজিক কৌলীন্যের যোগ বিশ শতকের প্রথমে গ্রামবাংলাতেও কত নিবিড় হয়ে দেখা দিয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে অল্প শিক্ষিত দোকানদার গোকুলের এক সংলাপেই তা স্পষ্ট। পিতৃশ্রাদ্ধে শহর থেকে এসেছে গোকুলের ছোটো ভাই অনার্স পাশ বিনোদ। সে তাঁর বন্ধুবান্ধব, হাকিম ইত্যাদির সঙ্গে বাংলায় কথা বলেছিল। গোকুল বলল, "বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কচ্চ না কেন? ওরা হাকিম হুজুর, ওদের কি বাংলা বলা সাজে? পাঁচজনে শুনলেই বা তোমাকে বলবে কী?"

বিন্দুমাত্র ইংরেজি জ্ঞানহীন গ্রামের এক সরল হৃদয়বান দাদা চায় কৃতী ভাইটি রাজার ভাষায় কথা বলুক রাজকর্মচারীদের সঙ্গে এবং সেই দুর্বোধ্য ভাষার বিচ্ছুরিত আলোতে আলোময় হোক স্নেহশীল দাদা। আজ থেকে কাঁটায় কাঁটায় একশো বছর আগে এই লেখা। উপনিবেশের সংস্কৃতি কীভাবে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতিকে হেয় করতে শেখায় তার অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে এটি অন্যতম। উপনিবেশ সেভাবে আর নেই। কিন্তু এ দেশে কর্তা মারা যাওয়ার পরও কর্তার ভূত আরো দাপট নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আমরা এই আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছি। 'ভাষা বিপন্ন! কোথায় ভাষাবিপন্ন—দিব্যি চলছে'—এ ধরনের আড্ডাচক্রের থেকে একটু অন্যভাবে গভীরে গিয়ে বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা করছি। কতকগুলি মাপকাঠি ইউনেসকোর (ল্যাঙ্গোয়েজ ভাইটালিটি অ্যান্ড এনডেনজারমেন্ট) ভাষাবিজ্ঞানীদের এক বিশেষ কমিটি ঠিক করে দিয়েছে। সেগুলো আমাদের মূল্যবান দিকনির্দেশক। প্রতি

দু'সপ্তাহে যখন পৃথিবীতে একটি করে ভাষা মারা যাচ্ছে তখন সত্যিই যদি আমরা কিছু করতে চাই তবে এ ধরনের তাত্ত্বিক হাতিয়ারগুলো রপ্ত করতে হবে।

সারা পৃথিবীতে আশির দশক থেকে ভাষা পুনরুজ্জীবন নিয়ে বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে। একটা কথা জোর দিয়ে বলা যায় গরিষ্ঠ ভাষার চাপে কোনো ভাষা যত মুমূর্ষুই হোক না কেন, যদি ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু অংশ চায় তবে প্রায় মৃত ভাষাকেও প্রাণবান করা সম্ভব। প্রমাণ দিয়েছে হিব্রু পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, মাওরি ও হাওয়াইয়ান পুনরুজ্জীবন আন্দোলন, আয়ারল্যান্ডের গ্যালিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলন। প্রচেষ্টা ও আন্দোলন চলেছে পৃথিবীর আরো বহু কোণায় কোণায়।

ভারতে আমরাই বা পারব না কেন?

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৫

কর্ণাটকে মাতৃভাষা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০১৩, ২০১৪)

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে দেওয়ানী উত্তরবিচার-অধিকেন্দ্র দেওয়ানী আবেদন নম্বর ২০১৩-র ৫১৬৬—৫১৯০ (এসএলপি[সি] নম্বর ২০০৮-এর ১৮১৩৯—১৮১৬৩ থেকে উত্থিত)

আবেদনকারী: কর্ণাটক রাজ্য সরকার ও অন্যান্য

বনাম

উত্তরবাদী: সরকার দ্বারা স্বীকৃত সরকারী সাহায্য না নেওয়া ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়েদের সংযুক্ত ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য

তৎসহ

আজ্ঞালেখ যাচনপত্র (সি) নম্বর ২০০৯-এর ২৯০

এবং

দেওয়ানী আবেদন নম্বর ২০১৩-র ৫১৯১-৫১৯৯ [এসএলপি[সি] নম্বর ২০০৯-এর ১৫৬৪০—১৫৬৪৮ থেকে উত্থিত)

রায়

১। সমস্ত বিশেষ নিবৃত্তি যাচনপত্র (leave petition)-এ নিবৃত্তি প্রদান করা হল। এস এল পি (সি) নম্বর ২০০৮-এর ১৮১৩৯—১৮১৬৩।

২। এই আবেদনসমূহ পেশ করা হয়েছে ০২/০৭/২০০৮ তারিখ সম্বলিত কর্ণাটকের হাইকোর্ট-এর রায় ও নির্দেশ-এর বিরোধিতা করে, আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নম্বর ১৯৯৪-এর ১৪৩৬৩-এ, যার সঙ্গে যুক্ত আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নম্বর

১৯৯৪-এর ১৪৩৭৭, ১৫৪৯১, ১৯৪৫৩, ২২৫৬৩, ২৫৬৪৭, ১৮৫৭১, ১৯৩৩১, ১৭৩৩৭, ১৮৭৮৭, ১৯৪৬৯, ২০১৬৫, ১৭৩৩৮, ২২৭৫২, ১৯৪৩৪, ১৭৬৭৭, ১৯৩৪৬, আজ্ঞালেখ আবেদন নম্বর ১৯৯৫-এর ২৪১৫, আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নম্বর ১৯৯৫-র ১১৭৮৫, ২৯৫৪০, আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নম্বর ১৯৯৬-এর ৩৪৩৯৬, ৩৪৬৮৪, ৩৪১৮৫, আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নম্বর ১৯৯৯-এর ৩০৬৪৫ এবং আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নম্বর ২০০০-এর ৯০০, যেমতাবস্থায় হাইকোর্ট এখনকার উত্তরবাদীদের পেশ করা আজ্ঞালেখ যাচনপত্রগুলো অংশত স্বীকার করেছিল।

৩। তথ্যের সংক্ষিপ্তসার:

(ক) কর্ণাটক সংস্থা নিবন্ধন আইন (Karnataka Societies Registration Act), ১৯৬০-এর অধীনে নিবন্ধভুক্ত একটি সংস্থা হল 'সরকার দ্বারা স্বীকৃত সরকারি সাহায্য না নেওয়া ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংযুক্ত ব্যবস্থাপক সঙ্ঘ' (এর পর থেকে সংক্ষেপে 'সঙ্ঘ' বলে উল্লিখিত), যে এই ক্ষেত্রে উত্তরবাদী। এই সঙ্ঘের অন্তর্গত হল কর্ণাটক রাষ্ট্রের সমস্ত স্বীকৃত অ-সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি মাধ্যম প্রাথমিক ও মধ্য বিদ্যালয়। ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫০এ ধারার অধীন সাংবিধানিক নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এক সরকারি আদেশের রূপে কর্ণাটক সরকার তার ভাষানীতি ঘোষণা করে। এই ভাষানীতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে নির্দিষ্ট করা হয় এবং যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা কন্নড় ভাষাকে প্রথম ভাষা হিসেবে বাছবে না, তাদের ক্ষেত্রে কন্নড়কে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। পূর্বোক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে এই বিচারালয়ে আবেদন করা হয় ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (English Medium Students' Parents Association) বনাম কর্ণাটক সরকার ও অন্যান্য, ১৯৯৪(১) এস সি সি ৫৫০ রায়ের বিরুদ্ধে, যে রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট তার ০৮/১২/১৯৯৩ তারিখের আদেশানুযায়ী ১৯/০৬/১৯৮৯-এর সরকারি আদেশকে বহাল রাখে ও সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে।

(খ) ০৮/১২/১৯৯৩ তারিখের সুপ্রিম কোর্টের পূর্বোক্ত আদেশের আলোকে কর্ণাটকের সরকার ২২/০৪/১৯৯৪ তারিখে একটি সংশোধিত সরকারি

আদেশ জারি করে ১৯/০৬/১৯৮৯-এর আগের আদেশের ভাষানীতিকে পুনঃ অনুমোদন করার উদ্দেশ্যে। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়দের কন্নড় মাধ্যম বিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণের সমস্যা ও কষ্ট বিবেচনা করে কর্ণাটকের সরকার ১৯৮৯ সাল থেকে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে ভাষানীতি প্রযুক্ত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছিল। এরপর, আগের সমস্ত আদেশকে নাকচ করে কর্ণাটকের সরকার ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখে একটি নতুন সরকারি আদেশ জারি করে যাতে এই রাজ্যে ১৯৯৪-১৯৯৫ বিদ্যায়তনিক বছর থেকে ভাষানীতিকে প্রযুক্ত করার কথা বলা হয়। সেই আদেশ মোতাবেক, রাজ্য সরকারের দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি শিক্ষার মাধ্যম, হয় মাতৃভাষা, নয়তো কন্নড় করতে হবে ১৯৯৪-১৯৯৫ বিদ্যায়তনিক বছর থেকে। অবশ্য, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অনুমতি দেওয়া হয় সেই সময়ে তারা যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত হচ্ছিল, তাই-ই বজায় রাখার। যে সমস্ত অননুমোদিত বিদ্যালয় প্রদত্ত শর্তাবলী পূরণ করছে না, তাদের বন্ধ করে দেওয়ার আদেশও জারি করা হয়।

(গ) বিরোধিতার মুখে পড়া উপরোক্ত সরকারি আদেশের ধারাবাহিকতায় অনেক বিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ জারি করা হয় তাদের শিক্ষাদানের মাধ্যম বদলানো এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বদল রুজু করতে। উপরোক্ত আদেশসমূহের দ্বারা পীড়িত বোধ করা বিভিন্ন ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, ধর্মীয় সম্প্রদায়, অভিভাবকগণ, অভিভাবক-সঙ্ঘ, সংখ্যাগুরুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাসংস্থার শিক্ষার্থী-অভিভাবক কর্ণাটক হাইকোর্টে ১৯৯৪-এর ১৪৩৬৩ নং ও তদযুক্ত আজ্ঞা লেখ যাচনপত্রসমূহ (writ petitions) পেশ করে। সেইসমস্ত আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে ২২/০৪/১৯৯৪ ও ২০/০৮/১৯৯৪ তারিখের সরকারি আদেশের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলা হয় যে তারা ভারতীয় সংবিধানের ১৪, ১৯ (১)(এ), ২১, ২৯ (২) ও ৩০ (১) ধারা লঙ্ঘন করছে।

(ঘ) হাইকোর্টের পূর্ণ ন্যায়াসন (Full Bench) তার ০২/০৭/২০০৮-এর রায়ের মাধ্যমে, আজ্ঞা লেখ যাচনপত্রসমূহকে মান্যতা দেয়- ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখের সরকারি আদেশকে বজায় রাখলেও সেই আদেশের ২, ৩, ৬ ও ৮ নং ধারা বাতিল করে দেয়, যার ফলে সরকার পরিচালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ছাড়া অন্য কোনো বিদ্যালয়ে এ আদেশ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়।

(ঙ) উপরোক্ত রায়ের দ্বারা পীড়িত বোধ করে কর্ণাটকের সরকার তাকে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বিবেচনাধীনে নিয়ে আসার আর্জি পেশ করেছে অজ্ঞালেখ যাচনপত্র (সি) নং ২০০৯-এর ২৯০ মাধ্যমে।

৪। উপরোক্ত আর্জিসমূহ ছাড়াও, কর্ণাটক রাজ্যের ১৫ জন অধিবাসী নিজেদের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানান যে তাঁরা সরকার অনুমোদিত সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে প্রাথমিক শিক্ষাদানের মাধ্যম যে শিশুর মাতৃভাষা হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী। তাঁরা সংবিধানের ৩২ নং ধারার অধীনে আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নং ২০০৯-এর ২৯০ পেশ করেন এই প্রার্থনা জানিয়ে যে ২৯/০৪/১৯৯৪-এর সরকারি আদেশকে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়দের ক্ষেত্রেও সংবিধান-স্বীকৃত বলে ঘোষণা করা হোক তাঁরা আরও প্রার্থনা জানান যে একটি নির্দেশমূলক আজ্ঞালেখ (writ of mandamus) যেন জারি করা হয় রাজ্য সরকারকে তার ২৯/০৪/২০০৪-এর সরকারি আদেশকে তদনুযায়ী বলবৎ করার জন্য।

আরও কিছু আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করা হয়েছে যাদের নম্বর হল এস এল পি (সি) নং ২০০৯-এর ১৫৬৪০- ১৫৬৪৮। এই যাচনপত্রগুলি পেশ করেছেন কর্ণাটক সরকারের শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। যাচনপত্র-পেশকারীরা এখানে কর্ণাটক হাইকোর্টের জ্ঞানী একক বিচারপতির ০৩/০৭/২০০৯ তারিখে দেওয়া রায়ের বিরোধিতা করেন, যে রায়ে এই কোর্টে মামলা চলাকালীন পর্যায়ে শুভোদয় বিদ্যা সংস্থা এবং সরস্বতী এডুকেশন সোসাইটিকে কর্ণাটকে একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় স্থাপন করার অনুমতি দিতে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৫। যেহেতু এই সমস্ত আবেদন ও আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের প্রার্থনা একই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত, তাই বর্তমান রায়ের মধ্য দিয়ে তাদের সবগুলোকে বিবেচনা করা হচ্ছে।

৬। আবেদনকারীদের পক্ষের জ্ঞানী অগ্রজ কৌসুলী শ্রী পি. পি. রাও ও শ্রী এইচ. সুব্রমন্য জোয়স, উত্তরবাদীদের পক্ষের জ্ঞানী অগ্রজ কৌঁসুলী শ্রী মোহন ভি. কাটারকি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জ্ঞানী অগ্রজ কৌঁসুলী শ্রী টি. এস. দোয়াবিয়া—এঁদের বক্তব্য শোনা হয়েছে।

৭. ২০/০৭/১৯৮২ তারিখের নির্দেশের মাধ্যমে কর্ণাটক সরকার আদেশ দিয়েছিল যে প্রথম শ্রেণি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রথম ভাষা একমাত্র কন্নড়ই হবে। এই নির্দেশের সাংবিধানিক বৈধতাকে প্রশ্ন করে একাধিক আজ্ঞা লেখ যাচনপত্র হাইকোর্টে পেশ হয়েছিল বিভিন্ন ভাষিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই পাল্টা দাবি করে যে তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে আর তাই প্রথম শ্রেণি থেকে কন্নড় ভাষাকে একমাত্র শিক্ষাদানের ভাষা করার নির্দেশ অসংবিধানিক, কেন না তা সেই অধিকারকে লঙ্ঘন করার মধ্য দিয়ে সংবিধানের ১৪, ১৯, ২১, ২৯ ও ৩০ নং ধারাকে লঙ্ঘন করে।

৮। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে কর্ণাটক হাইকোর্টের পূর্ণ বিচারপীঠ (Full Bench)-এ তার শুনানি হয় ভাষিক সংখ্যালঘু রক্ষা সমিতি (Linguistic Minorities Protection Committee)-র সাধারণ সম্পাদক বনাম কর্ণাটক সরকার, এ আই আর ১৯৮৯, কান্ট ২২৬-এ। সমস্ত পক্ষের দাবি ও বিভিন্ন সমিতির মতামত শোনা ও বিবেচনা করার পর পূর্ণ বিচারপীঠ তার ২৫/০১/১৯৮৯ তারিখের রায়ে মত দেয় যে ২০/০৭/১৯৮২ তারিখের সরকারি নির্দেশ সেই মাত্রাতেই অসাংবিধানিক, যে মাত্রাতে তা প্রথম শ্রেণি থেকে শিক্ষায় সমস্ত শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক ও একমাত্র ভাষা হিসেবে কলড়কে স্থাপন করতে চাইছে এবং তার মধ্য দিয়ে আবেদনকারীদের, যাদের মাতৃভাষা কন্নড় নয়, তাদের বঞ্চিত করছে স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ থেকে। উপরোক্ত আবেদনকারীদের পাশাপাশি, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (English Medium Students' Par-ents Association)-এর পক্ষ থেকেও একটি আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করা হয়েছিল এই দাবি করে যে তাদের ইংরেজি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে যেহেতু তাদের সঙ্ঘের সভ্যদের মধ্যে একটা বড় অংশ খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে ইংরেজিতে প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারী। এই প্রার্থনা পূর্ণ বিচারপীঠ নাকচ করে, যদিও, সরকারকে তার ভাষা নীতি সূত্রায়িত করার জন্য স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কর্ণাটক হাইকোর্টের পূর্ণ বিচারপীঠের উপরোক্ত রায়ের দ্বারা পীড়িত বোধ করে রাজ্য সরকার বর্তমান বিচারালয়ের অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও রাজ্য সরকার এই নীতি মেনে নেয় যে প্রথম

শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই হওয়া উচিত এবং সেই মোতাবেক ১৯/০৬/১৯৮৯-এ একটি সরকারি নির্দেশ জারি করে কর্ণাটক হাইকোর্টের পূর্ণ বিচারপীঠের রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, যে নির্দেশে বলা হয় যে যতদিন সরকারের প্রার্থনা সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন থাকছে, ততদিন প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে শিক্ষাদানের মাধ্যম মাতৃভাষাই থাকবে।

৯। ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের ৩২ নং ধারার অধীনে একটি আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করে ১৯/০৬/১৯৮৯-এর সরকারি আদেশকে এই মর্মে প্রশ্ন করে যে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে মাতৃভাষাকেই একমাত্র শিক্ষাদানের মাধ্যম করার নির্দেশ অসাংবিধানিক কারণ তা ওই স্তরে ইংরেজি মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নং ধারাকে লঙ্ঘন করছে!

১০। কর্ণাটক সরকারের পেশ করা আবেদন এবং ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘের পেশ করা অজ্ঞালেখ যাচনপত্রের শুনানি একসঙ্গে করা হয় এবং সুপ্রিম কোর্টের একটি সাধারণ রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। ০৮/১২/১৯৯৩ তারিখের রায়ের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট কর্ণাটক হাইকোর্টের পূর্ণ বেঞ্চের সিদ্ধান্তকেই বজায় রাখে। এরপর রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২২/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত একটি সরকারি আদেশ জারি করে যার মধ্য দিয়ে বলা হয় যে প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি শিক্ষাদানের মাধ্যম শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা হতে হবে। উক্ত সরকারী আদেশের প্রয়োগসীমার বাইরে সেই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে রাখা হয় যাদের ১৯৮৯ সালের আগে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে অসামঞ্জস্য তৈরি হল, কারণ, ১৯৮৯ সালের আগে চালু হওয়া ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো ইংরেজিতেই প্রাথমিক শিক্ষাদান চালিয়ে যাবে, অন্যদিকে ১৯৮৯ সালের পরে চালু হওয়া স্কুলগুলো বাধ্য হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দান করতে। এই অসঙ্গতি যখন সরকারের নজরে আনা হল, সরকার অবিলম্বে তার ২২/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত আদেশকে পাল্টে ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত একটি নতুন আদেশ জারি করল যেখানে উপরোক্ত ছাড় আর রাখা হল না।

১১। কর্ণাটকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংযুক্ত পরিচালক সমিতি হাইকোর্টে আজ্ঞালেখ যাচনপত্র নং ১৯৯৪-এর ১৪৩৬৩ পেশ করে ২২/০৪/১৯৯৪ ও ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত পূর্বোক্ত দুটি সরকারি আদেশের সাংবিধানিক বৈধতাকে প্রশ্ন করে। এই আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে রাজ্য সরকার তার বক্তব্য পেশ করে। সেই বক্তব্যে রাজ্য সরকার বলে যে সুপ্রিম কোর্ট তার ০৮/১২/ ১৯৯৩ তারিখে দেওয়া রায়ের মধ্য দিয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেওয়ার সরকারি নীতিকে সংবিধানসম্মত বলে ঘোষণা করেছে এবং যে সরকারি আদেশ দুটির বিরোধিতা করা হচ্ছে সেই দুটি ওই নীতির সমার্থক কারণ তাদের মধ্য দিয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম করার কথা বলা হয়েছে। হাইকোর্টের যে পূর্ণ বেঞ্চের সামনে উক্ত আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করা হয়েছিল, শেষাবধি তা ০২/০৭/২০০৮-এ সিদ্ধান্তে আসে যে ০২/০৪/১৯৯৪ ও ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত সরকারি আদেশদ্বয় কেবলমাত্র সরকারি বিদ্যালয় ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, কিন্তু সরকার দ্বারা অনুমোদিত হলেও বেসরকারি ও অ-সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুলদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

আবেদনকারীদের যুক্তি

১২। কর্ণাটক সরকারের জ্ঞানী বরিষ্ঠ কৌঁসুলি শ্রী পি. পি. রাও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা, ১৯৮৩-র কর্ণাটকের শিক্ষানীতির বিভিন্ন বিধান, ২০০৯-এর শিশুদের নিখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আইন (সংক্ষেপে 'আর টি ই আইন'), তাছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের বিবিধ সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে আলোচনা করার মধ্য দিয়ে এই বক্তব্য পেশ করেন যে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সংঘের আর্জি-বিচারের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সরকারি নির্দেশকে বহাল রেখে যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল, তা হাইকোর্ট অনুসরণ করেনি এবং এই অনুসরণ না করার মধ্য দিয়ে ভুল করেছে। তিনি চিহ্নিত করেন যে একইভাবে হাইকোর্ট ভুল করেছে এটা বলার মধ্য দিয়ে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যম কী হবে তা বাছাই করার অধিকার একজন ছাত্র-ছাত্রী বা তার অভিভাবকের আছে কি না,

সেই প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট বিচারের মধ্যে আনেনি, যখন ঘটনা এটাই যে যাচকেরা (petitioners) এই প্রশ্নটিই তুলেছিল এবং সুপ্রিম কোর্ট তা নাকচ করে দিয়েছিল। তিনি আরও চিহ্নিত করেন যে, শিশুদের বৃহত্তর জাতীয় ও শিক্ষাগত স্বার্থে রাজ্য সরকারের নেওয়া নীতিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিশু (ছাত্র-ছাত্রী)-র মৌলিক অধিকার আছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের মাধ্যম বাছাই করার, এই মত প্রদান করার মধ্য দিয়েও হাইকোর্ট ভুল করেছে। তিনি বলেন যে হাইকোর্ট সংবিধানের ৩৫০-এ ধারা-কে খেয়ালে রাখেনি, যে ধারায় রাজ্য ও আঞ্চলিক প্রাধিকার-কে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হতে বলা হয়েছে এবং রাজ্য সরকারকে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী-র মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। এছাড়াও তিনি বক্তব্য রাখেন যে, হাইকোর্ট একইরকম ভুল করেছে এই মতদান করে যে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ক্ষেত্রেই বলবৎ হবে, যখন সব স্কুল একই শ্রেণিভুক্ত অনুমোদিত স্কুল হিসেবে, একমাত্র যারাই শিক্ষাদান করতে পারে। শেষত, তিনি আর্জি রাখেন যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বত্র একইরকম নীতি লাগু করার সরকারি নীতি কেবলমাত্র সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সমস্ত সরকারি সাহায্য-না-নেওয়া প্রতিষ্ঠানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা অনুমোদিত।

১৩। কন্নড় ভাষার জন্য সংগ্রামরত শিক্ষাবিদ' হিসেবে পরিচয়দানকারীরা, যারা সংবিধানের ৩২ নং ধারার অধীনে আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করেছিল, তারাও সমগোত্রীয় যুক্তি হাজির করেন।

উত্তরবাদীদের প্রতিযুক্তি

১৪। অন্যপক্ষে, সরকারি সাহায্য-না-নেওয়া ব্যবস্থাপক-গোষ্ঠীদের পরিচালিত স্কুলগুলোর পক্ষাবলম্বী বিভিন্ন জ্ঞানী কৌঁসুলি, ভাষিক সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানসমূহ, অভিভাবকগণ ও শিক্ষার্থীরা বক্তব্য পেশ করেন যে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা) মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া

পূর্ববর্তী বিধানে শিক্ষাদানের মাধ্যম নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি, তার বিষয় ছিল মাতৃভাষা/ কন্নড় অন্যতম ভাষা হিসেবে বিবেচিত হওয়া এবং অভিভাবক/শিশুদের নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যম বেছে নেওয়ার সমস্ত অধিকার থাকা। তাদের চোখে, সরকারি বিজ্ঞপ্তির আপত্তিজনক অংশগুলোকে বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্ট সম্পূর্ণ সমর্থনীয় কাজ করেছে এবং রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারের অবস্থান সমর্থনকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের ওঠানো যুক্তি বা অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই।

আলোচনা

১৫। আমরা সমস্ত প্রতিপক্ষীয় যুক্তি সযত্নে অনুধাবন করেছি, সাংবিধানিক বন্দোবস্তসমূহ মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি, এবং আলোচ্য সরকারি নির্দেশটির বিভিন্ন ধারা ও উভয়পক্ষের দ্বারা অবলম্বন করা বিভিন্ন সিদ্ধান্তও পড়েছি।

১৬। উভয়পক্ষের যুক্তি-প্রতিযুক্তির কেন্দ্রে আছে এই প্রশ্ন যে 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-য় শিক্ষাদানের মাধ্যম সংক্রান্ত বিষয়টি বিবেচিত হয়েছিল কি না এবং সেই সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছিল কি না? এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য উক্ত সিদ্ধান্তে ঘোষিত যুক্তিপরম্পরাকে বোঝা আবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়ায়।

১৭। বোঝাবুঝির সুবিধার জন্য, পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও, 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-র তথ্যগত পরিপ্রেক্ষিতটি পুনরুক্ত করা প্রয়োজন। কন্নড় ভাষার উন্নতিসাধনের স্বার্থে দায়বদ্ধ কর্ণাটকের সরকার ছয় জনের একটি সমিতি গঠন করে ড. ভি কে গোকক-কে তার সভাপতি করেছিল এবং তার বিবেচ্য হিসেবে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি নির্দিষ্ট করেছিল:

(ক) স্কুলের পাঠ্যনির্ঘণ্টে পাঠ্যবিষয় হিসেবে 'সংস্কৃত'-কে কি রেখে দেওয়া উচিত?

(খ) যদি রেখে দেওয়া উচিত হয়, তবে কীভাবে তা এমনভাবে রাখা যায় যাতে তা কন্নড়-এর বিকল্প না হয়ে ওঠে?

(গ) তিন-ভাষা-সূত্র অনুযায়ী কন্নড়-কে একটি অবশ্যপাঠ্য ভাষা করা কি উচিত হবে এবং বাকি দুইটি ভাষা বেছে নেওয়া কি শিক্ষার্থীদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে?

১৮। সেই সমিতি ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৮১ তারিখ সম্বলিত প্রতিবেদন জমা দেয়, সাধারণভাবে যা 'ড. গোকক কমিটি রিপোর্ট' নামে পরিচিত। সেই প্রতিবেদনে যা যা সুপারিশ করা হয়েছিল, সংক্ষেপে তা এই রকম :

(ক) তৃতীয় শ্রেণি থেকে আবশ্যকীয় পাঠ্যবিষয় হিসেবে কন্নড়-কে ঢোকানো উচিত।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণিতে) কন্নড়-ই হবে একমাত্র প্রথম ভাষা, ১৫০ নম্বরের উপর যার পরীক্ষা হবে, ১৯৮১-৮২ থেকেই তা কন্নড়-ভাষীদের জন্য লাগু করা হবে আর বাকিদের জন্য তা লাগু করা হবে ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকে, তাদের তৃতীয় শ্রেণি থেকে কন্নড়ে শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা ১৯৮১-৮২ থেকেই চালু হওয়ার উপর দাঁড়িয়ে।

১৯। উপরোক্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করার উপর দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার ৩০/০৪/১৯৮২ তারিখ সম্বলিত একটি আদেশ জারি করে যেখানে হাজির করা ভাষানীতিতে বলা হয় যে প্রথম ভাষা হবে কন্নড় বা মাতৃভাষা। ৩০/০৪/১৯৮২-র সরকারি আদেশটি কন্নড় ভাষী মানুষদের আকাঙ্ক্ষাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করছে না বলে বোধ হওয়ায়, গোটা ব্যাপারটাকে রাজ্য আইনসভার সামনে পেশ করাটাই যুক্তিযুক্ত বলে সরকার মনে করে। রাজ্য আইনসভা নির্ধারণ করে যে উচ্চ বিদ্যালয়ে কন্নড়ই একমাত্র প্রথম ভাষা হবে এবং ১২৫ নম্বরে তার পরীক্ষা নেওয়া হবে। তার পাশাপাশি কোনো শিক্ষার্থী অন্য যে কোনো দুটো ভাষা পড়তে পারে, যাদের প্রত্যেকটাতে ১০০ নম্বরে পরীক্ষা নেওয়া হবে। আইনসভার উপরোক্ত নির্ধারণের উপর দাঁড়িয়ে, রাজ্য সরকার ২০/০৭/ ১৯৮২ তারিখ সম্বলিত একটি আদেশ জারি করে যার মধ্য দিয়ে সরকার বলে যে কন্নড়ই হবে এক এবং একমাত্র প্রথম ভাষা। এই আদেশের দ্বারা পীড়িত বোধ করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্ণাটক হাইকোর্টে আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করে। তাতে তর্ক তোলা হয় যে এই সরকারি আদেশ ভারতীয়-সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নং ধারায় বর্ণিত সংখ্যালঘুর অধিকারসমূহকে লঙ্ঘন করছে। প্রথমে আজ্ঞালেখ যাচনপত্রটি নিয়ে বিচার একজন বিচারকের সামনে শুরু হলেও, পরে তা পাঠানো হয় 'বিচারকগোষ্ঠীর সভা' (Division Bench)-র কাছে। 'সাধারণ সম্পাদক, ভাষিক সংখ্যালঘু রক্ষা সমিতি (সুপরা)'-র পূর্ণ সভা তার মতামত জানায় নিম্নরূপে:

> **৮.... ২০শে জুলাই, ১৯৮২ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ,** যেমতাবস্থায় তা ভাষিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে কন্নড় ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে সম্পর্কিত, ভাষিক সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহকে প্রথম থেকে কন্নড় ভাষা পড়ানোতে বাধ্য করার সঙ্গে সম্পর্কিত, উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য এক এবং একমাত্র প্রথম ভাষা হিসেবে কন্নড়কে নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ভাষিক সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে এক এবং একমাত্র প্রথম ভাষা হিসেবে কন্নড়কে চালু করতে বাধ্য করার সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ভারতীয় সংবিধানের ২৯ (১), ৩০ (১) ও ১৪ নং ধারাকে লঙ্ঘন করছে।

এমত মতামত ব্যক্ত করে বিষয়টিকে 'বিচারকগোষ্ঠীর সভা'-র কাছে ফেরত পাঠানো হয় বিচার ঘোষণার জন্য এবং সেই মোতাবেক ২৫/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত রায় ঘোষণা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের সরকার ১৯৮৯-এর দেওয়ানী আবেদন নং ২৮৫৬-৫৭ পেশ করে।

২০। পূর্ণসভা (Full Bench)-র সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর, দেওয়ানী আবেদনটি যখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তখন, কর্ণাটক সরকার ১৯/০১/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত একটি সরকারি আদেশ জারি করে যার মধ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি শিক্ষাদানের মাধ্যম মাতৃভাষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উক্ত সরকারি আদেশটির সংশ্লিষ্ট পঙক্তিটি হল :

> ৯... সরকার এই নির্দেশ ঘোষণা করতে বাধিত হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হওয়ার আগে অবধি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত ভাষানীতি লাগু হবে।
>
> প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা, যেখানে আশা করা হচ্ছে যে সাধারণত পরিশিষ্ট-১-এর অন্তর্গত কেবলমাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক পঠনপাঠনের বিষয় করা হবে।

উপরোক্ত সরকারি নির্দেশকে ভারতীয় সংবিধানের ২৯, ৩০ ও ১৪ ধারা লঙ্ঘনকারী হিসেবে অভিযুক্ত করে এই কোর্টের কাছে ১৯৯১-এর ৫৩৬ নম্বর আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করা হয়।

২১। ইতিমধ্যে, ২২/০৬/১৯৮৯ তারিখে একটি সংশোধনী রুজু করা হয়, যার বক্তব্য ছিল :

> ১৬.... ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত উপরোক্ত সরকারি নির্দেশের 'নির্দেশ' অংশের (i) পঙক্তির, অর্থাৎ "প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি.... পঠনপাঠনের বিষয় করা হবে" শব্দসমূহের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পঙক্তি পড়তে হবে : "প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে, যেখানে আশা করা হচ্ছে সাধারণত মাতৃভাষা হবে শিক্ষাদানের মাধ্যম, পরিশিষ্ট-১-এর অন্তর্গত একটি মাত্র ভাষাই বাধ্যতামূলক পঠনপাঠনের বিষয় করা হবে।

২২। এই প্রেক্ষাপটে, এই কোর্ট তার ০৮/১২/১৯৯৩ তারিখ সম্বলিত রায়ে ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নিদের্শকে বহাল রাখে ও ১৯৯১-এর ৫৩৬ নং আজ্ঞালেখ যাচনপত্রকে যাথার্থ্যহীন বলে নাকচ করে।

২৩। কর্ণাটকের হাইকোর্টের পূর্ণসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পেশ করা ১৯৮৯-এর ২৮৫৬-৫৭ নম্বর দেওয়ানি আবেদন-এর বিষয়ে মত দেওয়া হয় যে হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত বিষয়টিকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করেছে এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়:

> ২৫.. ... হাইকোর্টের সুবিবেচিত রায়কে বহাল রাখতে আমাদের কোনো সমস্যাই নেই। বাস্তবত, সরকার এই অবস্থান স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেই মোতাবেক ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ জারি করেছে, যার আবার বিরোধিতা করা হয়েছে ১৯৯১-এর ৫৩৬ নম্বর আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে। সুতরাং দেওয়ানী আবেদনগুলিও খারিজ হবে। বিচার্য বিষয়ের এই পরিস্থিতিতে অবশ্য খরচ সম্পর্কে কোনো রায় ঘোষণা হবে না।

২৪। ০৮/১২/১৯৯৩ তারিখের পূর্বোক্ত রায়ের আলোকে কর্ণাটক সরকার ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত তার আগের নির্দেশে বিধৃত নীতিকে আবারও জোর দিয়ে হাজির করার উদ্দেশ্যে ২২/০৪/১৯৯৪, ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত সংশোধিত সরকারি নির্দেশাবলী জারি করে। এখন, উপরোক্ত সাক্ষ্যের আলোকে আবেদনকারীদের ও উত্তরবাদীদের বিতর্ককে পরীক্ষা করা যাক।

২৫। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জ্ঞানী বরিষ্ঠ কৌসুলি দাবি করেছেন যে ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ-এর ভিত্তি হল কর্ণাটক হাইকোর্টের পূর্ণসভা-র সেই রায় যা 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-তে সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদন করেছিল, সুতরাং ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ-এর উপর আধারিত ২৯/০৪/১৯৯৪-এর নির্দেশে কোনো দুর্বলতার জায়গা নেই।

২৬। অন্যপক্ষে উত্তরবাদী পক্ষ যুক্তি দেখিয়েছেন যে ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-র রায় ১৯/০৬/১৯৮৯-এর সরকারি নির্দেশের সাপেক্ষে দেওয়া, আর বর্তমান আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের বিষয়বস্তু হল ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ। তাছাড়া, তারা এও বলেছে যে 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)-র রায়ে ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশকে বিরোধের ঊর্ধ্বে ধরা হয়েছিল এই জন্য যে তার মধ্যে এমন কোনো উপাদান ছিল না যা প্রাথমিক স্তরে কন্নড় পড়া বাধ্যতামূলক করবে এবং তা অনুযায়ী, প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে, যেখানে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষাদানের মাধ্যম, পরিশিষ্ট-১-এর একটি মাত্র ভাষা শিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে, আর তৃতীয় শ্রেণির পর থেকে কন্নড়ভাষী নয় এমন শিক্ষার্থীদের জন্য কন্নড় একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে থাকবে। পক্ষান্তরে, বর্তমান আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে যার বিরোধিতা করা হয়েছে, সেই ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ এই কোর্টের দ্বারা অনুমোদিত ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশের অবস্থান থেকে সরে এসেছে এবং তার ২, ৩, ৬ ও ৮ নম্বর ধারার মধ্য দিয়ে ঝাড়কে ঘুরপথে বাধ্যতামূলক করেছে। সুতরাং এই কোর্টের আগের রায় বর্তমান আজ্ঞা লেখ যাচনপত্রের যাথার্থ্য খারিজ করে দেয় না। সুতরাং, উত্তরবাদীরা দাবি করেছেন যে, উক্ত নীতির আশ্রয় নিয়ে সরকার নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

২৭। হাইকোর্টের পূর্ণ সভার যে রায় এখানে বিচারাধীন, ০২/০৭/২০০৮ তারিখ সম্বলিতে সেই রায়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে হয়েছিল এইভাবে :

> ৭৯. এই নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই যে এইসমস্ত ধারা ১৯/০৬/১৯৮৯-এর সরকারি নির্দেশে কোনোভাবেই হাজির ছিল না।

এইগুলিকে ২৯/০৪/১৯৯৪- এর সরকারি নির্দেশে প্রথম বারের জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এই ধারাগুলির যাথার্থ্য এই কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে এর আগে হওয়া বিচারের বিষয় ছিল না। এই ধারাগুলির সাংবিধানিক বৈধতা এর আগে প্রশ্নের মুখে পড়েনি, এদের বিপক্ষে বা স্বপক্ষে কোনো শুনানি এর আগে হয়নি, এই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট এদের যাথার্থ্য বিচার করেনি এবং সেই মোতাবেক এদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণাও হয়নি। এই কোর্টের সামনে এই প্রথমবার পূর্বোক্ত ধারাগুলির বিরোধিতা হাজির হয়েছে। সুতরাং পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ এই আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্ধারিত কোনো বক্তব্য হাজির করছে না।...

৯০. পূর্বোক্ত পূর্ণ সভার রায়ে বিবৃত তথ্যাবলী থেকে স্পষ্ট যে বিবেচ্য প্রশ্নটি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকে আঞ্চলিক মাতৃভাষার পাশাপাশি কন্নড় পড়া বাধ্যতামূলক করার সরকারি নির্দেশ সংবিধানের ১৪, ২৯ ও ৩০ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করছে কি না এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরে কন্নড়কে একমাত্র প্রথম ভাষা হিসেবে নির্দিষ্ট করে সরকারি নির্দেশ সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩০ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করছে কি না। সুপ্রিম কোর্টের কাছে সংবিধানের ৩২ নম্বর ধারার অধীনে পেশ করা আজ্ঞালেখ যাচনপত্রের উদ্দিষ্ট বিষয়বস্তু যে ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ, সেই নির্দেশে আবার প্রশ্নটি ছিল পরিশিষ্ট-১-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো একটি মাত্র ভাষার বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য হওয়ার প্রশ্ন। এর আগে পূর্ণসভা পূর্ববর্তী সরকারি নির্দেশকে বাতিল ঘোষণা করেছিল কারণ তাতে কন্নড় পড়ার বাধ্যতা তৈরির প্রয়াস ছিল এবং সেইহেতু তা সংবিধানের ১৯, ২১ ও ৩০ নম্বর ধারা লঙ্ঘনকারী ছিল, এই রায় সুপ্রিম কোর্টও বহাল রেখেছিল। একই কারণে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের পরবর্তী ১৯/০৬/ ১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত নির্দেশের উপর হস্তক্ষেপ করেনি কারণ সেই নির্দেশে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি কোনো নির্দিষ্ট ভাষা পাঠের বাধ্যতা হাজির করা হয়নি, যা ওই সরকারি নির্দেশের ধারা-১ থেকেই স্পষ্ট। সুতরাং সর্বোচ্চ কোর্ট ও পূর্ণসভা—উভয়ের বিচার থেকেই যে অবস্থানগত মূলসূত্র উঠে আসছে তা হল : "সরকারি নীতিতে যদি এমন কোনো বাধ্য করার উপাদান থাকে যা ভারতীয় সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করছে,

তাহলে সেই নীতি বাতিল হবে এবং সেমত সরকারি নীতির ঊর্ধ্বে মৌলিক অধিকারসমূহের স্থান হবে। এইরকম কোনো বাধ্যতা হাজির না হলে বিচারালয় সরকারি নীতি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করবে না। একজন শিক্ষার্থীর, একজন অভিভাবকের অথবা একজন নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাছার অধিকার আছে কি না—এই প্রশ্ন উপরোক্ত বিচারপ্রক্রিয়ায় বিবেচ্য ছিল না, এই প্রশ্ন এই কোর্ট বা উচ্চতর কোর্ট তার বিবেচনার মধ্যে আনেনি, এবং এই প্রশ্নে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণাও করেনি। পূর্বের পূর্ণ সভার বিচারে হালকা ছলে বলা কথাবার্তা, মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাব থেকে কোনো অবস্থানগত মূলসূত্র নির্ণয় করা যায় না, বিশেষত সাংবিধানিক বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে, যেহেতু উক্ত প্রশ্ন এই বিচারে বিবেচনাধীনই ছিল না। সুতরাং, বর্তমান আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে ওঠান প্রশ্নটি এই কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী রায়সমূহেই বিবেচিত ও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে—এই দাবি ভিত্তিহীন আর তাই তা নাকচ করা হল।

২৮। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের উপর দাঁড়িয়ে হাইকোর্ট উত্তরবাদীদের এই দাবি গ্রহণ করেছিল যে সুপ্রিম কোর্ট 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)-র রায়ে বর্তমান আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে ওঠানো প্রশ্নটি বিবেচনা করেনি। এর ধারাবাহিকতায় হাইকোর্ট তার রায়ও ঘোষণা করেছিল, যে রায়কে প্রশ্ন করে এখানে বিচার চাওয়া হয়েছে।

২৯। বিচারাধীন ০২/০৭/২০০৮ তারিখ সম্বলিত রায়-এ আবেদনকারী, উত্তরবাদী ও হাইকোর্টের যুক্তি ও দাবিসমূহ যথাযথভাবে বিবেচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে হাইকোর্টে পেশ হওয়া আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে ওঠানো বিষয়-এর সঙ্গে 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-র কোনো সংযোগ নেই, ব্যাপারটা তা নয়। আগেই বলা হয়েছে যে ১৯৯১-এর ৫৩৬ নম্বর আজ্ঞালেখ যাচনপত্র পেশ করা হয়েছিল ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশের বৈধতাকে প্রশ্ন করে, যে নির্দেশে মাতৃভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব দেওয়া

হয়েছিল। ওই আজ্ঞালেখ যাচনপত্রটিকে ভিত্তিহীন বলে নাকচ করা হয়েছিল। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিত থেকে সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাবই বলবৎ রেখেছিল।

৩০। কিন্তু, এটাও সমানভাবে সত্য যে এখন বিরোধ যা নিয়ে, সেই ২২/০৪/১৯৯৪ ও ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশ ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশের সদৃশ নয়। যেহেতু উক্ত নির্দেশ পূর্ববর্তী নির্দেশে বদল ঘটিয়েছে অতিরিক্ত এমন কিছু ধারা যুক্ত করে, যে ধারাগুলিকে হাইকোর্ট ও এই কোর্টে দখিল হওয়া আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেই ধারাগুলিকে এখন দেখে নেওয়া যাক:

কর্ণাটক সরকারের কার্যবিবরণী

বিষয় : প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ভাষা নীতি লাগু প্রসঙ্গে সরকারি নির্দেশ

নম্বর ইডি ২৮ পি জি সি ৯৪ ব্যাঙ্গালোর, তারিখ: ২৯/০৪/১৯৯৪

২। সমস্ত সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি শিক্ষাদানের মাধ্যম হবে মাতৃভাষা অথবা কন্নড়। ১৯৯৪-১৯৯৫ বিদ্যায়তনিক বছর থেকেই তা লাগু করতে হবে।

৩। ১৯৯৪-১৯৯৫ বিদ্যায়তনিক বছর থেকে যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে, তাদের মাতৃভাষায় অথবা কন্নড়ে পড়াতে হবে।.....

৬। কেবলমাত্র যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাদের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে বর্তমান অনুমোদিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি অবধি পড়ার।...

৮। নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে সমস্ত অননুমোদিত বিদ্যালয়, যারা উপরোক্ত শর্ত পালন করবে না, তাদের বন্ধ করে দেওয়া হবে।

সুতরাং সরকারের দাবি আংশিকভাবে সত্য যখন সে বলছে যে বিরোধের মুখে পড়া সরকারি নির্দেশ, অর্থাৎ ২২/০৪/১৯৯৪ ও ২৯/০৪/১৯৯৪-এর সরকারি নির্দেশ অন্তর্বস্তুগতভাবে ১৯/০৬/১৯৮৯ তারিখ সম্বলিত সরকারি নির্দেশের সাথে সদৃশ যেহেতু উভয় নির্দেশই শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা আহরণ করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। ২২/০৪/১৯৯৪ ও ২৯/০৪/১৯৯৪ তারিখ সম্বলিত নির্দেশের ২, ৩, ৬ ও ৮ নম্বর ধারা, যার মধ্য দিয়ে একজন

শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা নিতে বাধ্য করার চেষ্টা হয়েছে, তা গুরুতর বিরোধের মুখে পড়েছে হাইকোর্টে এবং সুপ্রিম কোর্টে।

৩১। এই অতিরিক্ত ধারাগুলির বৈধতা নির্ধারণ করতে গিয়ে হাইকোর্ট বলেছিল যে 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-রায়ে একজন শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা নাগরিকের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার ভাষা মাধ্যম বেছে নেওয়ার অধিকার আছে কি না তা নির্ধারণ করা হয়নি। উক্ত প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণের স্বাধীনতা হাইকোর্ট নিয়েছিল।

৩২। এটা মাথায় রেখে যে সুপ্রিম কোর্টেরই একটি দুইজন বিচারকের সভা 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-য় শিক্ষাদানের মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত কি না সেই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমাদের মনে হয় যে একই প্রশ্নে ভিন্ন প্রেক্ষিতে ওই একই সংখ্যক বিচারকের সভার পক্ষে পুনর্বার সিদ্ধান্ত নেওয়া সমীচীন নয়। আমরা যদি উত্তরবাদীদের এই দাবি স্বীকার করি যে একজন শিক্ষার্থীর বা অভিভাবকের বা নাগরিকের অধিকার আছে প্রাথমিক স্তরে তার শিক্ষাগ্রহণের ভাষা বেছে নেওয়ার, তাহলে অন্তর্বস্তুগতভাবে আমরা বিরোধিতা করে ফেলব 'ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সঙ্ঘ (সুপরা)'-র রায়ের, যা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে তুলে ধরেছিল।

৩৩। যথাসর্বোচ্চ চিন্তান্বিত বিবেচনার পরও আমাদের মত যে একটি বৃহত্তর সংখ্যার বিচারকের সভায় এই বিরোধ বিবেচিত হওয়া উপযুক্ত হবে।

৩৪। আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে উত্থিত যুক্তিতর্কের মূল প্রশ্ন হল, মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষাকে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আরোপ করতে পারে কি না।

৩৫। যারা ভবিষ্যতের পূর্ণবয়স্ক নাগরিক, দেশের সেই শিশুদের বিকাশের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে এই প্রশ্নটির, যা এই আজ্ঞালেখ যাচনপত্রে তোলা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বছরগুলো একজন শিশুর শিক্ষাজীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্যায়। তাছাড়া, এই বছরগুলো শিশুর চিন্তাপদ্ধতিকে রূপ দেয় ও তার জ্ঞাপনক্ষমতা গড়ে তোলে। এইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জনের ও সাফল্যের ভিত্তিভূমি গড়ে দেয়। সার কথা হল এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা সঞ্চারিত মূল্যবোধ ও দক্ষতা-ই হল সেই ভিত্তি যার উপর ভবিষ্যতের সমস্ত

জ্ঞানার্জন গড়ে ওঠে। একইভাবে, ভাষা-র গুরুত্ব খাটো করা যায় না, আমাদের মনে রাখা উচিত যে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন মূলত ভাষার উপর ভিত্তি করেই হয়েছিল। তদুপরি, এই মামলার বিচার্য প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত কেবলমাত্র বর্তমান প্রজন্মের নয়, অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মদেরও মৌলিক অধিকারের বিষয়।

৩৬। এই সমস্ত প্রশ্নের সাংবিধানিক গুরুত্ব খেয়ালে রেখে, আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে একটি সাংবিধানিক সভা (Constitution Bench)-এর সামনে এই সমস্ত বিষয় বিচার হওয়া উচিত। এই সূত্রে, সাংবিধানিক বেঞ্চের বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক :

(ক) মাতৃভাষা মানে কী? যদি তার মানে হয় যে ভাষায় একটি শিশু স্বচ্ছন্দ বোধ করে, তাহলে কে তা নির্ধারণ করবে?

(খ) একজন শিক্ষার্থীর, বা অভিভাবকের বা নাগরিকের কি অধিকার আছে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম কোন্ ভাষা হবে তা বেছে নেওয়ার?

(গ) মাতৃভাষার আরোপ কি কোনোভাবে সংবিধানের ১৪, ১৯, ২৯ ও ৩০ নম্বর ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে?

(ঘ) সরকার দ্বারা স্বীকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে কি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি ও সাহায্য-না-নেওয়া বিদ্যালয়েরাও পড়ে?

(ঙ) সংবিধানের ৩৫০-এ ধারার বলে কি রাষ্ট্র ভাষিক সংখ্যালঘুদের বাধ্য করতে পারে কেবলমাত্র তাদের মাতৃভাষাকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাছতে?

উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও, সাংবিধানিক বেঞ্চ মামলার শুনানির সময় চলতে চলতে উঠে আসা আরও আনুষঙ্গিক প্রশ্নসমূহও বিবেচনার মধ্যে আসবে।

৩৭। উপরোক্ত প্রেক্ষিতে, যাচনপত্র/দরখাস্ত সমেত সমস্ত সম্পর্কিত বিষয় সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে রাখা হবে। যেহেতু এই বিষয়টির সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৯৪ সালে, এর দ্রুত নিষ্পত্তি বাঞ্ছনীয়। সুতরাং নিবন্ধককে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ দানের জন্য ভারতের সম্মানীয় প্রধান বিচারপতির সামনে তা হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

নয়া দিল্লী — পি সথসিভম
৫ই জুলাই, ২০১৩ — রঞ্জন গোগোই

সংযোজনী (অনুবাদকের যোগ করা)

উপরোক্ত রায়ের ধারাবাহিকতায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি সংবিধানিক বেঞ্চ (Constitution Bench) গঠিত হয় এবং উপরোক্ত বিষয়াবলী তার বিবেচনাধীন করা হয়। বিচারপতি এ কে পটনায়েকের নেতৃত্বে সেই বেঞ্চ ২০১৪-র জুলাইয়ে তার রায় ঘোষণা করে। সেই রায়ের সার কথা হল এই যে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার, এমনকি সে ভাষা মাতৃভাষা হলেও, কোনো সরকারের নেই। রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারপতি একে পটনায়ক বলেন:

> সংবিধানের ১৯(১)(এ) ধারায় বর্ণিত কথা বলা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্গত হল বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে তার নিজের পছন্দের ভাষায় একজন শিশুর শিক্ষিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র/সরকার সেই পছন্দের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না, এমনকি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষিত হওয়া শিশুর পক্ষে বেশি লাভজনক বলে রাষ্ট্র/সরকারের মনে হলেও তা আরোপ করতে পারে না।…
>
> সুতরাং, আমাদের রায় এই যে, একজন শিশুর, বা তার হয়ে তার বাবা-মা বা অভিভাবকের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে সেই ভাষাটিকে বেছে নেওয়ার যা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে তার শিক্ষার মাধ্যম হবে। কথা বলা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর যে কোনো সীমাবন্ধন আরোপ করা ব্যক্তি নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

তাছাড়াও, সাংবিধানিক বেঞ্চের মতে, রাষ্ট্রের দ্বারা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে আরোপ করা আরও একভাবে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহকে লঙ্ঘন করে: তা সংখ্যালঘুদের বিদ্যালয়ের বা সরকারি সাহায্য-না- নেওয়া বিদ্যালয়ের ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ইচ্ছামতো জীবিকা নির্বাহ করার অধিকার, যা সংবিধানের ১৯ (১)(জি) ধারায় বর্ণিত আছে, সেই অধিকারকে লঙ্ঘন করে। সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের ভাষায়:

> ‘বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ও চালানোর অধিকারের অন্তর্গত হচ্ছে নিজ পছন্দের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার অধিকার।’

ভাষিক সংখ্যালঘুদের পরিপ্রেক্ষিতে এই রায়ে বলা হয়েছে:

> ‘সুতরাং আমাদের রায় এই যে সংবিধানের ৩৫০ (এ) ধারা রাষ্ট্রকে এমন কোনো ক্ষমতা দিচ্ছে না যার বলে সে ভাষিক সংখ্যালঘুদের নিজ নিজ মাতৃভাষাকে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য করতে পারে।’
>
> (তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সোমবার, ২৮শে জুলাই, ২০১৪)

মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় **অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক**

‘মাতৃভাষা’ পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৫

শিক্ষার ভাষামাধ্যম, ভাষা শিক্ষা ও ‘স্বাধীনতা’-র অধিকার

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আলোচনা

বিপ্লব নায়ক

কর্ণাটক সরকার বনাম ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক সংঘ

১৯৯৪ সালে কর্ণাটক সরকার কর্ণাটকের সমস্ত সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে কন্নড় ভাষামাধ্যমে শিক্ষা চালু করার জন্য নির্দেশ জারি করে। এর বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ের পথ নেয় ইংরেজি-মাধ্যম-বিদ্যালয়ের ব্যাবস্থাপক সংঘ, এবং তার সঙ্গে কন্নড়-ভাষী নয় এমন ভাষিক সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধিরাও। বিরোধিতার মুখে পড়ে কন্নড় সরকার তার সরকারি নির্দেশে কিছুটা বদল করে কেবলমাত্র কন্নড় ভাষার বদলে কন্নড় ও অন্যান্য মাতৃভাষা করে। তারপরও ইংরেজি মাধ্যম-বিদ্যালয়দের ব্যবস্থাপক সংঘের বিরোধিতা জারি থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে কর্ণাটক হাইকোর্ট ও তারপর সুপ্রিম কোর্টে এই লড়াই চলে। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপক সংঘ ও তার পক্ষাবলম্বীদের মূল দাবি ছিল যে শিক্ষার ভাষামাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা আরোপ করার সরকারি পদক্ষেপ সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে। প্রত্যেক ছাত্র বা তার অভিভাবকের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ভাষামাধ্যম বেছে নেওয়ার, সেই বাছার স্বাধীনতাকেই লঙ্ঘন করে মাতৃভাষাকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষামাধ্যম করা। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ানী উত্তরবিচার-অধিকেন্দ্র এই মামলার শেষ নির্ণয়ের

জন্য একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠনের প্রস্তাব করে সেই বেঞ্চের বিবেচ্য প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম বলে চিহ্নিত করে নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী:

(১) মাতৃভাষা মানে কী? যদি তার মানে হয় যে ভাষায় একটি শিশু সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে, তবে কে তা নির্ধারণ করবে?

(২) প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে তা বেছে নেওয়ার অধিকার কি একজন শিক্ষার্থীর, অভিভাবকের বা নাগরিকের আছে?

(৩) মাতৃভাষার আরোপ কি কোনোভাবে সংবিধানের ১৪, ১৯, ২৯ ও ৩০ নম্বর ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে?

(৪) সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়ের মধ্যে কি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি ও সাহায্য-না-নেওয়া বিদ্যালয়গুলোও একইভাবে পড়ে?

(৫) রাষ্ট্র কি সংবিধানের ৩৫০(এ) ধারার বলে ভাষিক সংখ্যালঘুদের নিজ মাতৃভাষাকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেছ নিতে বাধ্য করতে পারে?

এরপর সুপ্রিম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতিকে নিয়ে একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠিত হয় এবং ২০১৪ সালে তা তার রায় ঘোষণা করে। সেই রায়ে বলা হয়েছে যে:

> ...একজন শিশুর, বা তার হয়ে তার বাবা-মা বা অভিভাবকের অধিকার আছে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে তার শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে তা স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার...।

ফলে, রাষ্ট্র বা অন্য কেউ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে শ্রেয় বা লাভজনক বলে মনে করলেও তার অধিকার নেই মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিতে কাউকে বাধ্য করার। তাছাড়া, সেই রায়ে এও বলা হয়েছে যে :

> ... বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ও চালানোর অধিকারের অন্তর্গত হচ্ছে নিজ পছন্দের ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার অধিকার।

ফলে, কোনো সরকার ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষামাধ্যমের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা চালানোর কাজের বিরুদ্ধে কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করতে পারবে না।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়সমূহের বিশদ অনুবাদ আমরা এর আগের লেখায় পাঠকদের সামনে হাজির করেছি কারণ আমাদের মনে হয়েছে যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে, তা যেমন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই সেই বিষয়ে সাম্প্রতিক এই রায়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও নির্ধারণ হাজির করছে। এখন সেই প্রশ্ন ও নির্ধারণগুলো নিয়ে আলোচনায় ঢোকা যাক।

মাতৃভাষা কারে কয়?

দেশের সর্বোচ্চ বিচারপীঠ এই প্রশ্ন উত্থাপন করে একটি সম্ভাব্য উত্তরও সাথে জুড়ে দিয়েছে। উত্তরটি হল এই যে একটি শিশু যে ভাষায় সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তা হল তার মাতৃভাষা। উত্তরটি যে খুব যুতের হল না, সেই অস্বস্তি থেকেই বুঝি পরের প্রশ্নটি উদ্গত হয়েছে—এই স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি কী, মাপবেই বা কে? কিন্তু এই প্রশ্নেরও আগে প্রশ্ন ওঠে যে, কোনো ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্য বলতে কী বোঝায়? একজন কোন ভাষায় স্বচ্ছন্দ বোধ করবে তা পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমান্ত এলাকার গ্রামের এক স্কুলশিক্ষক, আমার বন্ধু, তার গ্রামের লোকজনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ সেই এলাকার আঞ্চলিক ভাষায় (যার কোনো নির্দিষ্ট নাম এখনও ভাষাতাত্ত্বিকরা দিয়ে ওঠেননি), আমাদের শহুরে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ প্রমিত বাংলা ভাষায়, আবার স্কুলশিক্ষাদফতরের সঙ্গে পেশাদারী বিনিময়ে স্বচ্ছন্দ ইংরেজি ভাষায়। কোন্ ভাষাটিতে তাকে স্বচ্ছন্দ বলে ধরা হবে? আর ব্যাপারটা এমন নয় যে প্রাপ্তবয়স্কতার সঙ্গে কাজ-কর্ম-পেশা-র বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই কেবল এমনটা ঘটে। সেই সমস্ত শিশুরা, যারা বাড়িতে বেড়ে ওঠার সময় যে ভাষা আয়ত্ত করেছে, তা প্রচলিত কোনো 'প্রধান' ভাষা নয়, তারা যখন বাড়ির বাইরে প্রথম বিদ্যালয়ে বা অন্য কোথাও আসে, তখন মোটেই নিজের আয়ত্ত করা ভাষায় আর স্বচ্ছন্দ থাকতে পারে না, বাড়ির ভাষা বলার জন্য নানাভাবে তাকে ছোট করা হয়, কোনো না কোনো 'প্রধান' ভাষা-য় 'স্বচ্ছন্দ' হয়ে উঠতে তার উপর চাপ তৈরি হয়। এই চাপে কেউ কোনো না কোনো প্রধান ভাষায় 'স্বচ্ছন্দ' হয়ে ওঠে, আবার অনেকে 'নীরবতা'-কেই ঢাল করতে বাধ্য হয়। তাহলে এভাবে কী স্বাচ্ছন্দ্য অস্বাচ্ছন্দ্যে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা পাল্টে যেতে পারে বলে আমরা ধরে নেব? ফলত বোঝা যাচ্ছে

যে 'মাতৃভাষা' কী সেটাই ঘেঁটেঘুটে একসা হয়ে গেছে, সংজ্ঞানির্ণয় করতে গিয়ে সংজ্ঞায়িত বস্তুটিকেই ভূতুড়ে করে দেওয়া হয়েছে।

সংজ্ঞা অবশ্য খুব বিষম বস্তু। সংজ্ঞা হিসেবে সাধারণত শ্রেয় আয়নার মতো স্থির এমন সরসী-নীর যা অবিকৃত প্রতিবিম্ব ধরে, অথচ নীর কখনই অচঞ্চলা নয়, সদাই তার কম্পন প্রতিবিম্বকে ভেঙে-চুরে পুনর্নির্মাণ করে চলে। এ বিষম কাণ্ড 'মাতৃভাষা'-র সংজ্ঞার ক্ষেত্রে বুঝি বা বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য। 'মাতৃভাষা'-র সংজ্ঞায়নের বিবিধ প্রচেষ্টার সার-সংক্ষেপ হিসেবে ভাষাতাত্ত্বিক টোভ স্কুটনাব কাঙ্গাস যে পাঁচটি ধারাকে তুলে ধরেছেন তা এইরকম :

১) উৎস-নির্ভর সংজ্ঞা—যে ভাষা জন্মের পর কেউ প্রথম শেখে, যে ভাষায় প্রথম বাচনিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাই-ই হল তার মাতৃভাষা।

২) নিজ-সনাক্তকরণ-নির্ভর সংজ্ঞা—কোনো ব্যক্তি নিজেকে যে ভাষার বাচক হিসেবে সনাক্ত করে, সেই ভাষাই তার মাতৃভাষা।

৩) পর সনাক্তকরণ-নির্ভর সংজ্ঞা—কোনো ব্যক্তিকে যে ভাষার বাচক হিসেবে সনাক্ত করা হয়, সেই ভাষা তার মাতৃভাষা।

৪) দক্ষতা-নির্ভর সংজ্ঞা—কোনো ব্যক্তি সবচেয়ে দক্ষ যে ভাষার ব্যবহারে, সেই ভাষাই তার মাতৃভাষা।

(৫) কৃত্য-নির্ভর সংজ্ঞা—কোনো ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন যে ভাষা, সেই ভাষা তার মাতৃভাষা।

সংজ্ঞায়নের সমস্যা এর মধ্য দিয়ে সমাধিত হয় না, বরং নতুন করে বিবৃত হয়। কীভাবে, তার আলোচনা শেষ থেকে শুরু করা যাক। কোনো ব্যক্তি কোন্ ভাষাকে কতটা ব্যবহার করবেন (একাধিক ভাষা তাঁর আয়ত্বে আছে ধরে নিয়ে), তা কেবলমাত্র তাঁর স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কি? না কি তা অনেক বেশি মাত্রায় নির্ভর করে তিনি যে সমাজে আছেন, সেই সমাজে কোন্ ভাষার ব্যবহারের পরিসর কতটা বিস্তৃত, তার উপর? যেমন ধরা যাক, কবীর সুমনের গানে 'সাঁওতাল তার ভাষায় বলবে রাষ্ট্রপুঞ্জে' পঙ্‌ক্তিটি একটি স্বপ্নের বিস্তৃতি কারণ সাঁওতাল ভাষার ব্যবহারের কোনো পরিসর রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এখন অনুপস্থিত। ফলে এখনই কোনো সাঁওতালি-ভাষী তার একক স্বাধীন ইচ্ছায় সাঁওতালি ভাষাকে এই পরিসরে ব্যবহার করতে

পারেন না। সামাজিক, প্রশাসনিক ও পেশাগত ক্ষেত্রে গুটিকয় 'প্রধান'ভাষা ব্যবহারেরই পরিসর আছে। তাহলে সেইসব ভাষার বাইরে কোনো ভাষা-র, যেমন সাঁওতালি ভাষার কথককে সামাজিক-প্রশাসনিক-পেশাগত সেইসব ক্ষেত্রের বাইরে থেকে সাঁওতালিকে তার 'মাতৃভাষা' প্রমাণ করতে হবে আর নয়তো সামাজিক-প্রশাসনিক-পেশাগত ক্ষেত্রে কোনো না কোনো 'প্রধান' ভাষার ব্যবহারকারী হয়ে সেই ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা মেনে নিতে হবে। 'দক্ষতা'র ক্ষেত্রেও প্রশ্ন ওঠে যে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিসরই যদি থাকে সংকুচিত, তাহলে 'দক্ষতা' তৈরি হবে কীভাবে? কামতাপুরী ভাষামাধ্যমে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা—কোনো স্তরেই কোনো সুযোগ না থাকা অবস্থায় কামতাপুরী-ভাষী একজন পদার্থবিদকে যদি বলা হয় যে সে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে কামতাপুরী ভাষায় দক্ষ নয়, তাহলে তার কি কোনো যাথার্থ্য থাকে? আর তার 'মাতৃভাষা' নির্ধারণ কি এর উপর ভিত্তি করে হতে পারে?

পর-সনাক্তকরণ-নির্ভর সংজ্ঞা যে বেশ আপদের বিষয় হয়ে উঠতে পারে তা বোধহয় যে কোনো কামতাপুরী-ভাষী বলে দেবেন। দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভাষার কামতাপুরী ভাষা হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করে এলেও পশ্চিমবাংলার বাংলাভাষীদের একটা বড় অংশ তাকে বাংলা ভাষারই একটা 'উপভাষা' হিসেবে ভাবে এবং সেই হিসেবে তাঁদের মাতৃভাষাকে 'কামতাপুরী' নয়, 'বাংলা' বলেই নির্ধারণ করতে চায়।

নিজ-সনাক্তকরণও সমস্যামুক্ত নয়। কারণ 'প্রধান ভাষা'-গুলোর সামাজিক দাপটে ও 'অপ্রধান' একটি ভাষায় কথা বললে অপদস্থ হতে হওয়ার সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়ায় অনেক বাচক তার ঘরের ভাষাকে আড়াল করে প্রধান ভাষার বাচক হয়ে ওঠার দিকে ঝোঁকে। সেই অবস্থায় নিজ-সনাক্তকরণ কি মাতৃভাষার সঠিক নির্ধারণ হবে?

উৎস-নির্ভর সংজ্ঞা কোনো শিশুর জন্মের পর ঘরে পরিবারে সে যে ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে, প্রথম যে ভাষায় তার পরিপার্শ্বকে চিনছে, প্রথম যে ভাষার কথা বলছে, সেই ভাষাকে 'মাতৃভাষা' বলছে। এই ভাষা তাকে জ্ঞাপনের একটা হাতিয়ারই কেবল সরবরাহ করছে না, একটা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তার মননে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এই সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা

এখানেই যে শিশুর জীবনের এই প্রথম পর্বের পরের অধ্যায়গুলো নিয়ে এই সংজ্ঞা নীরব। ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা ফেলে শিশুটি যদি তার 'ঘরের ভাষা'-র মাধ্যমে শিক্ষার কোনো সুযোগ না পায়, অন্য কোনো ভাষামাধ্যমে তাকে পড়তে হয়, তারপর সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় হতে গেলে অন্য ভাষা মাধ্যমকেই আশ্রয় করতে হয়, তাহলে তার সঙ্গে তার 'মাতৃভাষা'-র বাস্তবিক সম্পর্ক কতটুকু কীভাবে থাকে, 'মাতৃভাষা'-র তাৎপর্য্য কতটুকু অবশিষ্ট থাকে?

সুতরাং যতই আমরা 'মাতৃভাষা'-র সংজ্ঞার অচঞ্চল আয়না-প্রতিম সরসী-নীর খুঁজে ফিরি না কেন, তা চঞ্চল হয়ে ওঠে বিবিধ টানাপোড়েনে। সে টানাপোড়েন ভাষাদের মধ্যের টানাপোড়েন, তাদের সামাজিক অস্তিত্বের টানাপোড়েন, সমাজচরিত্র অনুযায়ী এক সোপানতান্ত্রিক কাঠামোয় বিন্যস্ত হয়ে যাওয়ার টানাপোড়েন। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ বিচারপীঠ তার রায়ে 'শিক্ষার ভাষা মাধ্যম বেছে নেওয়ার' স্বাধীনতার যে অধিকারকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, সেই 'বেছে নেওয়ার' কাজটি কীভাবে হচ্ছে, তার স্বাধীনতা বা পরাধীনতার বৃত্তান্ত ইত্যাদি বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে বিচার করতে হবে এই ভাষা-প্রেক্ষাপটকে, যে প্রেক্ষাপট সরসী নীরের সদাচঞ্চলতায় প্রকাশ পায়।

ভারতের ভাষা প্রেক্ষাপট

ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে গ্রিয়ার্সন সাহেব প্রথম ভারতের ভাষা-গণনার উদ্যোগ নেন এবং ১৮৮৬—১৯২৭ সময়কালে ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা চিহ্নিত করেন। ব্রিটিশ রাজদণ্ডের অপসারণের পর ১৯৫১ সালের জনগণনায় ভারতীয় জনগণের 'মাতৃভাষা' হিসেবে মোট ৮৪৫টি ভাষা নথিভুক্ত হয়। এরপর ১৯৬১ সালের জনগণনায় 'মাতৃভাষা কী' এই প্রশ্ন করে উত্তরদাতাদের উত্তরকেই সরাসরি নথিভুক্ত করা হয়। তাতেই দেখা দেয় এক 'বিষম' কাণ্ড! জনসাধারণের সরাসরি উত্তর প্রণালীবদ্ধ করে জনগণকরা দেখেন যে ৩৮৮টি তফসিলী ভাষা, ৩০৪টি আদিবাসী ভাষা, ৫২১টি অ-বর্গীকৃত ভাষা, ১০৩টি বিদেশী ভাষা—অর্থাৎ মোট ১,৬৫২টি 'ভাষা' পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একে 'বিষম' বলার কারণ কী? সে কথা একটু খুলে বলা যাক।

ব্রিটিশ রাজদণ্ডের অপসারণের পর 'স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র' নির্মাণের সময় ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের ছাঁদ আদর্শ হিসেবে সামনে থাকার কারণে একটি 'জাতীয় ভাষা' চিহ্নিতকরণের প্রশ্ন ওঠে। ভারতের মতো ভাষাবৈচিত্র্যসম্পন্ন ভূখণ্ডে এই প্রশ্ন ক্রমশ চেহারা নিতে থাকে একটি 'সরকারি ভাষা' চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন ভাষা-কেন্দ্রিক রাজ্য গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। এই দুই ক্ষেত্রেই বহু দ্বন্দ্ব-বিরোধ দেখা দেয়, যেখানে সামগ্রিক ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার কৌশল হিসেবে ভাষা ও ভাষিক পরিচয়কে ব্যবহার করা হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতের নবনির্মিত সংবিধানের অষ্টম তফসিলে ২২টি ভাষাকে 'জাতীয় ভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করে স্থান দেওয়া হয় এবং ভারতীয় সরকারের 'ভাষা-আয়োগ'-এ এই ২২টি ভাষার প্রতিনিধিদের জায়গা হয়। অর্থাৎ, প্রাত্যহিক জীবনে, প্রশাসনে ও শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় এই ২২টি ভাষার ব্যবহার ও বিকাশের জন্য দায়বদ্ধতা স্বীকার করা হয়। এই ২২টি ভাষা ছাড়া অন্য সমস্ত ভাষার বাচকদের সামাজিক জীবনে, প্রশাসনে ও শিক্ষাব্যবস্থায় নিজের ভাষা ব্যবহার করার অধিকার অস্বীকৃত হয়। ২২টি 'প্রধান' ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠন ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গ হয়ে উঠে অগুন্তি 'অপ্রধান' ভাষার বাচকদের ভাষিক অধিকারকে অস্বীকার করে, 'অপ্রধান' ভাষাদের 'উপভাষা' বা 'আঞ্চলিক বিকৃতি' বলে এক ভাষিক সোপানতন্ত্র নির্মাণে মনোযোগী হয়। এই অবদমনের থেকে রক্ষা পেতে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের 'অভিজাত' বর্গে স্থান পাওয়ার দাবি নিয়ে কোনো কোনো ভাষার বাচকদের আন্দোলন জন্ম নেয়, ভাষিক ও জাতীয় উৎকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রাজ্যের পুনর্গঠনের দাবিও ওঠে। ব্রিটিশ পরবর্তী ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটা 'স্থিতিশীল' চেহারা দিতে ব্যগ্র ছিলেন তখন যে শাসক-প্রশাসকরা, তাদের কাছে তাই জনগণনায় ভাষা-সংখ্যার বিপুল 'বৃদ্ধি' বিষম এক অশনি সংকেত বই আর কী বা হতে পারে?

ফলত, ১৯৬১ সালের পর আর কখনও সরকারি জনগণনায় 'মাতৃভাষা কী?' এই প্রশ্ন করে উত্তরদাতার উত্তর সরাসরি নথিভুক্ত করা হয়নি। বরং উত্তরদাতার উত্তরকে প্রধান কোনো না কোনো ভাষার উপভাষা/আঞ্চলিক রূপ হিসেবে তার অধীনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুবা 'দশ হাজারের কম বাচক' বলে 'ভাষা'

হিসেবে নথিভুক্তই করা হয়নি। এইভাবে এখন ভারতে ভাষার সংখ্যাকে মোটামুটি ৪০০ থেকে ৫০০-র মতো রাখতে ভারতীয় প্রশাসকরা সফল হয়েছেন।

এর ফলে আজকের ভারতে অসংখ্য ভাষার বাচকদের নেই তাদের নিজস্ব ভাষিক পরিচয়ের স্বীকৃতিটুকুও, ভাষিক মানবাধিকার তো অনেক দূরের কথা। বিপুল ভাষাবৈচিত্র্যের দেশ ভারতে অলক্ষ্যে হত্যা হয়ে চলেছে বহু ভাষা। দুনিয়াজুড়ে ভাষাবৈচিত্র্যের যে প্রতিবেদন ভাষাতাত্ত্বিকরা তৈরি করেন, সেই 'এথনোলগ রিপোর্ট'-এর ২০০১ সালের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ভারতের ৪২৮টি ভাষার মধ্যে ইতিমধ্যে ১৩টি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এবং এই ভাষাগুলি মূলত ভারতের আদিম জনজাতিদের ভাষা ছিল। ২০০৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুস্থান টাইমস' সংবাদপত্রে ইউনেস্কো-র এক আধিকারিকের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী ভারতের ৪০০-র কাছাকাছি ভাষার মধ্যে ৭০% থেকে ৮০% অনিশ্চিত ভবিষ্যত ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ ভারতীয় সরকারের আধিকারিক বা প্রশাসকদের বক্তব্য জানতে চাইলে তাঁরা বলেন যে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এমন কোনো ভাষাই তারা ভারতে খুঁজে পান না![২]

এক একটি জনগোষ্ঠীর ভাষা যখন ক্রমাগত অল্পবয়স্ক বাচক হারাতে হারাতে, কেবলমাত্র বয়স্কদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে ও তারপর একসময় আসে যখন তার আর কোনো বাচকই জীবিত থাকে না, তখন তা বিলুপ্ত হয়। এভাবে এক একটি ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানের উত্তরাধিকারও ধ্বংস হয়ে যায়, প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা হারিয়ে যায় মানবসভ্যতার ভাণ্ডার থেকে। এইসব ধ্বংসকার্য চিন্তাহীনভাবে হয়ে যেতে দিয়ে কী নির্বিকার চিত্তেই না আমরা নিজেদের রিক্ত করে তুলছি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ বিচারপীঠের শিক্ষার ভাষামাধ্যম সংক্রান্ত নির্ধারণের তাৎপর্য আমরা বুঝে নিতে চাইব, তার জন্য শুরু করা যাক ভারতে শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা প্রসঙ্গ কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা বিবেচনা করার মধ্য দিয়ে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও ভাষাপ্রসঙ্গ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের উপজাত ইংরেজি মাধ্যম ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এক ধরনের সমালোচনা ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন

বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিকাশের অন্তর্গতভাবে গড়ে উঠেছিল। সেই সমালোচনার মূল বক্তব্য ছিল এই যে দেশের স্বকীয় সংস্কৃতি ও ভাষায় যার শিকড় প্রোথিত নয়, সেই 'আধুনিকতা' হল অন্তঃসারশূন্য, তার উপর ভিত্তি করে 'স্বাধীন' ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। 'স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ-এর মুখে তাই আমরা শুনি:

> কোনো ভারতীয় ভাষাকে নয়, বরং আমাদের কাছে যা বিদেশী, সেই ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষাদানের মাধ্যম করা হয়েছিল। এর ফলে ভারতে আধুনিক শিক্ষাকে অভারতীয় পদ্ধতিতে প্রদান করা শুরু হল। ভারতীয়দের বাধ্য করা হল নিজেদের মনকে তাদের স্বাভাবিক ছাঁচের বদলে কৃত্রিম ছাঁচে ঢেলে সাজাতে। জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন শাখায় ভারতীয়দের যাতায়াতটাই হল এক বিদেশী ভাষার পথ ধরে। এর ফল দাঁড়াল প্রত্যেক ভারতীয় শিশুর এক কৃত্রিম মন গড়ে ওঠা ও জ্ঞানার্জনের প্রতিটি বিষয়কে অস্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা। স্বাভাবিক একটি মন নিয়ে জ্ঞানচর্চার পবিত্র অঙ্গনে প্রবেশ করা তার আর হল না।[৩]

এইভাবেই ঔপনিবেশিক অধীনতা মুক্তির উপায় হিসেবে ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ভাবনা গুরুত্ব পেয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩৫০(এ) ধারা যুক্ত করা হয়, যেখানে বলা হয়:

> 'প্রত্যেক রাজ্য সরকার ও অন্যান্য আঞ্চলিক প্রাধিকারকে সেই রাজ্যের ভাষিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর শিশুদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে।'

সমস্ত শিশুর জন্য তার নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার এই ভাবনার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই বাধা ছিল বিস্তর। প্রথমত, আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সংবিধানের তফশিলভুক্ত 'প্রধান ভাষা'-গুলোকে কেন্দ্র করে ভাষিক ও জাতিগত পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষমতা-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা-চেষ্টা 'অপ্রধান ভাষার' বাচকদের ভাষিক অধিকারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিল। দ্বিতীয়ত, হিন্দি-হিন্দু উগ্র জাতীয়তাবাদ হিন্দি

ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া নেয়, তার প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক-সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠী হিন্দিকে একমাত্র সরকারি ভাষা করার বিরোধিতা করে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে রেখে দেওয়ার পক্ষে দাঁড়ায়। ফলে শিক্ষা, প্রশাসন ও জ্ঞানচর্চায় ইংরেজি ভাষা তার আধিপত্যকারী অবস্থান অনেকটাই ধরে রাখতে পারে। ফলস্বরূপ ভারতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা গুটিকয়েকই থেকেছে। ১৯৭৩-এ ভারতের বিদ্যালয়ে পাঠ্য ভাষার সংখ্যা ছিল মাত্র ৬৭, যাও ক্রমশ কমতে কমতে ১৯৯৩-এ দাঁড়িয়েছে ৪১-এ। আর প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা ১৯৮৬-তে ছিল মাত্র ৪৩, যাও কমতে কমতে ১৯৯৩-এ এসে দাঁড়িয়েছে ৩৩-এ। ফলে, দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র থেকে বেশিরভাগ ভাষাই বহিষ্কৃত হয়ে রয়েছে, এবং যে গুটিকয়ও বা স্থান পেয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকেও দিনের পর দিন নতুনভাবে বহিষ্কার ঘটে চলেছে।

ভারতের বিপুল ভাষাবৈচিত্র্যের প্রতি ও বিভিন্ন ভাষার বাচকদের ভাষিক অধিকারের প্রতি সংবিধানের ৩৫০(এ) ধারা যে গুরুত্ব প্রদান করেছিল, আজাদ-এর মতো চিন্তকরা দেশের স্বকীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে শিকড়-চারানো যে আত্মসচেতন শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছিল, সেগুলো সুদূর আদর্শ হিসেবে তোলা থাকতে থাকতে ক্রমশ অপ্রযোজ্য হয়ে উঠতে লাগল। আর ইংরেজি ভাষার আধিপত্য ক্রমশ বাড়তে লাগল ঔপনিবেশিক আমলের রীতি-মনোভাবের ধারাবাহিকতা এবং নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি দুইয়ের হাত ধরেই।

নাগাল্যান্ডের আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষা ছিল 'নাগামিজ'। ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারক ও ব্রিটিশ প্রশাসক-রা তাকে চিহ্নিত করেছিল 'কুকুরের ভাষা' ('ডগ আসামিজ') হিসেবে। 'অসভ্য'-দের 'সভ্য' করার জন্য তাদের মুখ থেকে এই 'কুকুরের ভাষা' মুছে 'সভ্য ভাষা ইংরেজি' প্রতিস্থাপন করার বিধান দিয়েছিল তারা এবং 'ধর্ম-প্রচারক', 'শিক্ষা প্রসারক' ও 'রাষ্ট্রীয় লৌহমুষ্ঠি'-র মিলিত শক্তিবলে তা রূপায়িত করেছিল। এর প্রভাব এমনভাবে রয়ে গেছে যে আজও নাগাল্যান্ডের বহু মানুষ 'নাগামিজ' ভাষা জানলেও সেই ভাষাকে তার 'মাতৃভাষা' হিসেবে বলে না, তারা নিজেদের ইংরেজি ভাষার বাচক হিসেবেই পরিচয় দেয়—১৯৮১-র জনগণনায় নাগাল্যান্ডের ৮৬.০৬%

মানুষই নিজেদের 'মাতৃভাষা' হিসেবে ইংরেজি-কে লিখিয়েছেন, নাগাল্যান্ডের 'সরকারি ভাষা' হিসেবে ইংরেজিকেই রাখা হয়েছে, শিক্ষামাধ্যম হিসেবেও ইংরেজিই ব্যবহৃত হয়।[৫]

ভারতে আদিবাসী মানুষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা সাঁওতালি, যা একটি অতি প্রাচীন ভাষা। ১৯৯১ সালের জনগণনায় ভারতে মোট ৫২ লাখের উপর মানুষ এই ভাষায় কথা বলেন এবং ৪৯ লাখের উপর মানুষ এই ভাষাকে নিজের মাতৃভাষা মনে করেন বলে জানা গেছে। বহু ইউরোপীয় ভাষার এত দীর্ঘ ইতিহাস ও এত বাচক নেই। অথচ সাঁওতালি মাধ্যমে শিক্ষা ভারতের কোনো রাজ্যেই এখনও ঠিকমতো চালু হয়নি। যৎকিঞ্চিৎ যা সাঁওতালি ভাষা পঠনপাঠনের সুযোগ আছে, সেখানে হয় ইংরেজি নয় তো সেই রাজ্যের 'প্রধান' ভাষার লিপিতে তা পঠনপাঠন হয়, সাঁওতালি ভাষার নিজস্ব লিপি 'অলচিকি লিপি' তৈরি হলেও তাকে 'অনুন্নত, 'অবৈজ্ঞানিক' বলে সরিয়ে রাখা হয়। ভারতের সমস্ত আদিবাসীদের ভাষার অবস্থাই ইতরবিশেষে এইরকম, বা আরও খারাপ, আরও সংকটজনক। এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়েই বহু আদিবাসী ভাষা আজ বিলুপ্তির বিপদের খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। (এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সহযোগে আলোচনা বর্তমান সংকলনের সপ্তম প্রবন্ধে করা হয়েছে।)

এমতাবস্থায় গত ২৫-৩০ বছর ধরে মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার লক্ষ্য সরিয়ে রেখে ইংরেজি ভাষা রপ্ত করার মাধ্যমেই 'উন্নতি' করার লক্ষ্য সামনে আনা হচ্ছে। 'জ্ঞান- অর্থনীতি' (Knowledge Economy) বলে একটা কথা চাউর করা হয়েছে যার মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে উচ্চশিক্ষার পেশা, আমলা বা উচ্চ বেতনের কেরানির চাকরি থেকে শুরু করে বি পি.ও বা কল-সেন্টারের মত পরিষেবা ক্ষেত্রের নতুন চাকরি পাওয়ার চাবিকাঠি হল ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা। এই বিজ্ঞাপনের উপর দাঁড়িয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা বিক্রির এক বিপুল ব্যবসা। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে—ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী মাসিক ২০০ টাকা থেকে শুরু করে মাসিক ২ লাখ টাকা অবধি বিভিন্ন দরের "ইংরেজি-শিক্ষা" বিক্রি হচ্ছে। সরকারি বা সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলো এই হুজুগে যোগ দিয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর ও নাগাল্যান্ড—এই

দুই রাজ্যে তো সরকারি বিদ্যালয়ে প্রধান ভাষা-মাধ্যম ইংরেজি করা হয়েছে ডোগরি বা নাগামিজ ভাষা "উন্নতির ভাষা" নয় বলে। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, দিল্লিতেও সরকারি বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষামাধ্যমে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু আদিবাসী ভাষা বা 'অপ্রধান ভাষা' নয়, সংবিধানে তফশিলভুক্ত হওয়া প্রধান ভাষাগুলোও এখন শিক্ষা-জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে ঘুঁটেকুড়ানি দুয়োরনিতে পরিণত হচ্ছে ক্রমশ।

এহেন সময়ে ২০০৫-এর ১৩ই জুন ভারত সরকার এক 'জাতীয় শিক্ষা আয়োগ' (National Knowledge Commission) গঠন করে শিক্ষা বিষয়ে প্রধামন্ত্রীর উচ্চপর্যায়ের পরামর্শদাতা হিসেবে। ২০০৬-এ এই আয়োগ তার প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করে যেখানে প্রধান ভাষা এবং শিক্ষার ভাষামাধ্যম হিসেবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে :

> জাতীয় জ্ঞান আয়োগ চিহ্নিত করেছে যে... উচ্চশিক্ষা, চাকরির সম্ভাবনা ও সামাজিক সুযোগসুবিধার প্রবেশপথের খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল ইংরেজি ভাষা বোঝার ক্ষমতা ও ইংরেজি ভাষায় দখল।...এক শতকের উপর সময়কাল ধরে ইংরেজি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অংশ। তা সত্ত্বেও ইংরেজি আমাদের দেশের বেশির ভাগ তরুণ-তরুণীর নাগালের বাইরে, যা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অসমতা তৈরি করে। বাস্তবিকপক্ষে এখনও, দেশের ১%-এর বেশি ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও ব্যবহার করে না, প্রথম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা তো দূরের কথা।[৬]

'জাতীয় শিক্ষা আয়োগ'-এর ভাবখানা এই যে ভারতীয়রা সবাই চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলতে ও ইংরেজিতে পঠন-পাঠন শুরু করে দিলেই ভারতে আর বেকারী, অসাম্য, বৈষম্য কিছু থাকবে না! রূপকথার গল্পেও এমন 'সোনার কাঠি' খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তা সেই 'সোনার কাঠি' ইংরেজি নিয়ে ব্যবসাপত্র জমিয়ে তুলতে ইন্ধনটা মন্দ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলি সব তাদের 'ইংরেজি-ঘাটতি' মেটাতে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর বিশেষজ্ঞদের মোটা দক্ষিণা দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের পুনর্প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ করতে শুরু করেছেন। বিদেশী বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়দের অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে তাদের

ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপণ্য নিয়ে এদেশে বিপণী খোলার জন্য। কর্মসংস্থান-বিশেষজ্ঞরা ইংরেজি ভাষা শিক্ষা (আর কিছু না হোক, 'স্পোকেন ইংলিশ'-শিক্ষা)-র 'অসীম গুরুত্ব' নিয়ে বেকারদের পরামর্শদান করছেন।[৭]

এই অবস্থায় কোনো ছাত্র/অভিভাবক যখন শিক্ষার ভাষা- মাধ্যম বেছে নেন, তখন 'বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার অধিকার' কি প্রযুক্ত হতে পারে? সেই আলোচনা এইবার আমরা করতে পারি।

বেছে নেওয়ার' স্বাধীনতা/অধীনতা

কোনো ছাত্র বা তার হয়ে তার অভিভাবক যখন কোন্ ভাষামাধ্যমে সে শিক্ষিত হবে, কোন্ ভাষা/ ভাষাসমূহ সে অধ্যয়ন করবে, তা বাছে/বাছবে তখন কিছু বাধ্য-বাধকতা সেই বেছে নেওয়ার কাজকে নির্ণীত করে দেয়, যে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে মূল কয়েকটিকে আগের আলোচনার সূত্র ধরে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি এইভাবে :

(১) যদি আমরা ধরে নিই যে ভারতে ৪০০টির মতো ভাষা আছে (যদিও আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে সরকার-নির্ধারিত এই সংখ্যা অনেক অনেক কমিয়ে ধরা হয়েছে, প্রকৃত সংখ্যা হয়তো ১০০০-এরও বেশি), তাহলে প্রাথমিক শিক্ষা শুরুর মুহূর্তে প্রতি ১০টি ভাষার মধ্যে ৯টি ভাষার বাচকরাই ইচ্ছা থাকলেও তাদের নিজেদের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বা পাঠ্যবিষয়— কোনোভাবেই বাছতে পারবে না কারণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে মাত্র ৪০টি-র মতো ভাষাই মাধ্যম বা পাঠ্যবিষয় হিসেবে আছে (পূর্বে উদ্ধৃত NCERT-র সমীক্ষার ফল অনুযায়ী)। সুতরাং ৯০% ভাষার বাচকদের নিজের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম বা পাঠ্যবিষয় হিসেবে বাছার সুযোগটাই দেওয়া হচ্ছে না।

(২) তদুপরি, প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা মাধ্যম বা পাঠ্যবিষয় হিসেবে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা যেহেতু ক্রমশ আরও কমছে (পূর্বে উদ্ধৃত NCERT-র সমীক্ষার ফল অনুযায়ী), আরও বেশি বেশি ভাষার বাচকদের নিজ ভাষাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

(৩) কোনো না কোনো আধিপত্যকারী 'প্রধান' ভাষা, প্রধানত 'ইংরেজি'-র প্রতি একটি পূজার মনোবৃত্তি গড়ে তোলার জন্য বিপুল শক্তিধর ও বহু-পুঁজি

নিয়োজিত একটি ব্যবস্থা কাজ করছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা প্রতিষ্ঠান, 'বিশেষজ্ঞ', 'উপদেষ্টা'-রা আধুনিক ব্যবসায়িক প্রচারের সমস্ত কৌশলকে ব্যবহার করে সেই 'প্রধান' ভাষা, প্রধানত ইংরেজি-র এমন এক দেবপ্রতিমা গড়ে তুলছে যা না কি 'আধুনিকতা', 'প্রাযুক্তিক উন্নতি', 'তথ্যপ্রযুক্তিচালিত নয়া অর্থনীতি', 'বিশ্বনাগরিকত্ব' ইত্যাদির সমার্থক। এই দেবরূপী ভাষাকে আয়ত্ত না করলে সামাজিকভাবে হতমান, অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ থাকতে হবে বলে ফরমানও জারি হচ্ছে, ভাষা-ভিত্তিক বৈষম্যকে 'স্বাভাবিকত্ব' প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে বিপুল সামাজিক-অর্থনৈতিক-আদর্শনৈতিক চাপ তৈরি করা হচ্ছে যাতে 'প্রধান ভাষা', প্রধানত ইংরেজি-কেই শিক্ষামাধ্যম ও পাঠ্যবিষয় হিসেবে বাছা হয়।

(৪) ইংরেজি ভাষামাধ্যমে শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষাকে বিক্রি করে মুনাফা করার ব্যবসায় আন্তর্জাতিকভাবেই বিপুল পুঁজি নিয়োজিত, ভারতেও এখন তার অবারিত বাণিজ্যবিস্তারের পথ খুলে দেওয়া হয়েছে, ফলে এই বাণিজ্যিক স্বার্থও ক্রমাগত শিক্ষাব্যবস্থাকে ইংরেজি-ভাষা-কেন্দ্রিক একরৈখিক আদল দিচ্ছে।

উপরোক্ত বাধ্যবাধকতাগুলো কি আলোচ্য 'বাছাই করার স্বাধীনতার অধিকার'-কে লঙ্ঘন করে? বাধ্যবাধকতাগুলিকে 'স্বাভাবিক' (এমনকি 'প্রাকৃতিক') ও 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃষ্ট নয়' বলে ধরলে লঙ্ঘনকারী বলার কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু বাধ্যবাধকতাগুলিকে কি 'স্বাভাবিক' ('প্রাকৃতিক') বা 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃষ্ট নয়' বলে ধরা যায়? বিচার-বিবেচনা করে দেখা যাক।

ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষা-শিক্ষার বাণিজ্যিক প্রস্তাবকরা প্রায়শই ইংরেজি ভাষার এমন কিছু গুণকে 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' বলে দাবি করে থাকেন যার বলে সে অন্য ভাষার তুলনায় 'শ্রেষ্ঠ', যেমন—

১। ইংরেজি ভাষার শব্দভাণ্ডার দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও প্রাত্যহিক জীবনের এমন বিপুল ব্যাপ্তিকে নিজ মধ্যে ধারণ করে, যে, তার তুলনায় অন্য সমস্ত ভাষার ভাণ্ডার নেহাতই দীন-দরিদ্র —ফলে ইংরেজি ভাষা তার বাচকদের সামনে জ্ঞানচর্চার বৃহত্তর ক্ষেত্র খুলে দেয়। এই দাবির সারবত্তা বিচারের জন্য প্রাথমিক কিছু উদাহরণ থেকে শুরু করা যাক। এস্কিমোদের ভাষা ইনুইট-এ বিভিন্ন ধরনের বরফ বোঝানোর জন্য একশর উপর বিভিন্ন শব্দ

আছে—এই ক্ষেত্রে ইংরেজিই কি দীন-দরিদ্র নয়? প্রাচ্যের বিশাল ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে যে বৌদ্ধধর্মের বৈচিত্র্যপূর্ণ চর্চা ও বিকাশ হয়েছে, তার সমৃদ্ধ দর্শনচিন্তা যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে তা পালি, তিব্বতি, জংখা, চীনা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা—সেই দর্শনের নানা পরিভাষার সমার্থক ইংরেজি শব্দ তৈরি সম্ভব নয়। প্রতিটি উপজাতির ভাষাতেই সেই উপজাতির বাসভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের (জীবজন্তু, গাছগাছড়া, মাটির ধরন)-এর এক নিবন্ধন (register) আছে যা সেই অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে প্রাণরক্ষার জন্য ভীষণ জরুরি এবং যা ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষার ভাণ্ডারে পাওয়া যাবে না। ইংরেজি ভাষার ভাণ্ডারেই 'যাহা দরকার তাহা পাওয়া যাবে' ধরে নিলে পশ্চিম ইউরোপের একটি বিশেষ অঞ্চলে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মানুষ সঞ্চয় করেছে তাকেই একমাত্র দরকারী বলে ধরে নিয়ে সমগ্র বিশ্বের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ মানব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডারের বাকি সবকিছুকে পরিত্যাজ্য বলে ধরতে হয়। মানবসভ্যতার উত্তরাধিকারের উপর এর থেকে অবিবেচক ধ্বংসাত্মক হামলা আর কী হতে পারে? সুতরাং, ইংরেজি ভাষার ভাণ্ডারই সর্বশ্রেষ্ঠ ও যথেষ্ট'—এই ভাবনা মোটেই কোনো 'স্বাভাবিক' বা "প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক নয়, বরং তা দৃষ্টিভঙ্গি ও মননের সংকীর্ণতা উপজাত।

২। দ্বিতীয় যে যুক্তিটি বলা হয় তা এই যে বর্তমান 'ভুবনায়ন' (Globalisation)-এর যুগের পৃথিবীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য, বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য 'ইংরেজি-ই দরকারী কারণ তা আন্তর্জাতিক ভাষা'। এই দাবিটি একটি 'বিষয়গত সত্য' হিসেবে হাজির করা হয়, কিন্তু এইটি নিতান্তই একটি বিষয়ীগত মতাদর্শগত অবস্থান। একাধিক বিষয়ীগত মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত এর রমধ্যে নিহিত আছে, যেমন :

ক) 'এগিয়ে যাওয়া' বা 'অগ্রগতি'-র পথ হল 'ভুবনায়ন'-এর প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়া।

খ) যে ভাষা 'আঞ্চলিক', তার থেকে শ্রেয় সেই ভাষা যা 'আন্তর্জাতিক'।

এইগুলি যে 'বিকল্পহীন বাস্তবতা' নয় বরং এমনকিছু 'নির্মিত মতাদর্শগত অবস্থান' যার বিপ্রতীপে ভিন্নতর মতাদর্শগত অবস্থানও ভীষণভাবে সম্ভব, এবং হয়তো বা, শ্রেয়ও, তা কিছুটা বিচার-বিবেচনা করলেই বোঝা যায়। যেমন

ধরা যাক, 'ভুবনায়ন' ও 'অগ্রগতি'র সমীকরণকে। ইউরোপের পশ্চিম অংশে এবং তৎপরবর্তীতে উত্তর আমেরিকার পূর্বে যে বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী সমাজ জন্ম নিয়েছে ও বিকশিত হচ্ছে, সেই সামাজিক-ঐতিহাসিক কক্ষপথকে অন্ধের মতো অনুসরণ করাকেই ভুবনায়ন' বলে হাজির করা হচ্ছে। তা গোটা পৃথিবীকে ইঙ্গ-মার্কিনি আদলে গড়ে নেওয়ার অসম্ভব স্বপ্ন দেখছে। তার অর্থ পৃথিবীর বহু বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন পরিবেশে সমাজবিকাশের যে বহু বৈচিত্র্যময় অর্জন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত আছে, সংস্কৃতির যে বিচিত্র কারুকাজ-বুনন মানবসমাজের উত্তরাধিকার—সেই সমস্তকে অস্বীকার করে, বাতিল করে, ধ্বংস করে ইঙ্গ-মার্কিনি 'অনুপ্রেরণা'-কে এক এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ হিসেবে আঁকড়ে ধরা। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, যা মানবসমাজের প্রাণশক্তি, তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে ইঙ্গ-মার্কিনি প্রভুদের ইতিহাসযানের পিছনে সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে নেওয়ার এই ভুবনময় প্রচেষ্টা কি আদৌ 'অগ্রগতি' না 'অগস্ত্যযাত্রা'? ইংরেজি ভাষাকে সেই যাত্রার পারানি হিসেবে ব্যবহার করার আদৌ কি কোনো প্রয়োজন আছে? যাঁরা একে 'অগস্ত্যযাত্রা' হিসেবে দেখবেন, তাঁদের কাছে নিশ্চিতভাবেই কোনো প্রয়োজন নেই।

'আঞ্চলিক'-কে 'আন্তর্জাতিক'-এর মুখোমুখি একটি বিরোধী প্রস্তাব হিসেবে দাঁড় করানোও একটি মতাদর্শগত নির্মাণ—এ হল 'আন্তর্জাতিক'-এর পক্ষাবলম্বন করে সমস্ত 'আঞ্চলিক' অপরের উপর 'কুপমণ্ডূক, সংকীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু'-র আরোপ এঁটে তাদের মৃত্যু পরোয়ানা জারি করার আধিপত্যবাদী নির্মাণ। এর প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত-বোধসম্পন্ন কোনো 'আঞ্চলিক' যখন আক্রমণকারীকে অনুসরণ করে আক্রান্তের দল থেকে উৎক্রমণ লাভ করতে চায়, আঞ্চলিকতার গণ্ডীর মধ্যে অন্য সব অপরের উপর নিজ আধিপত্য কায়েম করতে চায়, তখন সে 'আন্তর্জাতিক' রূপী আধিপত্যকারীকে 'শত্রু' ও 'গুরু' দুই রূপেই ভজনা করে। আমাদের বর্তমান আলোচনার উৎসমুখে যে ঘটনাবলী (শিক্ষার ভাষা মাধ্যম নির্ধারণ সংক্রান্ত বিরোধ ও আদালতের রায়) রয়েছে, সেখানে আমরা এর উদাহরণ পাব। আধিপত্যবাদী 'আন্তর্জাতিক'-এর কুশীলব হিসেবে ইংরেজি ভাষামাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের উদ্‌গাতাদের পাব। আবার কর্ণাটক রাজ্য সরকারের যে কুশীলবরা প্রথমে 'কন্নড় ভাষাকেই প্রাথমিক শিক্ষার

'একমাত্র' ভাষামাধ্যম করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কর্ণাটকের 'প্রধান ভাষা' কন্নড় ছাড়া অন্য সমস্ত ভাষার বাচকদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকারকে ধর্তব্যের মধ্যেই ধরেননি, তাঁদের মধ্যে আমরা পাব আঞ্চলিকতার গণ্ডীর মধ্যে আধিপত্যকামীদের, যাঁরা আধিপত্যবাদী 'আন্তর্জাতিক'-কে শত্রু ও গুরু উভয়রূপেই ভজনা করেন। 'কেবলমাত্র ইংরেজি'-র বদলে তাঁরা 'কেবলমাত্র কন্নড়'-এর প্রবক্তা। আধিপত্যকামী মায়াঞ্জনই এভাবে 'আঞ্চলিক' ও 'আন্তর্জাতিক'-কে বিরোধী প্রস্তাব হিসেবে দেখতে শেখায়, একটির দমনের মধ্য দিয়ে অপরটির স্ফুরণের দিগনির্দেশ হাজির করে।

কিন্তু এমন একটা বিশ্ব যেখানে সমস্ত 'আঞ্চলিক' হয় সমরাঙ্গনে ভূপতিত সৈন্য, নয়তো 'আন্তর্জাতিক'-এর কাছে আত্মসমর্পণকারী অনুগত অনুসরণকারী, অর্থাৎ এমন একটা বিশ্ব যেখানে 'আঞ্চলিক' নেই কেবলমাত্র 'আন্তর্জাতিক' আছে, তা ভাবা কি সম্ভব? বহু 'আঞ্চলিক'-এর মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবঅভিজ্ঞতার যে বহুবিচিত্র প্রকাশ ব্যক্ত হয় দুরমুশ করে তাদের নির্ধারিত একটি 'আন্তর্জাতিক'-এর লৌহবর্মে বন্দী করে ফেললে তা কি 'আন্তর্জাতিকতা' হবে না কি 'প্রাণহীনতা' হবে? ফলে, বহু বিচিত্র 'আঞ্চলিক' তাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য সমেত সজীবভাবে বিকশিত হলে ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে একে অপরের সঙ্গে অন্তর্বুননে যুক্ত হলে তবেই সেই অন্তর্বুননের নকশা হিসেবে 'আন্তর্জাতিকতা' মানবসমাজকে কোনো কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে নয়, বরং শতফুল বিকাশের মুক্ত প্রান্তরে উপনীত করতে পারে। আধিপত্যকামী অবস্থানের বাইরে বেরিয়ে এ হেন আন্তর্জাতিকতা গঠনের দিকে এগোতে হলে দুটি বিষয়কে নিশ্চিত করা সমানভাবে প্রয়োজনীয়:

ক) সমস্ত জনগোষ্ঠীর নিজ সংস্কৃতি (যার অন্তর্গত সেই জনগোষ্ঠীর নিজ ভাষা, নিজস্ব অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার, প্রকৃতি সম্পর্কে বোধ ও অভিজ্ঞতা) স্বাধীনভাবে বিকাশ করার অধিকার।

খ) সোপানতান্ত্রিক সমস্ত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে সম-মর্যাদার ভিত্তিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্বুনন।

বর্তমানে একটি আধিপত্যবাদী সোপানতান্ত্রিক 'ভুবনায়ন' প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত 'আন্তর্জাতিক ভাষা' ইংরেজি হওয়ার ফলে দুনিয়াজুড়ে তা

'ঘাতকভাষা' রূপে দেখা দিয়েছে। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগ ধরে বহু জনগোষ্ঠীর ভাষা (ও সংস্কৃতি)-র ঘাতক হয়ে উঠেছে সে, মানবসমাজের সামগ্রিক উত্তরাধিকারের ভাণ্ডারে তার অবস্থান এখন কাঁচের শিল্পসামগ্রীর ঘরে লণ্ডভণ্ডকারী উন্মত্ত মোষের মতো।

উপরের (১) ও (২) চিহ্নিত প্রস্তাবে যে আলোচনা হল, তার সূত্র ধরে বলতে পারি যে 'স্বাভাবিক' বা 'প্রাকৃতিক' বলে ইংরেজি ভাষার যে 'গুণগুলি'-কে হাজির করা হচ্ছে, তা 'স্বাভাবিক', 'প্রাকৃতিক', 'বাস্তবিক' কোনোটিই নয়, তা এক বিশেষ আদর্শনৈতিক নির্মাণ। আদর্শনৈতিক নির্মাণ বলেই তা তর্কাতীত নয়, বরং তর্ক-বিচারে দেখা যায়, যে আদর্শনৈতিক প্রবণতা এই নির্মাণের কারিগর, সে প্রবণতা মানবসমাজের সম্পদবৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের সম্পদকে ধ্বংস করে এক প্রাণহীন একশিলা সোপানতান্ত্রিক কাঠামো গড়ার হাতিয়ার। সুতরাং এই সমস্ত গুণাবলীর বিপুল প্রচারের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে ও বাণিজ্যিক- ব্যবসায়িক পরিকাঠামো (দুনিয়াজোড়া ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষা-র বিপুল পরিকাঠামো)-র জোরে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতাগুলি তৈরি হচ্ছে, তা শিক্ষার ভাষামাধ্যম 'বাছাই করার' পরিবেশকে আগে থেকেই প্রভাবিত-বিকৃত করে 'বাছাই করার' কাজটিকে স্বাধীনভাবে হতে দিচ্ছে না।

ফলে, সর্বোচ্চ বিচারপীঠ 'বাছাই করার স্বাধীনতা'-র অধিকার সুরক্ষিত করতে গিয়ে যে ইংরেজি মাধ্যমে পঠনপাঠনের অধিকার ও ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অধিকারকে সর্বাগ্রগণ্য দিলেন, সেই দুইটিই তো প্রকৃত প্রস্তাবে 'বাছাই করার স্বাধীনতা'-র লঙ্ঘনকারী।

আর কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থী/অভিভাবকের বাছাই করার স্বাধীনতাকে' তা খর্ব করছে, এমনটা নয়, যে 'ভুবনায়নের অংশ রূপে তা হাজির হচ্ছে, তা খর্ব করছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও নানা অধিকার। সেই অধিকার হল সমস্ত জনগোষ্ঠীর নিজ সংস্কৃতি (যার অন্তর্গত সেই জনগোষ্ঠীর নিজ ভাষা, নিজস্ব অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার, প্রকৃতি সম্পর্কে বোধ ও অভিজ্ঞতা) স্বাধীনভাবে বিকাশ করার অধিকার ও সেই প্রসঙ্গে সম-মর্যাদা পাওয়ার অধিকার। সর্বোচ্চ বিচারপীঠে এইগুলি তো কোনো গুরুত্বই পেল না!

অথচ পূর্বে উদ্ধৃত 'স্বাধীন' ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের বক্তব্যে প্রকাশিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত ভাবনায় আমরা দেখব ঔপনিবেশিক দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়ে স্বাধীনভাবে নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের অধিকারকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা, যার মূর্তরূপ 'শান্তিনিকেতন'-এর মধ্য দিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সেখানেও আমরা দেখেছি এই অধিকারকে বাস্তব চর্চায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। অথচ আজ এই অধিকার সর্বোচ্চ বিচারপীঠে উল্লেখের যোগ্য বলেও বিবেচিত হল না। আধিপত্যকারীর আধিপত্যবিস্তারের 'অধিকার'-কে সর্বাগ্রগণ্য করে ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাষা-সংস্কৃতির ভাণ্ডারে মড়কের প্রাদুর্ভাব আরও ছড়িয়ে দেওয়ার পথই এর মধ্য দিয়ে করা হল না কি?

মড়কের দিনগুলিতে ভবিষ্যভাবনা

বর্তমান আলোচনার এতাবধি পরিসর যে পাঠক তাঁর নিজগুণে লেখকের সঙ্গে পরিক্রমা করে এসেছেন, তিনি বোধহয় লেখকের সঙ্গে দ্বিমত হবেন না যে ভারতের সর্বোচ্চ বিচারপীঠের রায় আসলে আধিপত্যবিস্তারী ইংরেজি ভাষা মাধ্যমে শিক্ষা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে আরও আধিপত্যবিস্তারের পথ খুলে দিচ্ছে। এ বিষয়েও বোধহয় দ্বিমত হবেন না যে এই বিচারপীঠের রায় একক কোনো ব্যতিক্রম নয়, বরং অন্তত গত প্রায় তিরিশ বছর ধরে যেভাবে ঔপনিবেশিক অধীনতার থেকে বেরিয়ে নিজস্ব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বিকাশের চিন্তার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চিন্তা ধীরে ধীরে বিসর্জিত হয়ে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের মডেলেকে অন্ধ অনুকরণের মধ্য দিয়ে মোক্ষলাভের চিন্তাই সর্বগ্রাসী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তদনুসারী সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন পদক্ষেপের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তা হয়েছে।

এই সার্বিক প্রক্রিয়া ভারতের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ধারাকে বিকশিত করার ও নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার অধিকারকে অস্বীকার করছে। ইওরোপ-আমেরিকার মডেলে 'আধুনিকতা' নামক এক কারাগার তৈরি করে বহুবিচিত্র সর্বতোমুখী বিকাশকে পঙ্গু করে বন্দী করতে চাইছে।

কেবলমাত্র 'ইংরেজি'-র বিরোধিতা করে এই সার্বিক প্রক্রিয়াকে অটুট রেখে 'কেবল ইংরেজি'-র জায়গায় 'প্রধান' কোনো ভারতীয় ভাষাকে (কন্নড় বা তামিল বা বাংলা...) বসিয়ে আধিপত্যকারীর পন্থা অনুসরণ করেই আধিপত্যাধীনতার মুক্তিতে থেকে উৎক্রমণ খুঁজলে, না কোনো উৎক্রমণের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে, না সার্বিক প্রক্রিয়াটির বিরোধে দাঁড়ানো যাবে। কেবলমাত্র 'কন্নড়' ভাষাকে কর্ণাটকে শিক্ষামাধ্যম করার জন্য উৎসাহীদের অভিজ্ঞতা তা দেখায়।

ভারতে একাধিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা তাদের বহুমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার সমেত বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আরও বহু নিশ্চিতপ্রায় বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে নব্বই শতাংশের বাচকদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না, ক্রমশ এই ব্যবস্থা আরও সংকুচিত হচ্ছে। সমাজগড়ন-সংস্কৃতি-চিন্তা-কে একমুখী কেন্দ্রিকতার লৌহবর্মে বন্দী করে সোপানতান্ত্রিকতা ক্রমশ আরও প্রখর হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো জায়গা তৈরি করতে গেলে কি সমস্ত জনগোষ্ঠীর নিজেদের ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা করার অধিকার এবং নিজেদের সংস্কৃতি সমমর্যাদায় বিকশিত করার অধিকারের উপরই আমাদের আপোষহীন গুরুত্ব দিতে হবে না? তার অর্থ কখনই কেবলমাত্র নিজের ভাষাটিকে 'ইংরেজি'-র মত সর্বপ্রাধান্যবিস্তারকারী করে তোলার চেষ্টা নয়, তার অর্থ বোধহয় নিজের ভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার আপোষহীন প্রয়াসের পাশাপাশি অন্য সমস্ত জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি থেকে শেখা, সমমর্যাদায় আদানপ্রদানে ব্রতী হওয়া, তাদেরও চর্চার পথ উন্মুক্ত করা। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বহুবৈচিত্র্য ও সবার সর্বতোমুখী বিকাশের উপর এইরূপ অগ্রগণ্যতাদানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাতত্ত্বও মিলিত অনুসন্ধানের, গড়ে তোলার বিষয়- কোনো 'মডেল'-কে অন্য কোনো 'মডেল' দিয়ে প্রতিস্থাপনের বিষয় কখনোই নয়।

উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কথা বিবেচনার মধ্যে আনলে আমরা দেখব যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলে, ডুয়ার্স অঞ্চলে, পশ্চিমের অরণ্য-ডুংরি-র দেশে ও গঙ্গা অববাহিকায় বহু বিচিত্র ভাষা ও সংস্কৃতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনের মধ্য দিয়ে আজও বহমান। সেই সমস্ত ভাষা ও সংস্কৃতি-কে সমমর্যাদা দিয়ে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষীরা কি একে অপরের

সঙ্গে মিলন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলার প্রয়াস নিতে পারি? ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'উন্নত'- 'অনুন্নত'-র সমস্ত সোপানতন্ত্রকে উৎখাত করে গ্রহি মনে অন্য ভাষা ও সংস্কৃতির উঠোনে গিয়ে কি দাঁড়াতে পারি? জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সমস্ত জনগোষ্ঠীর অর্জনকে সমগুরুত্বে দেখতে পারি? তাহলে বোধহয় বিভিন্ন ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যে সমমর্যাদার উপর দাঁড়িয়ে অন্তর্বুননের এমন কোনো পথ আমাদের সমবেত চর্চার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হবে যা বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাতত্ত্বকে উদ্ভাসিত করে তুলবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. Bilingualism or Not-The Education of Minorities, Tove Skutnabb Kangas, Multingual Matters, P. 18.

২. সম্প্রতি, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক 'রিফ্রেশার কোর্স'-এ বক্তব্য রাখতে আসা ভারতীয় সরকারের জনগণনা ও ভাষাগণনার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক/প্রশাসকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় তাঁদের এমন মৌখিক বক্তব্য পাওয়া গেছে।

৩. 'শিক্ষা ও জাতীয় পুনর্গঠন : আবুল কালাম আজাদ-এর বক্তৃতাসংগ্রহ', পৃ. ১৩, ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৪. ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহে পর্যায়ক্রমিকভাবে National Council of Educational Research and Training (NCERT) যে সমীক্ষা চালায়, তার প্রকাশিত ফল থেকেই এই সমস্ত তথ্য উদ্ধৃত হয়েছে।

৫. এই বিষয়ে বিশদভাবে জানতে চাইলে দেখুন :
   i) Kamal K. Sridhar, Language in Education: Minorities & Multilinguiabism in India (1996), International Review of Education 42 4, Pg. 327- 347.
   ii) Rajesh Sachdeva, Towards an explicit language policy in education for Nagaland, Department of Linguistics, North-eastern Hill University, Shillong, 1998.

৬. 1st Annual Report of National Knowledge Commission, 2006, Pg. 32. উদ্ধৃত অংশের ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের করা।

৭. Anjali Mody, India's craze for English-medium schools is depriving many children of a real edu- cation, 2015, Lingua Franca

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তা এই আলোচনার পরিসরে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়, পাঠকদের অনুরোধ করব নিজ উদ্যোগে তাঁরা সেই আলোচনায় যেন ব্রতী হন। তাহলে আমাদের আজকের অনেক 'আধুনিক' প্রশ্ন-বিচারের রসদ সেখানে পাবেন। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল বিশ্বভারতীর প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়-এর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ' ('গ্রন্থালয় প্রা. লি.' দ্বারা ১৯৮০ সালে প্রকাশিত)। বর্তমানে সেই বই থেকে কিয়দংশ উল্লেখ করছি:

'... শিক্ষার সমস্ত স্তরে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষার পক্ষপাতী। শুধু পক্ষপাতী নন, এ ব্যাপারে তিনি আপোষহীন...

...শিক্ষাবিধি আসে সমাজবিধি এবং জীবনবিধি থেকেই, শিক্ষাতত্ত্বও তাই। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাবিধির যেটুকু আভাস পুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, আয়োদধৌম্য ঋষির গুরুভক্ত শিষ্য আরুণি ও উপমন্যুর বহুখ্যাত কাহিনী বা বেদ মুনির গুরুভক্ত শিষ্য উতঙ্কর কাহিনী...তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট যে প্রাচীন ব্যবস্থায় বিদ্যা জিনিসটা গুরু প্রীত হয়ে শিষ্যকে দান করেন। শিষ্য কৃতার্থ হয়ে ভক্তিভরে হাত পেতে তা গ্রহণ করে।... বিদ্যা বা জ্ঞান একটা স্থির বস্তু, একটা রেডিমেড বস্তু, তা নিত্যকালের, তা হয়েই আছে। তা গুরুর কাছে একদা যেমন তাঁর গুরুকৃপায় উদ্ভাসিত হয়েছিল, শিষ্যের কাছেও একদিন তার গুরুকৃপায় উদ্‌ভাসিত হবে। অন্য পথ নেই। জ্ঞান অনুসন্ধানের বিষয় নয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়, তা পেয়ে যাবার বিষয়, রেভেলেশনের বিষয়, উদ্ভাসনের বিষয়, এবং এইভাবেই গুরুশিষ্য পরম্পরায় জ্ঞান বাহিত হয়ে চলে।....

এ শিক্ষাতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথ কেমন করে স্বীকার করবেন? রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্ব স্বাধীন চিন্তার শিক্ষাতত্ত্ব, গ্রহণের নয়, আবিষ্কারের শিক্ষাতত্ত্ব, বুদ্ধির জাগরণের চিত্তের জাগরণের শিক্ষাতত্ত্ব, ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী প্রতিষ্ঠার শিক্ষাতত্ত্ব।...শ্রদ্ধার ব্যাপারে অবশ্যই মিল ঘটবে, কিন্তু প্রশ্নহীন বিচারহীন তর্কহীন গ্রহণ কখনওই নয়।.... ভারতীয় শিক্ষাবিধি মূলত অথরিটেরিয়ান শিক্ষাবিধি। রবীন্দ্রনাথ জানেন, সে রকম বশংবদ অনুগামিতায় ছাত্রের স্বাধীন চিন্তার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সে শিক্ষায় সৃজনশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথাই হল স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা।....

আর একটিই মডেল আমাদের চোখের সামনে আছে। সে হল পাশ্চাত্য মডেল, ঔপনিবেশিক নয়, খাঁটি ইওরোপ- আমেরিকার মডেল, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ- হার্ভার্ডের শিক্ষাবিধির মডেল, আমাদের ঔপনিবেশিক শিক্ষাবিধির সঙ্গে যার জোড়াতালির জন্য আজকাল আমরা সাধ্যাতিরিক্ত চেষ্টা করে চলেছি।

রবীন্দ্রনাথ এই পাশ্চাত্য মডেলটিও গ্রহণ করেননি। পাশ্চাত্য মডেলের পশ্চাৎপটে আছে ধনতান্ত্রিক সমাজ। উক্ত মডেলের মূল কথা হল প্রতিযোগিতা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-আদর্শের মূল কথা হল সহযোগিতা। প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষা মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে, যুদ্ধের হাতিয়ার রূপে প্রস্তুত কর—বস্তুত যুদ্ধের বলি রূপে প্রস্তুত করে। শিক্ষার্থী সেখানে জন্মের থেকেই প্রতিযোগিতামূলক সমাজব্যবস্থার স্বার্থের কাছে বলি-প্রদত্ত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিধি মুক্ত মানুষের জন্য মুক্ত শিক্ষাবিধি, সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে সৃজনশীলতার পথে চৈতন্যের পরিপূর্ণ বিকাশের শিক্ষাবিধি। এই শিক্ষাবিধির সঙ্গে আমাদের পরিচিত মডেলের কোনোটিরই মিল নেই। এ মডেল কালাতিক্রান্ত নয়। এর অনেক কিছু হয়তো ঝরে যাবে, কিন্তু মূল সত্য যেটা থাকবে, তা সহজে মলিন হবার নয়। সেইটেই হবে আগামী দিনের সুস্থ শিক্ষাবিধির মডেল।'

(সত্যেন্দ্রনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, পৃ. ৩৪২-৩৪৫)

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৫

ভাষিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবস্থান ও অবয়ব পরিকল্পনা

সজল রায়চৌধুরী

ভাষার বিলোপসাধন

পৃথিবীর ছ'হাজার ভাষার অর্ধেকই আগামী পঞ্চাশ বছরে লুপ্ত হয়ে যাবে। ভাষা বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে এমন আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। কেউ কেউ দুঃখ দুঃখ মুখ করে বলতে পারেন, 'কী আর করা যাবে, প্রকৃতিতে জন্ম-মৃত্যু আছেই, ভাষা বহতা নদীর মতো, কতো নদী শুকিয়ে যায়, অনেক ভাষাও শুকিয়ে যেতে পারে।' ভাষার জন্ম-মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য এ ধরনের নিয়তিবাদের পেছনে কোনো বিজ্ঞান আছে কি না, সে প্রশ্নে আমরা একটু পরে আসছি। প্রথমে দেখা যাক, ভাষার মৃত্যুতে মানব সভ্যতার কিছু আসে যায় কিনা।

প্রজাতি হিসেবে মানুষের উদ্ভব আর ভাষার উদ্ভবকে আলাদা করা যায় না। পরস্পরের ভাব বিনিময়ের জন্য মানুষ যতরকম সংকেত ব্যবহার করে ভাষা তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক। কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতি ও যৌথ প্রজ্ঞা ভাষার মধ্যে ধরা থাকে। ভাষা মানুষের বহির্বর্তী কোনো বস্তু নয়, মাতৃভাষীর চেতনার অংশ। হমবোলট বলেছিলেন, "ভাষাই আমার আত্মা, আত্মাই আমার ভাষা।" ভাষা সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি থেকেই নির্দিষ্ট ভাষার উদ্ভব। খাদ্য লুপ্ত হলে শারীরিক অবলুপ্তি ঘটে। মানুষের ভাষা লুপ্ত হলে বেঁচে থাকা যায়, কিন্তু শিকড়হীন, নিরালম্ব হয়ে যায় তার অস্তিত্ব। শ্রাদ্ধের মন্ত্রে শুনেছি

প্রেতাত্মাকে বলা হচ্ছে, "আকাশস্থ, নিরালম্ব, বায়ুভূত, নিরাশ্রয়"। ভাষা হারানো মানুষের জীবন্ত আত্মা এমন নিরালম্ব, নিরাশ্রয় হয়ে যায়। শুধু মাতৃভাষা-হারানো মানুষগুলোই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, বিবিধ সংস্কৃতি ও বিচিত্র প্রজ্ঞার সমবায়ে গড়ে ওঠা বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডার দীনতর হয়, একমাত্রিক হয়ে উঠতে থাকে।

যে-ভাষাগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের কি কোনো অভ্যন্তরীণ ত্রুটি আছে, আছে কোনো জন্মগত মারণব্যাধি যাতে লুপ্ত হওয়াই তাদের ভবিতব্য? আধুনিক ভাষাতত্ত্ব কি বলে? নানা বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে, কিন্তু এই একটি বিষয়ে সবাই একমত যে, কোনো ভাষা অন্য ভাষার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। তবে একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঐতিহাসিক যোগাযোগের ফলে কোনো ভাষা এগিয়ে থাকতে পারে, অন্য কিছু ভাষা থাকতে পারে পিছিয়ে। আবার উপযুক্ত ভাষা-পরিকল্পনা পিছিয়ে থাকা ভাষাকেও আধুনিক জগতের যে-কোনো কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে। কোনো ভাষাই মহাকালের চাকায় গুঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য 'জন্ম হইতেই বলিপ্রদত্ত' নয়। ভাষা লুপ্ত হয় ক্ষমতা, আধিপত্য, শোষণ-লুণ্ঠন ও ধারাবাহিক বঞ্চনার চাপে।

ভাষিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা

এই উপলব্ধি থেকেই ভাষিক অধিকারের প্রসঙ্গ আজকের পৃথিবীতে উঠে এসেছে সজোরে। ভাষা নিধন ও ভাষা আত্মরক্ষার দ্বৈরথ দেখা গিয়েছে। এই সত্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নানের বার্তায়। প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তিনি বার্তাটি পাঠান:

> বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যুগে অল্প কয়েকটি ভাষা যেখানে বিশ্বভাষায় পরিণত হয়েছে, সেখানে স্থানীয় ভাষাগুলোর বৈচিত্র্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরা অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
>
> জাতি ও জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ভাষাও আত্মপরিচয়ের অনিবার্য উপাদান এবং এমন একটা উপায় যার সাহায্যে এই বিশ্বে আমরা আমাদের স্থান খুঁজে পাই। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শিকড়হীনতার মধ্যে অস্তিত্বের সারাৎসার খুঁজে পাওয়া যায় নিজের ভাষা শুনলে, অনায়াসে বুঝতে পারলে…

> আজ যে প্রায় ছয় হাজার ভাষা পৃথিবীর মানুষ বলছে তার অনেকগুলোই আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে লুপ্ত হতে পারে। এই বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীকে মানুষের সাধারণ ঐতিহ্য রক্ষায় সংকটকালীন গুরুত্বের সঙ্গে চতুর্গুণ প্রয়াস চালাতে হবে।'[১]

এই বার্তার চার বছর আগেই বিশ্বব্যাপী ভাষার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬ সালে স্পেনের বার্সেলোনা শহরে ইউনেস্কোর সম্মেলন হয়। মানবাধিকার ঘোষণার মতো 'ভাষিক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণা' (Universal declaration of linguistic rights) জারি করা হয়। এই ঘোষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলি নজর করে দেখা যাক:

ক) সব ভাষা সম্প্রদায়ের অধিকার সমান। (অনুচ্ছেদ ১০)

খ) প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় সব ধরনের কাজকর্ম চালানোর অধিকার আছে। (অনুচ্ছেদ ১২)

গ) সরকারি কাজকর্ম প্রতিটি অঞ্চলের ভাষায় চালাতে হবে। এই অধিকার সব ভাষা সম্প্রদায়ের আছে। (অনুচ্ছেদ ১৫)

ঘ) নিজ নিজ অঞ্চলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব দলিল দস্তাবেজ, সে ছাপাই হোক বা যন্ত্রপাঠ্য হোক বা অন্য কোনো আকারে হোক, তা নিজ ভাষায় পাওয়ার অধিকার প্রতিটি ভাষা সম্প্রদায়ের আছে। (অনুচ্ছেদ ১৭)

ঙ) নিজ অঞ্চলের ভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার প্রত্যেকের আছে। (অনুচ্ছেদ ২৯)

চ) সব ভাষা সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি গণমাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের সমান ও বৈষম্যহীন সুযোগ অবশ্যই থাকবে। (অনুচ্ছেদ ৩৮)

ছ) তথ্য প্রযুক্তির অন্তর্গত সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে প্রকাশনা, অনুবাদ ও তথ্য বিশ্লেষণ তথা সাধারণভাবে সংস্কৃতি প্রসারের জন্য নিজ নিজ ভাষাবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপকরণ, হাতিয়ার ও উৎপন্ন তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিটি ভাষা সম্প্রদায়ের আছে। (অনুচ্ছেদ ৪০)

জ) স্বদেশের ভাবমূর্তির পরিচায়ক, বিজ্ঞাপন চিহ্ন, দৃশ্যপট এবং অন্যান্য উপাদানে নিজ নিজ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ স্থান বজায় রাখার অধিকার সব ভাষা সম্প্রদায়ের আছে। (অনুচ্ছেদ ৫০/১)

ঝ) বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির উৎপন্ন দ্রব্য, বাচনিক ও লিখিত তথ্য, নিজ ভাষায় সবটাই পাওয়ার অধিকার সব ভাষা গোষ্ঠীর আছে। (অনুচ্ছেদ ৫০/২)

ঞ) ভাষাশিক্ষক, অনুবাদক বা পর্যটনসহযোগীর মতো ক্ষেত্র ছাড়া (যেখানে পেশার চরিত্রটি অন্যভাষিক) অন্যত্র আঞ্চলিক ভাষায় নিজ নিজ পেশাগত কাজ করার অধিকার সকলের আছে। (অনুচ্ছেদ ৫২)

রাষ্ট্রসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এ-ধরনের ঘোষণার গুরুত্বকে ছোটো করে দেখার কোনো কারণ নেই। তবুও বলা দরকার যে, ঘোষণাগুলি অবলম্বন করে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য দেশগুলো নিজেরাই সুবোধ বালকের মতো ভাষিক অধিকার কার্যকরী করতে শুরু করবে এ-কথা ভাবার মতো সরলমতি কেউ নেই। তবে অধিকার আদায়ের জন্য ভাষিক সংখ্যালঘু ও বৈষম্যপীড়িত ভাষাভাষীরা যদি লড়তে রাজি থাকেন তবে 'ভাষিক অধিকারের ঘোষণা' তাঁদের হাত শক্ত করবে। যেমন সাইনবোর্ড, হোর্ডিংয়ে বাংলা রাখতে হবে— এই দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে একটা আন্দোলন চলছিল। আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান 'বাংলাবাজ' বলে রে রে করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অথচ ভাষিক অধিকারের ৫০/১ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট ভাষায় স্বদেশের ("স্ব অঞ্চলের, কারণ ঘোষণায় territory কথাটা আছে) ভাবমূর্তির পরিচায়ক বিজ্ঞাপন, চিহ্ন দৃশ্যপটে নিজ নিজ ভাষার গুরুত্বপূর্ণ স্থান-এর কথাই আছে। 'চোরা' কোনোদিনই ধর্মের কাহিনি শোনে না। কিন্তু 'ধার্মিক'দের মনোবল বৃদ্ধিতে ভাষিক অধিকার কার্যকরী হতে পারে।

অধিকার, তত্ত্ব, বাস্তবায়ন ও অন্তর্ঘাত

'ভাষিক অধিকারের ঘোষণা'-র মর্মবস্তু মাতৃভাষাকে পূর্ণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। পূর্ণ মর্যাদা বলতে বোঝায় ভাষা-সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যবহারিক ও ভাবগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রয়োগ। শিক্ষায়, সরকারি কাজে, আইন আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মাতৃভাষার প্রাধান্য। যখনই অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে, তখনই বুঝতে হবে—অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক

শাসন, একাধিক ভাষার প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার টানাপোড়েনে বহু দেশে মাতৃভাষা অবহেলিত ছিল, এখনও অনেক জায়গায় আছে। এই ভাষা পরিস্থিতির বদল ঘটিয়ে মাতৃভাষাকে স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় ভাষাতত্ত্বে তাকে 'ভাষা পরিকল্পনা' বা 'language planning' বলে। ভাষাকে পরিকল্পনা করে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না—এ-ধরনের কথা কোনো কোনো সবজান্তা বলেন। দেখা যাক তত্ত্ব ও প্রয়োগ কী বলে?

ভাষা যে বদলায় এ অভিজ্ঞতা অনেক পুরোনো। আমাদের চোখের সামনেই আমরা ভাষা বদলাতে দেখেছি। অন্যদিকে কাঠামোবাদী (structuralist) ভাষাতাত্ত্বিকরা বলেন, প্রতিটি ভাষায় একটি নির্দিষ্ট কাঠামো আছে। ফলে পরিবর্তনশীলতা ও নির্দিষ্ট কাঠামোর অস্তিত্বের ঘটনার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিল। কীভাবে এর সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তা নিয়ে তাত্ত্বিক প্রশ্ন দেখা দিল। 'এই তাত্ত্বিক সংকটকালে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোতে দেখা গেল যে মানুষ সচেতনভাবে ভাষা পরিবর্তন করছে। এক ভাষাকে বিতাড়ন করে অন্য ভাষা প্রতিষ্ঠা করছে। এক ধ্বনিকে ছেড়ে অন্য ধ্বনিকে গ্রহণ করছে, শব্দের ভেতরকার পুরোনো অর্থ ঝেড়ে ফেলে তার মধ্যে নতুন অর্থ ভরে দিচ্ছে। দেখা গেল, ভাষায় শুধু পরিবর্তন হয় না, ভাষাকে পরিবর্তন করাও হয়।

সচেতনভাবে ভাষা-পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াকে ভাষাবিজ্ঞানে 'ভাষা-পরিকল্পনা' বলা হয়। ভাষা-পরিকল্পনার দুটো দিক আছে।

১. মর্যাদা পরিকল্পনা বা অবস্থান পরিকল্পনা SP (Status planning)

২. অবয়ব-পরিকল্পনা CP (Corpus planning)

অবস্থান পরিকল্পনা

কোনো একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী কোনো ভাষা সমাজে কী অবস্থান নেবে ভাষা পরিকল্পনায় সেটাই ঠিক হয়। একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা ও উপভাষার মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হয়। সরকারি কাজের ভাষা কী হবে, শিক্ষার মাধ্যম কী হবে, লিখিত ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ কোন ভাষায় চলবে—এগুলো ঠিক করা হয় অবস্থান-পরিকল্পনায়। ইউরোপীয় অধিবাসীদের নানা ভাষার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল

জার্মান ও ইংরেজি ভাষা। মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে রাজনৈতিক স্তরে সিদ্ধান্ত হয় ইংরেজিই হবে সরকারি যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ভাষা। জার্মান ভাষা যদি ভাষা-পরিকল্পনায় প্রাধান্য পেত তবে বিশ্ব ভাষা হিসেবে ইংরেজির এই রমরমা হয়তো থাকত না। ভাষার অবস্থান-পরিকল্পনার ফলে প্রায় মুছে যাওয়া হিব্রু ভাষা ইজরায়েলে আবার জেগে ওঠে। সমস্ত সরকারি কাজ ও যোগাযোগ এবং সর্ববিদ্যার ভাষা হয় আধুনিকীকৃত হিব্রু। তুরস্কে ধর্মের ভাষা আরবি এবং সাহিত্যের ভাষা ফারসির চাপে মূল তুর্কি ভাষার নাভিশ্বাস উঠেছিল। লিখিত তুর্কি ভাষা তুর্কি জনগণের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল। কামাল পাশার বিপ্লবের পর যুগান্তকারী ভাষা-পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আরবি, ফার্সি লিপির বদলে রোমান লিপিতে তুর্কি ভাষা লেখা হতে থাকে। অপ্রয়োজনীয় ফারসি শব্দ ও বাক্য রীতিকে বিদায় দিয়ে খাঁটি তুর্কি শব্দ লিখিত ভাষায় প্রাধান্য পায়। শিক্ষায় ও সরকারি কাজকর্মে তুর্কি ভাষা আবশ্যিক করা হয়। এমনকি মসজিদে উপাসনার ভাষাতেও আরবির বদলে তুর্কি চালু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবীতে সদ্য স্বাধীন দেশগুলোয় ভাষা-পরিকল্পনার ফলেই পূর্ব আফ্রিকায় সোয়াহিলি, শ্রীলঙ্কায় সিনহালা ও মালয়ে বাহাসা মালয়া প্রধান অবস্থানে উঠে আসে। প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি অবস্থান-পরিকল্পনার দাবি। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সরকারি কাজ বাংলায় করতে হবে বা শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা চাই—দাবি, অবস্থান-পরিকল্পনার দাবি।

অবয়ব পরিকল্পনা

'ভাষার অবয়ব পরিকল্পনা বলতে বোঝানো হয় তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, তার রূপতাত্ত্বিক সম্ভাবনা নিরীক্ষণ, তার বাক্য প্রণালীর রূপান্তর প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা, তার শব্দসম্ভারের বিস্তৃতি, তার লিপিগত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং তার বিকাশের সকল সম্ভাবনার সম্প্রসারণ।'[৪]

ধরা যাক, কোনো অবহেলিত ভাষার লিপিই নেই। অবস্থান পরিকল্পনায় ঠিক করা হল, সে ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে, লোকসাহিত্য সংগ্রহ করা হবে। এমন অবস্থায় সে-ভাষার জন্য ধ্বনিমূলক লিপি তৈরি করাই অবয়ব-পরিকল্পনার কাজ। সরকারি কাজে ও শিক্ষার সর্বস্তরে কোনো ভাষাকে প্রাধান্যের

অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবয়ব-পরিকল্পনা হিসেবে পরিভাষা নির্মাণ, অন্য ভাষা থেকে পাঠ্যগ্রন্থের ব্যাপক অনুবাদ ও মৌলিক পাঠ্যগ্রন্থ রচনার কাজ সামনে এসে যায়। বোঝাই যায়, অবস্থান ও অবয়ব-পরিকল্পনা একে অপরের পরিপূরক শুধু নয়, অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা নিষ্ফল হতে বাধ্য। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানী ফিশম্যান যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'স্পষ্টতই অবস্থান পরিকল্পনার সাফল্য ছাড়া অবয়ব পরিকল্পনা তুচ্ছ (বিদ্যায়তনিক) কাজকারবারে পরিণত হয়। একইরকমভাবে অবয়ব-পরিকল্পনার সার্থকতা ছাড়া অবস্থান পরিকল্পনা শূন্যগর্ভ ইচ্ছার ঘোষণাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, এটা দাঁড়ায় ভাষিক আকার ও অন্তর্বস্তু ছাড়া একটা ভাষা কর্মসূচি।'[৫]

তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দু'দিক থেকেই দেখা গেল সদিচ্ছা ও উদ্যোগ থাকলে যে-কোনো ভাষাকে বাঞ্ছিত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তি অবয়ব পরিকল্পনার কাজ আগের থেকে বরং সহজ করে তুলেছে। ভাষিক অধিকারের ঘোষণা বাস্তবায়িত করা আকাশকুসুম নয়। এবার আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটা ওপরের অভিজ্ঞতার আলোয় খতিয়ে দেখব।

বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিশ্রুতি ও প্রয়োগ

প্রথমেই বলে রাখা ভালো বাংলা ভাষার জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ অবস্থান পরিকল্পনা বা অবয়ব-পরিকল্পনা ঔপনিবেশিক আমলে হয়নি। ১৯৩৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটির উদ্যোগে বাংলা বানানের বিধান প্রকাশিত হয়। তবে বিদ্যালয় বা পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহারের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ বানান খুব গেঁথে দেওয়া যায়নি। ১৯৪০ সালে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলার মাধ্যমে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা চালু হয়। এই অবস্থান পরিকল্পনার তাগিদে অবয়ব পরিকল্পনাও হয় খুব দ্রুত। পরিভাষানির্মাণ ও বাংলাভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা চলতে থাকে। সাগর-মহাসাগরে ইংরেজি proper noun-এরও বাংলা ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর করা হয়। জানি না তখন কেউ পরিভাষা কঠিন এবং এগুলো বাংলাবাজদের কাণ্ড বলে গালাগালি করেছিলেন কি-না। তবে আমরা যখন দেড় দশক বাদে পরীক্ষা দিই তখন এগুলোর স্বাভাবিকতা নিয়ে কোনো সংশয়ই মনে জাগেনি।

বাংলা ভাষা নিয়ে ভাষা-পরিকল্পনার ইতিহাস রচনার কোনো সুযোগ এ-লেখায় নেই। সরকারি কাজে বাংলা ভাষার প্রয়োগ সম্পর্কেই দু'-চার কথা আলোচনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভব। ভাষা আসলে জাতির আত্ম-পরিচয়ের নিশান। তাই প্রথমে একটু ভূমিকা করতেই হবে।

ভারত সম্বন্ধে একটা অবৈজ্ঞানিক কল্পকথা প্রচলিত আছে, 'ভারতীয়রা একটা জাতি'। আসলে বহুজাতিক দেশ এই ভারতবর্ষ। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনে অগ্রণী জাতিগুলো কংগ্রেসের ছাতার তলায় এসেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা ভারতীয় জাতির ধারণা চালিয়েছিল। একই সঙ্গে একটা বিপরীত প্রক্রিয়াও চলছিল।

পুঁজির বিকাশ আলাদা আলাদা জাতিসত্তাকে সংগঠিত করছিল। বাংলা কবিতা হাতড়ালে আমরা একই সঙ্গে 'বঙ্গচেতনা' ও 'ভারত চেতনা'—দুটোই দেখি। 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' আর 'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র'—বাঙালির চেতনায় দিব্যি একইসঙ্গে বিরাজ করত। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বেই জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা নানা আকারে দেখা দেয়। ইংরেজ শাসনের সময় প্রদেশগুলো ভাষার ভিত্তিতে গঠিত ছিল না। ১৯২০ সালে কংগ্রেস ভাষার ভিত্তিতে 'কংগ্রেস সার্কেল' গুলি গঠন করে। প্রশাসনিকভাবে যে-সব প্রদেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না—যেমন অন্ধ্র, ওড়িশা, গুজরাত, অসম—সেখানেও নিজ নিজ ভাষার ভিত্তিতে সাংগঠনিক অঞ্চল গড়ে দলীয় কাজ হতে থাকে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন যে কংগ্রেসের নীতি তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কংগ্রেসের এই সাংগঠনিক সংস্কারে।

১৯৩০ সালে সরকারের 'রিফর্মস এনকয়ারি কমিটি' ভাষার ভিত্তিতে প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করা উচিত বলে মেনে নিলেও কার্যত ১৯৩৬ সালে ওড়িশাই একমাত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস ভোল পাল্টায়। JVP (জওহরলাল, বল্লবভাই ও পট্টভি) কমিটি ১৯৪৯-এর রিপোর্টে বলে: 'কংগ্রেস দল যখন ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি সমর্থন করেছিল তখন তারা এই নীতি কার্যকরী করার সমস্যার সম্মুখীন হয়নি। অতএব এর পরিণতি ও ফলাফলের কথা চিন্তা করে দেখেনি।'

কংগ্রেসের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কারণ বড়ো পুঁজিপতিদের বিকাশের জন্য কেন্দ্রীভূত বৃহৎ বাজারটাই উপযুক্ত। এমন একটা সংবিধান বানানো হল, যা নামে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু আসলে এককেন্দ্রিক। সামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যগুলোকে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী বলেছিলেন—Glorified Municipality। রাজ্যের নামে এই 'গৌরবান্বিত পুরসভা'ও যারা পায়নি, তাদের আন্দোলন কিন্তু চলতেই থাকল, স্বতন্ত্র অন্ধ্রপ্রদেশের দাবিতে ১৯৫২ সালে অনশনে প্রাণ দিলেন পট্টি শ্রীরামালু। আন্দোলনের চাপে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হল। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রায়ে ১৪টি রাজ্য ও কতকগুলো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠিত হল। ভাষার ভিত্তিটা পুরোপুরি রাখা যায়নি। কিন্তু রাজ্যগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাই যে হবে প্রশাসনের ভাষা সেটা ধরে নেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হল। ১৯৫০ সালে চালু হওয়া সংবিধানের ৪৫ নম্বর ধারায় বলা হল:

> ...রাজ্যের আইনসভায় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারি কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য রাজ্যে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষাকে অথবা হিন্দিকে গ্রহণ করতে হবে।
>
> কিন্তু যতদিন না রাজ্যের আইনসভায় আইন প্রণোদিত হচ্ছে ততদিন রাজ্যের সরকারি কাজে ইংরেজি ব্যবহৃত হতে থাকবে সে-সব উদ্দেশ্যে, সংবিধান চালু হওয়ার ঠিক আগে যে-জন্য তা ব্যবহার করা হচ্ছিল।

সাংবিধানিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও শাসক কংগ্রেস দল বাংলাকে সরকারি ভাষা করার কোনো উদ্যোগ নিল না। 'যতদিন না... আইন প্রণীত হচ্ছে'—এই ফাঁকটুকু দিয়ে ইংরেজিকে টিকিয়ে রাখল সরকারি ভাষা হিসেবে। বাংলার ভৌগোলিক অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্যে ১৯৫৬ সালে বাংলা-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব আনল। বড়বাজার কেন্দ্রের উপনির্বাচন সংযুক্তির প্রসঙ্গে গণভোটের চেহারা নিল। মোহিত মৈত্র কংগ্রেসের এই দুর্গে কংগ্রেসের প্রার্থীকে হারিয়ে বিজয়ী হলেন। বাংলার জনগণের রায় গেল সংযুক্তির বিরুদ্ধে। আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হল সরকারি ভাষা আইনের জন্য। অবশেষে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর বছরে ১৯৬১ সালে ১১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে 'সরকারি ভাষা আইন' গেজেট ভুক্ত হল, দু'বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৬৩ সাল থেকেই প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলায় কাজকর্ম চালানো হবে। ১৯৬৩ সালে এক সংশোধনী এনে দু'বছরকে চার বছর

করা হল। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ১৯৬৪ সালে আরেকটি আইন জারি করা হল। যে-ভাষাকে অপসারিত করে বাংলাকে সরকারি ভাষা করার ঘোষণা করা হয়েছিল সেই ইংরেজি ভাষার ব্যবহার অব্যাহত রাখা হল। বলা হল, ইংরেজি বজায় থাকবে 'for all official pruposes of the state of West Bengal for which it was being used immediately before that day'।

কুম্ভকর্ণ না-কি ছ'মাস ঘুমোতেন। এই আইনের স্থিতাবস্থার বালিশে মাথা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘুমোলেন ১২ বছর। ১৯৭৭ সালে তরতাজা বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল। ভাষা পরিকল্পনার চমৎকার একটি নিদর্শন আমরা দেখতে পেলাম 'তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর'-এর স্মারকলিপিতে:

১. সরকারের সমস্ত নথিপত্রে বাংলা ভাষায় মন্তব্যাদি লেখা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে হবে।
২. সরকারি কাজে ব্যবহৃত ফর্ম, রেজিস্টার ইত্যাদি যথাসম্ভব বাংলা ভাষায় ছাপাতে হবে।
৩. জনসাধারণের কাছে যে-সব চিঠিপত্র লেখা হয় বর্তমান অসুবিধা সত্ত্বেও সেগুলি যথাসম্ভব বাংলায় লেখার জন্য প্রয়াসী হতে হবে।
৪. নিম্ন আদালতগুলির কাজকর্ম বাংলা ভাষায় পরিচালনা করা সম্পর্কে বিচার বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হবে।
৫. স্টেনোগ্রাফার (শ্রুতি লেখক) এবং টাইপিস্ট (মুদ্রা লেখক) নিয়োগের নিয়মাবলী সংশোধন করে বাংলা ভাষায় মুদ্রালেখন ও শ্রুতিলেখনের জ্ঞান আবশ্যিক করতে হবে।
৬. রাজ্য সরকারের সমস্ত বিভাগ ও অন্যান্য দপ্তরসমূহে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক বাংলায় টাইপ যন্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. বর্তমানে যে-সমস্ত ইংরেজি শ্রুতি লেখক ও মুদ্রা লেখক আছেন তাঁদের অবিলম্বে বাংলা ভাষায় শ্রুতিলেখন ও মুদ্রালেখনের প্রশিক্ষণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজটি আগামী দু'বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।
৮. সরকারি অফিসগুলিতে বাংলা ভাষায় নামের ফলক লেখা আবশ্যিক করতে হবে।

১৯৭৭-এর এই প্রেসক্রিপশনে যে বিশেষ কিছু কাজ হয়নি তা বোঝার জন্য বাম নিন্দুক হওয়ার দরকার পড়ে না। ১৬ বছর পরে ১৪০০ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করে, এবার বাংলায় সরকারি কাজ সত্যিই চালু হবে। ১৬ বছরেও তাহলে 'সত্যিই চালু' হয়নি। তারপরও ১১ বছর কেটে গেছে। ২০০৩ সালের ৪ নভেম্বর তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এক স্মারকলিপি পাঠানো হয় বিভিন্ন দপ্তরে। তাতে দপ্তরগুলোর কাজে বাংলা প্রচলনের রিপোর্ট চেয়ে প্রতিটি দপ্তরে একটি করে কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়।

এরকম এক পা এগোনো, দু'পা পিছোনোর খেলা Times of India-র সাংবাদিকের চোখে ধরা পড়েছে ; কলকাতা পুলিশ সরকারি নিয়ম ভেঙে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহারে ফিরে গেছে। কলকাতা পুলিশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তনের একবছর কাটতে না কাটতেই, বাংলা চুপি চুপি মর্যাদার অবস্থানে ফিরে আসে।[৯]

কেন এমন হয়, কেন ঘোষিত অধিকার, বারংবারে প্রতিশ্রুতি মরীচিকায় পরিণত হয়—এক কথায় তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব না। সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা glottopolitics বা ভাষার রাজনীতি—সেখানে তত্ত্বগতভাবে এ-সব সুকৌশল অন্তর্ঘাতের কথা আলোচিত হয়েছে। আমরা কি খবর রাখি ৩০ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশেও এ ধরনের অন্তর্ঘাত চলেছিল? বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দশ বছর পরেও বাংলা ভাষা সর্বস্তরে প্রশাসনিক কাজে প্রতিষ্ঠা পায়নি। ১৯৮২ সালে মনসুর মুসা লিখেছিলেন:

> 'এ-প্রসঙ্গে ভাষা রাজনীতির শাস্ত্রে 'নিষ্ক্রিয়তা তত্ত্ব' বলে যে-ব্যাপারটি আছে, তার উল্লেখ করতে চাই। ভাষা রাজনীতির কোনো কোনো পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, ভাষা স্থগিত রাখা যায় যদি ভাষাভাষী মানুষের ভাষাগত তৎপরতাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'নিষ্ক্রিয়' করে রাখা যায়। এটা হচ্ছে মানুষের 'ইচ্ছা'কে কর্মে রূপান্তরিত হতে না দেওয়ার কূটকৌশল। আমাদের বাংলা প্রচলনের ইচ্ছাকে আর্থ-সামাজিক ও ক্ষমতা-বিন্যাস-কৌশলে এখন 'নিষ্ক্রিয়তার তত্ত্বে' নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে।'[১০]

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরো বহুগুণ ভয়ংকর। ১৯৫২-র মতো আমরা প্রাণ দিইনি, ১৯৭১-র মতো রক্তের বন্যা এখানে বয়নি, আমাদের দীন প্রাণে

বাংলা প্রচলনের ইচ্ছাটাও দুর্বল হয়ে এসেছে। এখানে 'নিষ্ক্রিয়তার কূটকৌশল' চালাতে আমলাতন্ত্রকে বেশি কুটিল না-হলেও চলে। এই ধারাবাহিকতা আজও সমানে চলে আসছে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

উদ্ধৃতি সূত্র

১. একুশে ফেব্রুয়ারির এই বার্তাটি বাংলায় প্রথম ছাপানো হয় বাংলাদেশের 'জাদুঘর সমাচার' পত্রিকায়। (দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০০)

২. পুষ্কর দাশগুপ্ত, বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব, পৃ. ১৪৯-৫০ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান নিবন্ধকারের।

৩. মনসুর মুসা, ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ, পৃ. ১০৭।

৪. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

৫. প্রাগুক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১১১।

৬. স্নেহময় চাকলাদার, ভারতের ভাষা সমস্যা ও রাষ্ট্রনীতি, পৃ. ৫০।

৭. The West Bengal Code, 2nd Edition, vol. VII, Bengal Act 1858-64, Act XIX of 1964, section 2.

৮. স্মারকলিপি নম্বর-২৮০২৪ (চারশো তথ্য, ১৯ নভেম্বর, ১৯৭৭, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জনসূত্র বিভাগ।

৯. Krishnendu Bandopadhayay: English Bengali Juggles in Calcutta turned Kolkata, The Times of India, 6th February, 2001.

১০. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত।

ভাষাবৈচিত্র্য, জীববৈচিত্র্য ও ‘সভ্যতা’র আস্ফালন

বিপ্লব নায়ক

ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে, তাঁর ৮০তম জন্মদিনে ‘জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা’-য় ‘অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টি’ বিস্তার করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সভ্যতার সংকট’ শিরোনামায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

> পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা... উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে।...সমস্ত ইউরোপের বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারি পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাইনি?[১]

কালের যে যাত্রাপথে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কথাগুলি লিখেছিলেন, সেই যাত্রাপথ জুড়ে বিস্তীর্ণ ছিল পশ্চিম ইউরোপের জাতিদের, বিশেষ করে ইংরেজদের, বিশ্বজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের যুদ্ধযাত্রা ও তার অন্তিম জাঁক হিসেবে বিশ্বযুদ্ধ। পশ্চিম ইউরোপে জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তখন

নিজপুষ্টির স্বার্থপর তাড়নায় বিশ্বের বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বেড়ে ওঠা বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় মানবসভ্যতাকে দমন করে, আধিপত্যাধীন করে, কখনও বা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েও সমস্ত কিছুর পণ্যায়নের মধ্যে দিয়ে পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবনের জন্য তার চাতক-তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এই লেখার পরে ৭৫ বছর অতিক্রম করে এসে কালের যাত্রাপথে পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমান আজ আরও প্রখর, 'পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন'-এর মাড়াইকলে পিষে সে গোটা বিশ্বকে মুঠোবন্দী করতে চায়। সভ্যতার সংকটের চেহারা এখন আরও ফুটে বেরিয়েছে। কালদর্শী কবির দৃষ্টিক্ষেপের ক্ষণে যা ছিল হয়তো সভ্যতার শরীরের অন্তর্গত রোগ-লক্ষণ, আজ তা শরীরের বাইরে ভয়ঙ্কর রোগচিহ্ন রূপে প্রকাশ্য—'হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতা' আরও শ্বাসরোধকারী। এই যে রোগচিহ্নসমূহ আজ সাধারণভাবেই দৃষ্টিগোচর, তার মধ্যে গুরুতর তিনটি হল:

১. যুদ্ধ, হিংসা ও মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে, আণবিক যুদ্ধাস্ত্রের আস্ফালনের মধ্য দিয়ে 'ধ্বংসে উন্মত্ত পৃথ্বী'।

২. প্রকৃতির উপর 'কর্তৃত্ব' কায়েম করা, সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে পণ্যে পরিণত করে সবচেয়ে দ্রুত সবচেয়ে বেশি মুনাফা নিঙড়ে নেওয়া, নিরন্তর মুনাফা উৎপাদনের তাড়নায় ভোগবাদকে সীমাহীনতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া—এই সবের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যই ভেঙে পড়েছে। উষ্ণায়ন, বহু জীব প্রজাতির দ্রুত হারে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া, বাতাস-মাটি-জল বিষাক্ত হয়ে ওঠা—এভাবে প্রাণের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে এবং পৃথিবী আর কতদিন প্রাণধারণের উপযোগী থাকবে সেই প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে।

৩. মানবসভ্যতার ভাষার ভাঁড়ার মড়কে আক্রান্ত—অসংখ্য ভাষা তার শেষ বাচক হারিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, বা গুটিকয় বাচকে সীমায়িত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। জীবজগতের বাস্তুতন্ত্রের মতো ভাষার বাস্তুতন্ত্রেও গভীর কোনো অসুখ দানা বেঁধেছে।

রোগচিহ্নসমূহ প্রকাশ্য হয়ে উঠলে চিকিৎসা বা রোগ উপশমের চেষ্টা দূরে থাকে না, ফলে, এই তিনটি রোগচিহ্নের চিকিৎসার বহুবিধ আয়োজন আজ

বর্তমান। যুদ্ধ-হিংসা-মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচি, যুদ্ধবিরোধী প্রচার দৃশ্যমান। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রশ্নে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদ্যোগ, বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক স্তরে কার্বন-নির্গমন নিয়ে দরকষাকষি অবধি বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন পথের উদ্যোগ দৃশ্যমান। এইসবের তুলনায় ভাষার মড়ক নিয়ে সচেতনতা ও উদ্বিগ্নতা কম, তা নিয়ে উদ্যোগও মূলত কিছু বিশেষজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিক ও ভাষাপ্রেমীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ—তাঁদের উদ্যোগে যৎকিঞ্চিত হলেও বিলুপ্তির মুখে দাঁড়ানো ভাষার শেষ কথকদের কাছ থেকে ভাষা-নথি তৈরি করে সংরক্ষণ করা বা ভাষার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা আমরা দেখতে পাব। অর্থাৎ, এই তিনটি গুরুতর রোগচিহ্নেরই আলাদাভাবে উপশমের প্রচেষ্টা চলছে। তবু, দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না, কারণ, উপশমের প্রচেষ্টার পিছনে উদ্যোগ-অর্থ প্রচুর খরচ হলেও, রোগের প্রকোপকে ক্রমশ আরও ছড়িয়ে পড়া, আরও তীব্রতর হওয়া থেকে আটকানো যাচ্ছে কই? এই দুশ্চিন্তা থেকেই বর্তমান আলোচনায় এই তিনটি রোগচিহ্নকে আলাদাভাবে না দেখে, তাদের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কের বিচারে দেখার চেষ্টা করা হবে এই আশা নিয়ে যে তার মধ্য দিয়ে হয়তো সভ্যতার শরীর-অভ্যন্তরের মূল রোগের সঙ্গে কিছু পরিচিতি ঘটতে পারে, মূল রোগের চিকিৎসার ব্যাপারেও ভাবনাচিন্তার কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে হয়ত। তৃতীয় রোগচিহ্ন, অর্থাৎ ভাষার বাস্তুতন্ত্রের সংকট যেহেতু সবচেয়ে কম আলোচিত, তাই সেই বিষয় ধরেই আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

ভাষার বাস্তুতন্ত্র

ভাষা হল একগুচ্ছ নিয়মবিধি যা সংশ্লিষ্ট বাচকদের পারস্পরিক সম্মতি ও স্বীকৃতির মাধ্যমে চর্চিত ও বিকশিত হয়ে থাকে। চর্চিত ও বিকশিত হওয়ার অর্থ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বাহিত হওয়া ও সামাজিক অভিজ্ঞতার নিত্য নতুন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়া। আর, পারস্পরিক সম্মতি ও স্বীকৃতি সামাজিক জীবনে নিরন্তর উৎপাদিত হতে হয়, সামাজিক-রাজনৈকি-অর্থনৈতিক বহু শর্তের উপর নির্ভরশীল সেই উৎপাদন। বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে মানুষ সমাজজীবন, জীবনাচার গড়ে তুলেছে যে বহু বিচিত্রভাবে, সেই বহু বিচিত্র

সংস্কৃতির একটি প্রধান অংশ হল ভাষা। প্রত্যেকটি ভাষাই সমপরিমাণে যুক্তিবদ্ধ, জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে সমপরিমাণ জটিল, সমপরিমাণ সুসম্বদ্ধ ও যে কোনো ভাবনা/ধারণা-কে প্রকাশ করতে সমপরিমাণ সক্ষম। অর্থাৎ, প্রতিটি ভাষার সক্ষমতা ও সম্ভাবনা সমান। সেই সক্ষমতা ও সম্ভাবনা কতদূর বিকশিত হবে তা সামাজিক ক্ষেত্রে কতটা উদ্যোগ, প্রয়াস ও প্রয়োগক্ষেত্রের বিভিন্নতা সেই চর্চার ক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হচ্ছে। ভাষাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানাপোড়েনও, তার উপর নির্ভর করে। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কিছু বিশেষ অবস্থার সন্নিবেশে কোনো ভাষার বাচকরা যদি ক্রমশ ক্ষীয়মান হতে থাকে, সেই ভাষা ব্যবহারের পারস্পরিক সম্মতি ও স্বীকৃতি পুনরুৎপাদিত না হয়, তাহলে সে ভাষা বিপন্ন হয়ে পড়ে, বাচক ও প্রয়োগক্ষেত্র হারাতে হারাতে লুপ্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। ভাষার বাস্তুতন্ত্রের সাধারণ চেহারাটি এইরকম। এবার তার বর্তমান মূর্ত নির্দিষ্ট চেহারাটাকে ধরার চেষ্টা করা যাক।

বর্তমানে পৃথিবীতে কথ্যভাষার সংখ্যা ৭,০০০ থেকে ১০,০০০। তাছাড়াও আছে আরও কয়েক হাজার সাংকেতিক ভাষা (sign language)। কথ্যভাষাগুলিকে যদি আমরা তাদের বাচকসংখ্যার নিরিখে বিন্যস্ত করি তাহলে আমরা তিনটি ভাগ দেখতে পাব:

প্রথম ভাগ—অতিকায় ভাষা: এই ভাগে আছে ১০টি ভাষা যাদের প্রত্যেকের বাচক সংখ্যা ১০ কোটি বা তার বেশি। এই ভাষাগুলি হল – মান্দারিন (চিনা), ইংরেজি, হিন্দি, কাস্তিলীয় (স্প্যানিস), আরবি, ওলন্দাজ, রুশ, বাংলা, জাপানি ও জার্মান। সংখ্যায় এরা পৃথিবীর মোট কথ্যভাষার ০.১%, কিন্তু এদের বাচক পৃথিবীর জনসংখ্যার ৫০%-এর কাছাকাছি।

দ্বিতীয় ভাগ—মধ্যমাকায় ভাষা: এই ভাগে আছে অনধিক ৩০০ ভাষা, যাদের এক একটির বাচকসংখ্যা ১০ লাখ থেকে ১০ কোটির মধ্যে। এই ভাগে আছে ফরাসি, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয়, স্লোভাক, ক্রোট, ফিন, সুইডিশ, ডেন, চেক, এস্তোনীয় ইত্যাদি। এই অনধিক ৩০০ ভাষার মোট বাচকসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪৫%।

তৃতীয় ভাগ—ক্ষীণকায় ভাষা: এই ভাগে রয়েছে সেইসব ভাষা যারা আগের দুই ভাগের কোনোটিতে পড়ছে না, অর্থাৎ প্রায় ৬,৭০০-৯,৭০০ ভাষা।

এই সমস্ত ভাষার বাচকসংখ্যা ১০ লাখের কম। এর মধ্যে ৫০%-এর অর্থাৎ অর্ধেকের বাচকসংখ্যা ১০,০০০-এর কম; আর এদের অর্ধেকেরও অর্ধেক বা ২৫%-এর বাচকসংখ্যা ১,০০০-এরও কম।[২]

বাচকসংখ্যার নিরিখের সঙ্গে এবার আরেকটা নিরিখ যোগ করা যাক—সেই নিরিখ হল কী পরিমাণ সামাজিক ক্ষেত্র জুড়ে ভাষাটির চর্চা হচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্র বলতে যে ধরনের ক্ষেত্রগুলোকে বোঝানো হচ্ছে তা হল:

১. পরিবারের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্র,
২. আঞ্চলিক গোষ্ঠীজীবনে ব্যবহারের ক্ষেত্র,
৩. রাজ্য/রাষ্ট্র স্তরে প্রশাসনিক ও সরকারি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্র,
৪. পেশাজীবনে ব্যবহারের ক্ষেত্র,
৫. শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যম রূপে ব্যবহারের ক্ষেত্র,
৬. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্র।

এই নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে যে তৃতীয় ভাগের ভাষাগুলি, যাদের আমরা 'ক্ষীণকায় ভাষা' নাম দিয়েছি, মোট ভাষাসংখ্যার ৯৬% যে সমস্ত ভাষার সংখ্যা, তারা উপরে উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রধানত ১ ও ২ নম্বর ক্ষেত্র দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ১ ও ২ নম্বর ক্ষেত্রে এই ভাষাগুলির ব্যবহারকারীরা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোয় অতিকায় বা মধ্যমাকায় ভাষার কোনো কোনোটিকে ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে ক্রমশ পরবর্তী প্রজন্মগুলোয় এই ১ ও ২ নম্বর ক্ষেত্রেও তাদের ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সম্মতি ও স্বীকৃতি-র পুনরুৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে—প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সে ভাষার বাহিত হওয়ার ধারা ক্ষীণ হচ্ছে—ভাষালোপের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে অতিকায় বা মধ্যমাকায় ৩০০টি-র মতো ভাষা ১ থেকে ৬—সবকটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত, এক বা একাধিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ভাষা রূপে অতিরিক্ত গুরুত্বের অধিকারী। অবশ্য এই ৩০০টি ভাষাকেও একই লপ্তে বিচার করা যায় না। এদের মধ্যেও বৈষম্য বিরাট। ইংরেজি ভাষা অন্য সমস্ত ভাষার তুলনায় ১ থেকে ৬ নম্বর ক্ষেত্রে গোটা বিশ্ব জুড়ে আধিপত্য কায়েম করে আছে ও সেই

আধিপত্য আরো বাড়িয়ে চলেছে। আর এই আধিপত্যকারী ভাষাদের চাপে ক্রমশ একের পর এক সামাজিক ক্ষেত্র থেকে অন্য ভাষাদের ব্যবহার সংকুচিত হতে হতে মুছে যাচ্ছে। এইভাবে এই অতিকায় ভাষাগুলো অন্য ভাষাদের সাপেক্ষে 'ঘাতক ভাষা' রূপে দেখা দিয়েছে, আর ইংরেজি ভাষা হয়ে উঠেছে অন্য সমস্ত ভাষার সাপেক্ষে 'ঘাতক'।

এইভাবে ভাষার বাস্তুতন্ত্র ক্রমশ ভাষাবৈচিত্র্য হারাচ্ছে, দ্রুত থেকে দ্রুততর হারে মড়ক ছড়াচ্ছে ভাষার জগতে। প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে যেভাবে দ্রুতহারে বিভিন্ন প্রাণীপ্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বা বিপন্ন অবস্থায় ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়েছে, জীববৈচিত্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তার প্রতিফলনই যেন পড়েছে ভাষার বাস্তুতন্ত্রে।

প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে মানবপ্রজাতি প্রকৃতির উপর আধিপত্য কায়েম করার অন্ধ দম্ভে, অন্য সমস্ত প্রজাতির ঊর্ধ্বে 'শ্রেষ্ঠ' হিসেবে নিজেকে নিজেই বসিয়েছে। ফলে প্রকৃতি ও অন্যান্য প্রজাতির প্রয়োজন সম্বন্ধে অন্ধ থেকে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের দ্বারা নিঙড়ে নেওয়া ক্রমশ অন্যান্য প্রজাতির জীবনধারণ ও জীবনাচারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে দিচ্ছে, ধ্বংস করে দিচ্ছে।[৩] তুলনীয়ভাবে, গুটিকয় 'ঘাতক ভাষা' অন্য সমস্ত ভাষার তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে ভাষার অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোকে দখল করে নিয়ে হাজার হাজার ভাষাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছে।

প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ও ভাষিক বাস্তুতন্ত্র—এই দুইয়ের মধ্যেই এই হন্তারক ক্ষমতার উৎপাদন-পুনরুৎপাদন কীভাবে হয়েছে ও হচ্ছে এবার তা দেখা যাক।

ভাষিক বৈচিত্র্যের শত্রু-মিত্র

ভাষার বাস্তুতন্ত্রে ঘাতক ক্ষমতার গঠন বিচার করার জন্য নজর কেন্দ্রীভূত করা যাক পৃথিবীর সেই সমস্ত অঞ্চলগুলোয় যেখানে এখন ভাষাবৈচিত্র্য সর্বাধিক। ভাষিক বৈচিত্র্যের বিচারে পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব:[৪]

দেশ	জনসংখ্যা (লাখে)	জীবিত ভাষার সংখ্যা	সবচেয়ে বেশি বাচক যে ভাষার	সবচেয়ে বেশি বাচকসম্পন্ন ভাষার বাচক সংখ্যা		দেশের সরকারি ভাষা
				মোট সংখ্যা	জন-সংখ্যার শতকরা	
১. পাপুয়া নিউগিনি	১১১৩৬	৮৬৭	এংগা	১,৬৪,৭৫০	৫	ইংরেজি, তোক্, পিসিন, হিরি মোতু
২. ভানুয়াতু	১.৪৩	১১১	হানো	৭,০০০	৫	বিসলামার, ইংরেজি, ফরাসি
৩. সোলেমন দ্বীপপুঞ্জ	৩	৬৬	কাওয়ারি	২১,০০০	৭	ইংরেজি
৪. আইভরি কোস্ট	১২০.৭	৭৫	বাওউলে	১৬,২০,১০০	১৩	ফরাসি
৫. গ্যাবন	১০.৬৯	৪০	ফাং	১,৬৯,৬৫০	১৬	ফরাসি
৬. উগান্ডা	১৭৫.৯৩	৪৩	গাণ্ডা	২৯,০০,০০০	১৬	ইংরেজি
৭. ক্যামেরুন	১১৯	২৭৫	বেটি	২০,০০,০০০	১৭	ফরাসি, ইংরেজি
৮. কেনিয়া	২৫৩.৯৩	৫৮	গিকুয়ু	৪৩,৫৬,০০০	১৭	কিসোয়াহিলি, ইংরেজি
৯. নামিবিয়া	১৩.৭২	২১	নডোংগা	২,৪০,০০০	১৭	ইংরেজি
১০. জাইর	৩৫৩.৩	২১৯	সিলুবা	৬৩,০০,০০০	১৮	সিলুবা, কিকোংগো, কিসোয়াহিলি, লিংগালা, ফরাসি

বিশ্বের মানচিত্রে যদি দেশগুলোর অবস্থান খেয়াল করি, তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম তিনটি দেশ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝের ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জসমূহের অংশ আর পরের সাতটি আফ্রিকা মহাদেশে স্থিত। আরও খেয়াল করলে দেখা যাবে যে নামিবিয়া ছাড়া বাকি সবগুলো বিষুবরেখার দুইদিকে দশ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত; নামিবিয়া তার একটু বাইরে—তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের আশেপাশে অবস্থিত। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই অঞ্চলগুলো জঙ্গল আচ্ছাদিত এমন ভূখণ্ড যেখানে কেবল ভাষাবৈচিত্র্যই নয়, জীববৈচিত্র্যও সর্বাধিক ঋদ্ধতায় বিরাজমান। এইটি কি কাকতালীয়? তা বোধ হয় নয়। কারণ গোটা বিশ্বজুড়েই এমন একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। লুইজা মাফি যেমন

বলেছেন, 'বিশ্বের জীববৈচিত্র্যে সবচেয়ে ঋদ্ধ অঞ্চল ও ভাষাবৈচিত্র্যে সবচেয়ে ঋদ্ধ অঞ্চলগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়।'[৫]

আবার যদি আমরা উপরের সারণিতে ফিরে যাই এবং প্রথম তিনটি দেশের দিকে চোখ রাখি, তাহলে দেখব যে এই তিনটি অঞ্চলে সর্বাধিক বাচক সম্পন্ন ভাষার বাচকসংখ্যা যথাক্রমে ১.৬ লাখ, ৭ হাজার ও ২১ হাজার যা ওই অঞ্চল তিনটির মোট জনসংখ্যার ৫-৭% মাত্র। সুতরাং এই অঞ্চলের (৮৬৭ + ১১১ + ৬৬ =) ১০৪৪ ভাষার কোনোটিরই বাচকসংখ্যা ৭ শতাংশের বেশি নয়। সুতরাং এখানে ভাষাগুলোর মধ্যে কোনোটিই জনসংখ্যার বড়ো অংশ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জুড়ে নেই। ভাষাবৈচিত্র্যের ঋদ্ধির সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটির সম্পর্কও কাকতলীয় নয়। ভাষাতাত্ত্বিক ক্লিনটন ডি ডাবলু রবিনসন দেখিয়েছেন যে বিশ্বে মোট ৪৪টি দেশ পাওয়া যায় যেখানে কোনো ভাষা-বাচকগোষ্ঠীই মোট জনসংখ্যার ৫০% বা তার বেশি নয় (এদের মধ্যে ২৫টি আফ্রিকায়, ৯টি এশিয়ায়, ৪টি ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ ও লাতিন আমেরিকায় এবং ৬টি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে)—ভাষিক বৈচিত্র্যও এই সমস্ত অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।[৬] খেয়াল করলে দেখা যাবে যে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের একটি অঞ্চলও ভাষিক বৈচিত্র্যের ঋদ্ধির এই তালিকায় নেই। এই তথ্যসমূহ ইঙ্গিত করে যে যেসব অঞ্চলে এক বা একাধিক ভাষা অতিকায় ভাষা হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করেছে এবং যেসব অঞ্চলে পুঁজিবাদী বিকাশ বেশি হয়েছে, সেই সমস্ত অঞ্চলেই ভাষাবৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে সবচেয়ে বেশি।[৭] প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ অতিকায় ভাষার আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে ভাষাবৈচিত্র্যের ধ্বংসের সম্পর্ক পূর্বালোচনার উপর দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে আসে। কিন্তু, দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে ভাষাবৈচিত্র্য ধ্বংস সম্পর্কিত কীভাবে? এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের এর পরে আলোচনা করতে হবে।

সেই আলোচনায় যাওয়ার পথে আমরা পূর্বের সারণিটির সবচেয়ে ডান দিকের স্তম্ভটির দিকে নজর দিই। দেখা যাবে যে এই দশটি দেশের প্রত্যেকটিতে সরকারি ভাষা রূপে চালু আছে ইংরেজি বা ফরাসি। এই দুটি ভাষা এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়নি—এই দুটি ইউরোপীয় ভাষা—ইউরোপীয় ধর্ম প্রচারক, উপনিবেশ-স্থাপক ও পুঁজিবাদ প্রসারকদের মাধ্যমে এসেছে। সারণিতে দেখা যাবে যে দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই দেশের সর্বাধিক বাচক সম্পন্ন

ভাষা সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসেবে কোনো সহযোগীর স্থানও পায়নি। সুতরাং সামাজিক ক্ষেত্রে ভাষা-ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র—সমাজ-সংগঠন পরিচালনা ও পরিকল্পনার ক্ষেত্র—সেখান থেকে সেই অঞ্চলের ভাষাগুলি নির্বাসিত। কীভাবে এমন হল? পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো বিশ্বজুড়ে উপনিবেশ-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে শাসনকাঠামো তৈরি করেছিল তাদের আধিপত্য সুনিশ্চিত করতে—সেই শাসনকাঠামোর ভাষা ছিল তাদের ইউরোপীয় ভাষা। ঔপনিবেশিক শাসনের যুগ পেরিয়ে গিয়েও সে ভাষার আধিপত্য এমন স্থায়ীত্ব নিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর ঘাতক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে কীভাবে—এবার সেই দিকে নজর ফেরানো যাক।

'প্রগতি'-র পৌষমাস, বৈচিত্র্যের সর্বনাশ

পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো প্রথম যে জোরের উপর দাঁড়িয়ে বিভিন্ন মহাদেশে তার উপনিবেশ ছড়িয়েছিল, সেই জোর হল মানুষ মারার জোর, আগ্নেয়াস্ত্রের জোর। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া-র আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি গণহত্যায় নিকেশ হয়ে গিয়েছিল অথবা ধ্বংসশক্তির রুদ্রতেজে ঝলসে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এর উপর দাঁড়িয়ে শুরু হয় ঔপনিবেশিক দখলদারি—প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে 'পুঁজির আদিম পুঞ্জীভবন' প্রক্রিয়া, যার রসদে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের স্ফূর্তি। এই সমস্ত বিস্তীর্ণ মহাদেশগুলোয় মানবসমাজের যে বৈচিত্র্যময় রূপগুলি গড়ে উঠেছিল ইউরোপীয়রা তাদের নাম দিল 'আদিম' বা 'অনগ্রসর'—নিজেদের 'অগ্রসরতা'-কে মান্যতা দেওয়ার জন্যই হয়ত এই বিস্তীর্ণ মহাদেশগুলোর আদিবাসীদের সমাজগুলো জুড়ে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, সুসম্বদ্ধ জীবনাচারের রীতি। প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে নিজেদের পরিবার বা বংশের একজনের মতো বিচার করে প্রকৃতিকে ভালোবাসা, প্রকৃতিকে রক্ষা করার উপর দাঁড়িয়ে ছিল এই জীবনাচার। এই সবের ধ্বংসের উপর দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় 'ভাগ্যানুসন্ধানীদের' দুর্বার অভিযান প্রতিষ্ঠা করল এমন এক জীবনাচার যা যত দ্রুত সম্ভব, যত বেশি সম্ভব প্রকৃতি থেকে সম্পদ নিঙড়ে নিয়ে মুনাফা তুলে নিতে চায়, প্রকৃতি তার কাছে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য, ব্যবহারান্তে ফেলে দেওয়ার যোগ্য একটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে নিজেদের 'শ্রেষ্ঠত্ব' প্রতিষ্ঠিত করা

এই দখলদারদের প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের 'শ্রেষ্ঠত্ব'-এর আরও কিছু সংজ্ঞা প্রায় সাধারণ জ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতায় নির্মীত হল। সেইগুলি হল:

১. পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রবর্তী সমাজ, অন্য সমস্ত সমাজ তাদের থেকে কয়েক শতক করে পিছিয়ে রয়েছে।
২. প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা একটা দুর্বলতা, অন্যদিকে প্রকৃতিকে পেষণ করে নিঙড়ে নেওয়া শক্তির পরিচায়ক।
৩. প্রকৃতির সঙ্গে সুসম্বদ্ধ যৌথ জীবনাচার হল পশ্চাৎপদতা, প্রকৃতির সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বানিয়ে বেচে-কিনে-নয়ছয় করে 'ভাগ্যানুসন্ধান' হল অগ্রগামী মানসিকতা।
৪. অন্য সমস্ত সমাজ যেহেতু নাকি এমন সব স্তরে আটকে আছে যা ইউরোপ দীর্ঘদিন আগেই পেরিয়ে এসেছে, তাই দ্রুত ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন করা, ইউরোপকে অনুকরণ করার জন্য প্রাণান্ত করাই হল প্রগতি।

'প্রগতি'-র এই বয়ানই 'আধুনিক শিক্ষা', 'আধুনিক মূল্যবোধ' হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসনের পৌরাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন প্রকৃতির পণ্যায়ন ও নির্বিচার দোহনের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিপন্ন হওয়া, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়া ঘটেছে, তেমনই ঘটেছে ইউরোপীয়করণের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধ্বংসসাধন। এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ধ্বংস, আদিবাসীদের বৈচিত্র্যমূলক সংস্কৃতি ধ্বংস, অন্ধ ইউরোপ-অনুকরণ—এসবের মধ্য দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভাষাবৈচিত্র্যও। ইউরোপকে অনুকরণ করে সমাজ-সংগঠন বানানো, ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থাকেই উপনিবেশগুলোয় তাদের ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থার জায়গায় প্রতিস্থাপিত করা, ইউরোপীয় ধর্ম-দর্শন-কে জ্ঞানের মোক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা—এসবের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় ভাষাগুলো উপনিবেশে একের পর এক সামাজিক ক্ষেত্র দখল করেছে—পিছু হঠেছে, লুপ্ত হয়ে গেছে একের পর এক আঞ্চলিক ভাষা। আর এই সমস্ত ভাষা তার সঙ্গে বিলুপ্তির গহ্বরে টেনে নিয়ে চলে গেছে ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও জীবনভাবনার বহু বিচিত্র সম্ভারকে।

আগ্নেয়াস্ত্র আস্ফালনের মধ্য দিয়ে এই যে 'প্রগতি' যাত্রার সূচনা, মধ্যপর্বে তা দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পর্ব পেরিয়ে এসে অধুনায় 'পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন'-এর নব অবতারে অবতীর্ণ। 'পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন'-এর মন্ত্র পাঁচটি:

১. (পুঁজির পুঞ্জীভবনের) বৃদ্ধি—অতি বৃদ্ধি—অতি অতি বৃদ্ধি—এই-ই হল উন্নয়ন। এই 'উন্নয়ন' বিগ্রহের পুজোয় জোড়হস্ত হয়ে হাড়িকাঠে বলি দাও মানবসম্পদ সহ সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ।

২. সমস্ত কিছুকে পণ্যে পরিণত কর, সব সম্পদই ব্যক্তিগত, সবকিছুই কেনাবেচার জন্য। এর জন্য এখনও যা কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক সম্পদ, যৌথ সম্পদ হিসেবে বাজারের ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে—তাদেরও পণ্যে পরিণত কর, পুঁজির চক্রে ঘোরাও।

৩. পণ্যপুজো, পণ্যরতি-এর আদলের বাইরে আর যা কিছু সাংস্কৃতিক ভিন্নতা আছে, সে সবই 'অসভ্য'—সুতরাং তাদের ধ্বংস কর।

৪. আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমস্ত অর্থনীতিকে রফতানি কেন্দ্রিক উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করে পুঁজির আধিপত্য-শৃঙ্খলে বাঁধো। এর ফল যদি পরিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক আর সামাজিকভাবে বৈষম্য বিস্তারকারী হয়, চিন্তা নেই, অস্ত্র উচিয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারলেই হল।

৫. সমস্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূতকরণ, কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের প্রবণতাকে চূড়ান্তভাবে বাড়াও। শিক্ষা, সরকার, প্রশাসন—সমস্ত কিছুকে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থারূপে গঠিত করে আধিপত্যকারী মতাদর্শ ও আধিপত্যকারী ভাষার দাপট নিরঙ্কুশ কর।

তাত্ত্বিক ডেভিড হার্ভে[৮] এই পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন কে দুইটি উপাদানের দ্বান্দ্বিক দ্রবণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুইটি উপাদানের প্রথমটি হল 'রাষ্ট্রের ও সমাজের রাজনীতি' আর দ্বিতীয়টি হল 'দেশ-কাল-এ সঞ্চারমান পুঁজির পুঞ্জীভবনের আণবিক প্রক্রিয়াসমূহ'। প্রথম উপাদান অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের ও সমাজের রাজনীতি' হল সেই প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-জোট, বহুজাতিক সংস্থা-নিগম-বা- ব্যবসায়িক-প্রতিষ্ঠান ক্রমবিস্তারমানতায় এমন এক কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে চায় যার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবসম্পদকে ব্যবহারের অধিকার কঠোরভাবে কেবলমাত্র পুঁজির হাতে রাখা যায়। এই অধিকারকে পুঁজির স্বার্থে কেন্দ্রীভূত করে যে সমাজ পরিচালনব্যবস্থা—তা মূলগতভাবেই অগণতান্ত্রিক, কারণ তা সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার ব্যাপক মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় পুঁজির

ব্যবস্থাপকদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে। এই কেন্দ্রীভূতকরণের প্রবণতার সঙ্গেই একটি (বা গুটিকয়) আধিপত্যকারী 'বৃহদায়তন', 'ঘাতক' ভাষাকে সরকার-প্রশাসনের ভাষা করা যুক্ত—কারণ তার মধ্য দিয়েই অন্য ভাষার বাচক অগুন্তি মানুষের হাত থেকে সবথেকে কার্যকরীভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অংশ নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়। দ্বিতীয় যে উপাদান, অর্থাৎ 'দেশ-কাল-এ সঞ্চারমান পুঁজির পুঞ্জীভবনের আণবিক প্রক্রিয়াসমূহ', তা হল সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার সমষ্টি যাদের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতা দেশ-কালের সন্তত ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকভাবে সঞ্চারিত হয়—এদের মধ্যে আছে পণ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পুঁজি-প্রবাহ, অর্থ প্রবাহ, শ্রমিক পরিযান, প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা নিয়ে ফাটকা, 'তথ্য' ও 'সংস্কৃতি'-র প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ। এই প্রক্রিয়াগুলোও ভাষা-নির্ভর, অনেকগুলো তো ভাষা দিয়েই গঠিত। এর মধ্য দিয়েও পুঁজি-নিয়ন্ত্রণকারী কেন্দ্রের ভাষা (বর্তমান বিশ্বে প্রধানত ইংরেজি) অন্য সমস্ত ভাষার কাছ থেকে একের পর এক সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র কেড়ে নেয়। ঘাতক ভাষা হিসেবে ইংরেজির ক্রমশ আরও অমোঘ হয়ে ওঠা এইভাবে ঘটছে।

অতএব...

আলোচনার এমন একটা জায়গায় আমরা চলে এসেছি যেখনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, 'অতএব কী করণীয়?' করণীয়ের তালিকা তৈরি করে অগ্রগণ্যতার ভিত্তিতে কোথা থেকে এখনই কী কাজ শুরু করা যায় এমনটা বলতে পারলে বোধহয় আলোচনাটা স্বস্তিজনকভাবে শেষ করা যেত। কিন্তু তা বোধ হয় হওয়ার নয়। মারণাস্ত্রের আস্ফালনের বিরুদ্ধে, প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র ও ভাষিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষার পক্ষে যাঁরা ভাবতে চান, তাঁদের কাছে এই আলোচনা শুধু কিছু পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগ তুলে ধরেছে। আরও একটি সম্পর্কের কথা দিয়েই শেষ করা যাক। প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য রক্ষা পৃথিবীকে প্রাণধারণের যোগ্য রাখার জন্য যদি প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সূত্র ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সেইসব আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মধ্যে, যে আদিবাসীরা প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবনাচার গড়ে তুলেছিলেন প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে।

সাধারণ জ্ঞানের মতো আমাদের কাছে যা প্রশ্নাতীত, সেই 'প্রগতি', 'উন্নতি' ইত্যাদির নানা ধারণাকে প্রশ্নের মুখে রেখে আমরা যদি সত্যিই গ্রহণোন্মুখ হয়ে মানব সভ্যতার এই ভাণ্ডারের দরজা খুলতে চাই, তাহলে তা খোলার চাবিকাঠি অজস্র অসংখ্য লুপ্তপ্রায় ভাষায় আছে। ভাষাবৈচিত্র্যের ধ্বংস আমাদের কাছ থেকে শেষ এই সম্পদকেও কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলত কী করণীয় তার তালিকা প্রস্তুত জরুরি, কিন্তু তারও আগে জরুরি নিজেদের 'উন্নত' সভ্যতার অহমিকা ঝেড়ে ফেলে মানবসভ্যতার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ভাষার ভাণ্ডারে ভিক্ষুকবেশে যাওয়া। আগে সেই চেষ্টাই করা যাক না কেন।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

টীকা/ তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভ্যতার সংকট।

২. ভাষার সংখ্যা ও তার বাচকের সংখ্যা নিয়ে যে সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে তা নিয়ে কয়েকটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজনীয়। ভাষার সংখ্যা বা তার বাচকের সংখ্যা কাঁটায় কাঁটায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তার অন্যতম কারণ এই যে এই বিষয়ে এমন কোনো নমুনা সমীক্ষা পরিকল্পনা করা সম্ভব নয় যার থেকে রাশিবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমগ্র সম্বন্ধে নিশ্চয়তার কাছাকাছি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়। তাই এই সমস্ত হিসাবই বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের করা 'বিশেষজ্ঞের অনুমান', যাকে ইংরেজিতে 'learned estimate' বলা হয়ে থাকে। এই সমস্ত অনুমান যেহেতু বিশেষজ্ঞের নিজস্ব তাত্ত্বিক ঝোঁকের উপর নির্ভরশীল, তাই এক বিশেষজ্ঞ থেকে আরেক বিশেষজ্ঞের হিসেবের মধ্যে পার্থক্যও ঘটে যায় দুস্তর। যেমন, মোট ভাষার সংখ্যার ক্ষেত্রে, সর্বনিম্ন অনুমান ৭০০০ ও সর্বোচ্চ অনুমান ১০,০০০—তাদের মধ্যে পার্থক্য ৩০০০। এতৎসত্ত্বেও, এই সমস্ত অনুমানকে একসঙ্গে বিচার করে মোদ্দা একটা ধারণা তৈরি করা যায় এবং এই কাজটাই করেছেন টোভ স্কুটনাব-কাঙ্গাস বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিকদের করা হিসাব তুলনা-প্রতি তুলনা করে। টোভ স্কুটনাব-কাঙ্গাস এর প্রবন্ধ "লিংগুয়িস্টিক ডাইভারসিটি, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড দি 'ফ্রি' মার্কেট" থেকে এই হিসাবটি এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধটি যাওয়া যাবে মিলোস কোনট্রা, রবার্ট ফিলিপসন, টোভ স্কুটনাব-কাঙ্গাস, ও টিবর ভেরাদি সম্পাদিত "ল্যাংগুয়েজ এ রাইট অ্যান্ড এ রিসোর্স, অ্যাপ্রোচিং লিংগুয়িস্টিক হিউম্যান রাইটস" (১৯৯৯) গ্রন্থে।

৩. ১৯৯০ সালে ইউনেস্কোর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ৪,৪০০ পরিচিত স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে ৩২৬টি, অর্থাৎ ৭.৪% বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে আছে (ইউনেস্কোর ভাষায় হয় 'এনডেনজারড' অথবা 'থ্রেটেনড') আর ৪,৬০০ পরিচিত পাখির প্রজাতির মধ্যে ২৩১টি অর্থাৎ ২.৭% বিলুপ্তির মুখে। আলাস্কার প্রাণীবিজ্ঞানীরা এই হিসাবকে অত্যন্ত কমিয়ে করা বলে সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তাঁদের মতে হিসাব দুটি যথাক্রমে ১০% ও ৫% হবে। ১৯৯৬ সালে ইউনেস্কো যে হিসাব দাখিল করে, সেখানে ১৯৯০-এর বিপন্নদের অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আর বিপন্নের সংখ্যা আরও বেড়ে স্তন্যপায়ী ও পাখিদের ক্ষেত্রে ৫,২০৫ প্রজাতিতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে গাছেদের বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে এইরকম তথ্য দাখিল করা হয়। সেই তথ্য থেকে বলা যাচ্ছে যে গাছেদের পরিচিত ২৭০,০০০ প্রজাতির মধ্যে ৩৪,০০০ প্রজাতি বিলোপের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই সংক্রান্ত তথ্যের সূত্রঃ <http://www.wemc.org.uk/species/data/ index.html> |

৪. এই সারণিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ক্লিনটন ডি ডাবলু রবিনসন-এর 'হুজ মাইনরিটিজি আর ইন দি মেজরিটি : ল্যাঙ্গুয়েজ ডিনামিক্স অ্যামিডস্ট হাই লিংগুয়িস্টিক ডাইভারসিটি' প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটি কিস ডি বট সম্পাদিত ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'কেস স্টাডিজ ইন মাইনরিটি ল্যাংগুয়েজেস' গ্রন্থের অন্তর্গত।

৫. লুইজা মাফি 'টেরালিঙ্গুয়া'-র প্রেসিডেন্ট। টেরালিঙ্গুয়া হল ভাষাতাত্ত্বিক ও জীববিজ্ঞানীদের একটি সম্মিলিত সংগঠন যা গোটা বিশ্ব জুড়ে ভাষাবৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি এই বক্তব্যটি রাখেন বার্কলে-র ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এনডেঙ্গারড্ ল্যাংগুয়েজেস, এনডেঙ্গারড্ নলেজ, এনডেঙ্গারড্ এনভায়রনমেন্টস' শীর্ষক সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়ে, ১৯৯৬-এর অক্টোবরে।

৬. এই ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ৪-এর অনুরূপ।

৭. এখানে এই পূর্বানুমান আমরা ধরে নিচ্ছি যে মানবসভ্যতায় ভাষার ইতিহাসের প্রথম দিকে জনবসতিসম্পন্ন সমস্ত এলাকাতেই ভাষাবৈচিত্র্য ছিল একইরকম। ভাষাতাত্ত্বিক তোরে জ্যানসন-এর 'বিশেষজ্ঞের অনুমান' বলে যে ১২,০০০ বছর আগে মানুষ যখন শিকারী ও প্রকৃতি থেকে সংগ্রহকারীর স্তরে ছিল, তখন বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার ঘনত্ব ছিল ১ থেকে ২ হাজার মানুষ পিছু একটি ভাষা (তোরে জ্যানসন-এর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত 'স্পাকেন ওখ হিস্তোরে' গ্রন্থ, পৃ. ২২-২৩)। এর উপর দাঁড়িয়ে আমাদের পূর্বানুমান যথার্থ বলে ধরে নেওয়া যায়।

৮. ডেভিড হার্ভে, দি নিউ ইমপেরিয়ালিজম, ২০০৫, পৃ.২৬।

ভাষাক্ষতের খতিয়ান: ভারতের বিপন্ন ভাষাদের একটি প্রাথমিক তালিকা

বিপ্লব নায়ক

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-পূর্ব ভারত, সিকিম, গাড়োয়াল, কুমায়ুন, জম্মু-কাশ্মীর, উটি...—এ সমস্ত জায়গার কোথাও না কোথাও ভ্রমণ করতে গেছেন অনেকেই। এ সমস্ত জায়গার ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা বহু সুখকর স্মৃতি হয়ে আছে হয়তো। স্মৃতিতে টান দিলেই হয়তো এইসব জায়গার প্রকৃতি, মানুষ, পরিবেশ নিয়ে কিছু না কিছু কথা ভেসে উঠবে। কিন্তু এইসব জায়গার 'ভাষা' নিয়ে কোনো অভিজ্ঞতার কথা তার মধ্যে থাকবে কি? ভ্রমণপর্বে সেখানকার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে যদি কোনো বাক্-বিনিময় আদৌ হয়, তবে আমরা ইংরেজি বা বাংলা বা হিন্দিতে নিজেদের কথা বলেই প্রায় দাবি করে বসি যে তা বুঝে ওই ভাষাতেই প্রত্যুত্তর দেওয়া সেই আদি বাসিন্দার কর্তব্য। এর বাইরে আর কোনো ভাষা-অভিজ্ঞতা আমাদের হয় কি? আমরা কি জানতে চেষ্টা করি সেখানকার আদি বাসিন্দাদের ভাষা কী? সেই ভাষার একটা-দুটো শব্দ, একটা-দুটো বাক্যও কি আমরা শেখার চেষ্টা করি? তাদের ভাষার একটা লোককথা/উপকথাও কি গ্রহিষ্ণু মন নিয়ে শুনতে চাই? বোঝার চেষ্টা করি কি তাদের ভাষা নিয়ে তাদের গর্ব-আনন্দ বা ক্ষোভ-অভিমান? অবশ্য কেবল ভ্রমণকারীরাই নয়, ওই সমস্ত আদি বাসিন্দাদের ভাষাকে সরকার প্রশাসনও গুরুত্ব দেয় না। অষ্টম তফশিলে তো গুটিকয় ভাষা—তার বাইরে কোনো ভাষা নিয়ে সরকার

প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই। তাই ভারতবর্ষের বিপুল ভাষাবৈচিত্র্যের বেশিটাই আমাদের অজ্ঞতার পর্দায় ঢাকা।

আরও মর্মান্তিক এই যে এই বিপুল ভাষাবৈচিত্র্য যে আজ বিপন্ন, একাধিক ভাষা যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আরও অসংখ্য যে বিলুপ্তির কিনারে দাঁড়িয়ে, সে বিষয়েও আমাদের না জানাটাই বেশি।

এই লেখায় ভারতের বিপন্ন ভাষাগুলোর একটি তালিকা হাজির করার মধ্য দিয়ে এই অপরিচয় ও অজ্ঞতার পর্দাটাকে কিছুটা ফিকে করার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হল।

একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা উচিত। এটি একটি প্রাথমিক তালিকা কারণ এই তালিকার বাইরেও আরও বহু বিপন্ন ভাষা থেকে যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ধরে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে। কিছু অঞ্চল ও কিছু ভাষাগোষ্ঠী হয়তো আমার অনবধানতাবশত বাদ থেকে গেল। তবে একটি বিশেষ অঞ্চলকে আমি ইচ্ছে করেই বাদ রেখেছি। সেই বিশেষ অঞ্চলটি হল পশ্চিমবঙ্গের 'ডুয়ার্স' অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিশেষ ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক কারণে বহু ভাষার সন্নিবেশ ও মিশ্রণ ঘটেছে। এমন বৈচিত্র্য অন্যত্র দুর্লভ। তাই এই অঞ্চলের ভাষা সমস্যা, ভাষার বিপন্নতা নিয়ে পৃথকভাবে চর্চা করার ইচ্ছা আমার আছে। তাই এইবারের চর্চা থেকে তাকে বাইরে রাখলাম।

তালিকায় হাজির করা তথ্য মূলত ১৯৮১ থেকে ১৯৯১ সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা-গবেষক ক্ষেত্রসমীক্ষক-এর গবেষণাপত্র বা সরকারি জনগণনার প্রতিবেদন থেকে গৃহীত। সেই সময়কাল থেকে এই ২০১৬ অবধি পর্যায়ে ভাষা-বিপন্নতার পরিস্থিতিতে তেমন কোনো সদর্থক পরিবর্তন ঘটেনি। ফলে এই তালিকায় বিপন্নতার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা হয়তো আজ আরও প্রকট। বিলুপ্তির কিনারে দাঁড়ানো অনেক ভাষা হয়তো ইতিমধ্যে বিলুপ্তই হয়ে গেছে।

ভাষা বিলুপ্ত হয় তার বাচক নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে একটি ভাষা যখন ক্রমশ সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত হতে থাকে অন্য কোনো আধিপত্যকারী ভাষার দ্বারা, তখন সেই ভাষা ক্রমশ তার বাচকগোষ্ঠীর নবীন প্রজন্মের মুখ থেকে সরে যেতে থাকে। তার বাচকসংখ্যা সঙ্কুচিত হতে থাকে। এইভাবে একটি ভাষা যখন তার

শেষতম বাচকটিকেও হারায়, তখন সে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যে ভাষার বাচকসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, যে ভাষার সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমসঙ্কুচিত হচ্ছে, সেই ভাষা তত বিলুপ্তির খাদে গড়িয়ে পড়ছে।

প্রাথমিক এই কটা কথা মাথায় রেখে এবার ভারতের বিপন্ন ভাষার তালিকায় প্রবেশ করা যাক।

ভারতের বিপন্ন ভাষার তালিকা

১। আন্দামানের ভাষা

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী নেগ্‌রিটো নৃগোষ্ঠীর মানুষদের সব ভাষাই হয় ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত আর নয়তো বিপন্ন। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ১২টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষাভাষী আদি জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ৩টি ছাড়া বাকি সব ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদেরই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল—ফলে তাদের ভাষাগুলোও বিলুপ্ত হয়েছিল। টিকে ছিল মাত্র তিনটি ভাষা—লিটল আন্দামানে কথিত ওঙ্গে ভাষা, উত্তর সেন্তিনেল দ্বীপে কথিত সেন্তিনেলিজ ভাষা ও দক্ষিণ আন্দামানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কথিত জারোয়া ভাষা। এই তিনটি ভাষাই এখন বিপন্ন। ১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ওঙ্গে ভাষার ৯৭ জন বাচক, জারোয়া ভাষার ৩১ জন বাচক এবং সেন্তিনেলিজ ভাষার আরও কম সংখ্যক বাচক অবশিষ্ট ছিল। আজ বোধহয় তা আরও কমে গেছে, নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান আর পাওয়া যায় না।

২। নিকোবরের ভাষা

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের আদিবাসীদের যে বিভিন্ন ভাষার কথা জানা যায়, তা হল:

	দ্বীপের নাম	সেই দ্বীপের আদিবাসীদের ভাষার নাম
১.	কার নিকোবর দ্বীপ	পু
২.	চোওরা দ্বীপ	তাতেত
৩.	টেরেজা দ্বীপ	তাইহলও
৪.	বোমপোকা দ্বীপ	পোওয়াহাট

	দ্বীপের নাম	সেই দ্বীপের আদিবাসীদের ভাষার নাম
৫.	নানকৌড়ি দ্বীপ ও কামোরটা দ্বীপ	নানকৌড়ি
৬.	ক্যাচ্অল দ্বীপ	তিহ্নু
৭.	গ্রেট নিকোবর দ্বীপের উপকূল	লোয়ঙ
৮.	লিট্ল নিকোবর দ্বীপ	ওঙ
৯.	কোন্ডুল	লামোওসে
১০.	মিলোহ্	লো
১১.	গ্রেট নিকোবর দ্বীপ (এর সোমপেন জাতি)	সোমপেন
১২.	ত্রিনকুট দ্বীপ	লেফুল

এই ভাষাগুলি সবকটাই বিপন্ন। এই ভাষাগুলি সম্পর্কে বা তাদের বাচকসংখ্যা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যও ভারত সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

১৯৮১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সোমপেন ভাষার মাত্র ২২৩ জন বাচক অবশিষ্ট ছিল। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এখন ২০ হাজারের ওপর মানুষ বাস করলেও এই ভাষাগুলির বাচকসংখ্যা সোমপেন ভাষার মতই অত্যন্ত কম এবং ক্রমহ্রাসমান।

৩। দক্ষিণ মুন্ডা ভাষা

দক্ষিণ মুন্ডা ভাষাগুলি অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতে তাদের উপস্থিতির ছবি এইরকম:

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১। জুয়াঙ	১৭,০০০	ওড়িশার কেওনঝড় ও ঢেনকানল জেলা।
২। খারিয়া	১,৯০,০০০	ছোটনাগপুর, বিশেষত রাঁচি জেলা; তাছাড়াও, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশ।
৩। সোরা বা সাওরা বা শবর	৩০,০০,০০০	দক্ষিণ ওড়িশার কোরাপুট ও গঞ্জাম জেলা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের সন্নিবর্তী অঞ্চল।

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
৪। পারেঙ বা গোরাম	১০,০০০	কোরাপুটের নন্দপুর ও পোতাঙ্গি তালুক।
৫। রেমো বা বোন্দা	২,৫০০	কোরাপুটের জয়পুর পাহাড়
৬। গুতোব বা সোদিয়া	৮০,০০০	কালাহান্ডি, কোরাপুট, বিশাখাপত্তনম ও বস্তার জেলা।
৭। দিদেয়ি বা দিদম্	৩০,০০০	অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরি জেলার সিলেরু নদীর দুই তীরে।

এদের মধ্যে কয়েকটি ভাষার বাচকসংখ্যা তুলনায় বেশি হলেও, প্রতিটি ভাষাই দ্রুতগতিতে বাচক হারাচ্ছে। প্রতিটি ভাষাগোষ্ঠীর বাচকদের ওপরই স্থানীয় সংখ্যাগুরুদের ইন্দো-আর্য ভাষায় সরণ ঘটানোর জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক চাপ প্রবল, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার চাপ তো আছেই। বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকলে এই শতকের শেষে সবগুলো ভাষাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৪। উত্তর মুন্ডা ভাষা

এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সাঁওতালি ভাষা এই শতকের শেষেও জীবিত থাকার সম্ভাবনা নিয়ে আছে। সাঁওতালি ভাষা অষ্টম তফশিলভুক্ত হয়েছে, এই ভাষায় লেখার জন্য অভিন্ন লিপি হিসেবে অলচিকি চালু করার প্রচেষ্টা এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একাংশ নিয়েছেন, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এই ভাষা প্রবর্তন করার চেষ্টা প্রাথমিক স্তরে আছে। এতদ্‌সত্ত্বেও তরুণ প্রজন্মের মুখ থেকে ক্রমশ এই ভাষা সরে যাচ্ছে। বেশ কয়েক লাখ বাচক এখনও থাকা সত্ত্বেও এই ভাষা তাই সংকটের মধ্যেই আছে। সাঁওতালি ভাষা ছাড়া অন্য সমস্ত উত্তর মুন্ডা ভাষা এই শতকের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। সেই ভাষাগুলি হল:

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১. কোরকু	২,০০,০০০	দক্ষিণ-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের সংলগ্ন অঞ্চল।

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
২.	বিভিন্ন মুন্ডারি আঞ্চলিক ভাষা যেমন—হাসাদা, নাগুরি, লাতার, কেরা	৭,৫০,০০০	রাঁচি, সিংভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ এবং ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশের উত্তর প্রান্ত।
৩.	হো বা কোল	৪,০০,০০০	সিংভূম
৪.	ভূমিজ	১,৫০,০০০	ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ছড়ানো-ছিটানো অঞ্চলে।
৫.	বিরহোর	২,০০০	সিংভূম, দক্ষিণ পালামৌ, দক্ষিণ হাজারিবাগ এবং রাঁচির উত্তর-পূর্ব অংশ।
৬.	কোড়া গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষাসমূহ	২৫,০০০	ছোটনাগপুরের ছড়ানো-ছিটানো অঞ্চলে।
৭.	তুরি	কয়েক হাজার	পশ্চিমবঙ্গ, পালামৌ, রাঁচি, সিংভূম, রায়গড় ও ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে।
৮.	অসুর গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষা	৭,০০০	নেতারহাট, উত্তর রাঁচি, গুমলা।
৯.	কোরওয়া, কোরোয়া আঞ্চলিক ভাষাসমূহ	৩৫,০০০	পালামৌ ও হাজারিবাগ জেলা; মধ্যপ্রদেশের রায়গড় জেলার যশপুরনগর তহসিল ও সরগুজা জেলা।

৫। দক্ষিণ দ্রাবিড় ভাষা

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১.	ইরুলা	৫,০০০	নীলগিরি পর্বত।
২.	কোটা	১,০০০	নীলগিরি পর্বতের কোটাগিরি অংশ।
৩.	তোড়া	১,০০০	উদাগামন্ডলম (বা উটি)-এর আশেপাশে।

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
৪.	বাদাগা	১,০০,০০০	নীলগিরি পর্বত।
৫.	কোদাগু	১,০০,০০০	কর্নাটকের কুর্গ বা কোদাগু জেলায় মাদকেরি-র আশেপাশে।
৬.	টুলু	১০,০০,০০০	ম্যাঙ্গালোর এবং কেরালার তট।
৭.	কুরুবা	১,০০০	কুর্গের পার্বত্য অঞ্চলের বেটা-কুরুবা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে।
৮.	কোরাগা ও বেল্লারি গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ	১,০০০ প্রতিটির প্রায়	কুন্ডাপুরা ও উদুপি।
৯.	কুরু	১,০০,০০০	অন্ধ্রপ্রদেশ ও তৎসংলগ্ন কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর যাযাবর গোষ্ঠীদের মধ্যে।

৬। মধ্য দ্রাবিড় ভাষা

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
তেলেগু-কুই গোষ্ঠী	১. গোন্ডি	২০,০০,০০০	মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের 'কেই' বা 'কেয়া' জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
	২. কোন্ডা বা কুবি	১৫,০০০	অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্, ও শ্রীকাকুলাম জেলা এবং তৎসংলগ্ন ওড়িশার কোরাপুট জেলার 'কোন্ডা ডোরা' জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
	৩. মান্ডা ও পেঙ্গো	১,৫০০	ওড়িশার কোরাপুট ও কালাহান্ডি জেলা।
	৪. কুই বা কুবি	৫০,০০,০০০	'কোন্ধ' জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যাদের বাস ওড়িশার গান্জাম, কালাহান্ডি, বৌধ-কোঁধমল ও কোরাপুট জেলায় এবং অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম জেলায়।

কোলামি-পারজি গোষ্ঠী

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
৫.	কোলামি	৭০,০০০	মহারাষ্ট্রের যবমল ও বরধা জেলা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের আদিলাবাদ জেলার পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে।
৬.	নাইকি	১,৫০০	মহারাষ্ট্রের কান্ত জেলার পার্বত্য অঞ্চলের "ইয়েরকু' জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে।
৭.	পারজি	৫০,০০০	মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এবং জগদ্দলপুরের কাছে।
৮.	গাদাবা গোষ্ঠীর আঞ্চলিক ভাষাসমূহ	৪০,০০০	ওড়িশার কোরাপুট জেলা।

৭। উত্তর দ্রাবিড় ভাষা

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১.	মলটো	১,০০,০০০	বিহারের রাজমহল পাহাড়।
২.	কুরুখ বা ওঁরাও	১৫,০০,০০০	ছোটনাগপুর, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ। এছাড়াও ওঁরাও জনজাতির মানুষ অসম, ডুয়ার্স ও নেপালের তরাইয়ের বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

৮। অরুণাচল প্রদেশের ভাষা

খো-ব্যা ভাষাসমূহ

পশ্চিম অরুণাচলপ্রদেশের চারটি ভাষা খো-ব্যা ভাষাদের মধ্যে পড়ে। এই চারটিই অবলুপ্তির আশু বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে। এইগুলি হল:

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১.	খোয়া বা বুগুন	৮০০	পশ্চিম কামেঙ জেলার বোমডিলার কাছে, মূলত ওয়াংছ ও সিংচুঙ গ্রামদুটিতে।

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
২.	সুলুঙ	৪,০০০	পূর্ব কামেঙ-এর উত্তর-পূর্ব পাহাড় ও নিম্ন সুবানসিরি জেলার উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে, যাযাবর 'সুলুঙ' জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
৩.	লিপা	১,০০০	কামেঙ জেলার 'মোনপা' জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
৪.	সেরদুক্‌পেন	২,০০০	কামেঙ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রূপা, সেরগাঁও ও জিগাঁও গ্রামে এবং বোমডিলার দক্ষিণে তেংগা উপত্যকায়।

হ্রুসিস ভাষাসমূহ

এই গোষ্ঠীর তিনটি ভাষার মধ্যে তিনটিই বিলুপ্তির আশু কিদের মুখে। সেগুলি হল:

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১.	হুসো বা আকা	৩,০০০	কামেঙ জেলার দক্ষিণ-পূর্বে, মূলত বিচম নদীর উপত্যকায় হুসো বা আকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কামেঙ জেলার উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-মধ্য অঞ্চলের প্রায় ২৫টি গ্রামে।
২.	ধিম্‌মাই বা মিজি	৪,০০০	কামেঙ জেলার উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-মধ্য অঞ্চলের প্রায় ২৫টি গ্রামে।
৩.	লেভাই বা বোংরো	১,০০০	কামেঙ ও সুবানসিরির কিছু অঞ্চলে।

তানি ভাষাসমূহ

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১.	মিলাঙ	৫,০০০	তানি অঞ্চলের পূর্বপ্রান্তে।
২.	বাঙনি (পশ্চিম ডালা)	২৩,০০০	ভারত-তিব্বত সীমান্তের সংলগ্ন অঞ্চল।

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
৩.	নিসি (পূর্ব ডাফ্‌লা)	৩০,০০০	—
৪.	নাহ্	২,০০০	উচ্চ-সুবানসিরি জেলার তাকসিং প্রশাসনিক বৃত্তের অন্তর্গত ৭টি গ্রামের মধ্যে।
৫.	সরক	৯,০০০	আপাতানি অঞ্চলের পুবদিকে।
৬.	তাগিন	২৫,০০০	সুবানসিরি জেলার উত্তর-পূর্বে এবং তদ্‌সংলগ্ন পশ্চিম সিয়াং-এর কিছু অঞ্চলে।
৭.	আপাতানি	১৪,০০০	সুবানসিরি জেলার আপাতানি মালভূমিতে পানিওর ও কমলা নদীদের মাঝের অঞ্চলে।
৮.	গালঙ	৪০,০০০	পশ্চিম সিয়াঙ জেলার দক্ষিণ অর্ধে।
৯.	বোকার	৩,৫০০	পশ্চিম সিয়াঙ জেলায় মাছুখা সাবডিভিশন-এর মোনিগঙ্গ সার্কেল-এর ৪০টি গ্রামে।
১০.	পাইলিবো	১,০০০	পশ্চিম সিয়াঙ জেলায় সিয়োম নদীর ধারে ৯টি গ্রামে।
১১.	রামো	৮০০	পশ্চিম সিয়াঙ জেলায় পাইলিবো অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে।
১২.	মিনয়োঙ	২০,০০০	মিয়াঙ নদীর নিম্ন অববাহিকার পশ্চিম পাড় বরাবর।
১৩.	বোরি	২,০০০	সিয়োম ও সিকে নদীর পার বরাবর লুয়োর পাহাড় ও পিরি পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।
১৪.	আসিঙ	১,০০০	তিব্বত সীমান্তের কাছে সিয়াঙ নদীর উৎস অঞ্চলে, রামসিং গ্রাম ও তুতিং গ্রামের মাঝে।
১৫.	সিমঙ	২,০০০	সিয়াঙ নদীর উত্তর অংশের বাঁ তীরে।

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১৬. তাংগাম	২০০	সিয়াঙ জেলার উত্তর-প্রান্তে কুজিং গ্রাম, জ্ঞেরিং গ্রাম ও মায়ুম গ্রামে এবং সিয়াঙ নদী ও নিগ নদীর উচ্চ অববাহিকায়।
১৭. কারকো	২,০০০	কারকো গ্রাম ও তৎসংলগ্ন আরও কিছু গ্রামে।
১৮. পাঙ্‌গি	৬০০	ইয়াম্‌নে নদীর নিম্ন অববাহিকায় ইয়ানে এবং সিয়াঙ নদীর সঙ্গমস্থলের উপরে গেকু, সুমসিঙ, সিবুম, জেরু ও পঙগিঙ গ্রামে।
১৯. পদম বা বোর আবোর	৪০,০০০	পূর্বসিয়াঙ-এদিবাঙ,সিয়াঙওযামনে উপত্যকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে।
২০. মিসিঙ	৪,০০০	অরুণাচল প্রদেশের পাহাড় সংলগ্ন উপত্যকা অঞ্চলের সাংস্কৃতায়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে।

মিজুই ভাষাসমূহ (বা উত্তর মিমি ভাষাসমূহ)

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১. কামান (বা মিজু মিমি)	৯,০০০	লোহিত জেলায় লোহিত নদীর উচ্চ অববাহিকায় নদীর দুই তীরে পরশুরাম কুণ্ডের চারপাশে।
২. জাইওয়া মিমি	২০০	ওয়ালঙ-এর কাছে 'জাখরিঙ ও' জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে।

দিগরি ভাষাসমূহ

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১. ইদু	৯,০০০	'চুলকাটা মিসমি' জনগোষ্ঠীর মধ্যে।
২. তারাওঁ	৬,০০০	পুবদিকে দেলেই ওলতি নদী, দক্ষিণে খারেম এবং পশ্চিমে দিগারু-র মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারত সরকার অরুণাচল প্রদেশ জুড়ে হিন্দিভাষা ছড়ানোর জন্য উঠে পড়ে লাগার পর থেকে অরুণাচল প্রদেশের প্রায় সব ভাষাগোষ্ঠীরই মাতৃভাষা হিন্দি-আগ্রাসনে বিপন্ন।

৯। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলের ভাষা

১। দেওরি চুটিয়া: চুটিয়া নৃগোষ্ঠীর বড় সংখ্যক মানুষ অতীতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ছিলেন বলে জানা যায়। তাদের মধ্যে একমাত্র যারা নিজেদের মাতৃভাষা এখনও অবধি ধরে রেখেছে তারা হল দেওরি গোত্রের মানুষজন। এই দেওরি গোত্রের মানুষ অহম রাজাদের আমলে পুরোহিতের কাজ করত, রাজসভার বিভিন্ন যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করত। ১৯৭১-এর জনগণনায় অরুণাচল প্রদেশে ২,৬৮৩ জন দেওরি নৃগোষ্ঠীর এবং অসমে ৯,১০৩ জন চুটিয়া চিহ্নিত করা হয়েছিল। বিশ শতকে এসে উপর অসম-এর লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় মাত্র কয়েকটি পরিবারই অবশিষ্ট আছে যারা দেওরি চুটিয়া ভাষায় এখনও কথা বলে।

২। দিমাসা: দিমাসা আজ বিলুপ্তির খাদের কিনার থেকে প্রায় খাদে টলে পড়েছে। উত্তর কাছাড় পাহাড় ও তৎসংলগ্ন সমভূমিতে দিমাসা-ভাষী জনগোষ্ঠীর বাস ছিল, আজ তাদের প্রায় সবার বাংলা ভাষা বা অহমিয়া ভাষাতে ভাষা-সরণ ঘটে গেছে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপে। আজ কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু পরিবারের ঘরেই এই ভাষা শোনা যেতে পারে, কিন্তু তাও বহু কষ্টে খুঁজে বের করতে হবে।

৩। কাছাড়ি: দারাঙ জেলায়, চুটিয়াদের অঞ্চল থেকে ভাটির পানে আর বোড়োদের অঞ্চল থেকে উজান পানে যে অঞ্চল, সেখানে কাছাড়ি ভাষা বলা হতো। সেখান থেকে কাছাড়ি ভাষা প্রায় হারিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে কাছাড়িভাষী জনগোষ্ঠীর নতুন প্রজন্ম অহমিয়া ভাষা বা হিন্দি/ইংরেজি ভাষার বাচকতায় সরে গেছে। অবশিষ্ট অংশেরও খুব দ্রুত এই সরণ ঘটে যাচ্ছে। ভাটির দিকে গোয়ালপাড়ার মতো অঞ্চলে কাছাড়ি ভাষার যে আঞ্চলিক রূপ তাকে এখন 'বোড়ো'-ই বলা হয়।

৪। মেচে: মেচে এই অঞ্চলের একটি বোড়ো-কোচ ভাষা, যার উল্লেখ ব্রিটিশযুগের নথিপত্রে পাওয়া যায়। আজ এই ভাষা প্রায় বিলুপ্ত। হাতে গোনা কয়েকজন বাচক পড়ে আছে।

৫। বোড়ো: বোড়ো ভাষার বাচক এখনও বড় সংখ্যায় আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও অহমিয়া বা বাংলা বাচকতায় সরণ বড় মাত্রায় ঘটছে।

৬। কোরক: ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল কোরক। ১৯৪৭ সালে কোরকভাষী আদিবাসীরা ছিল ত্রিপুরার জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ এবং বাংলাভাষী অভিবাসীরা ৩০ শতাংশ। আজ এই একুশ শতকের গোড়ায় বাংলাভাষী অভিবাসী ৪৫ শতাংশ। কোরকরা তাদের পার্বত্য অঞ্চলেও আজ মাত্র ৩০ শতাংশ। জনবসতির এই পরিবর্তন এবং তদনুসারী সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ কোরক ভাষীদের ভাষা-সরণ ঘটাচ্ছে বিপুলভাবে। প্রায় ৮,০০,০০০ কোরক নৃগোষ্ঠীর মানুষ থাকলেও তাদের সিংহভাগ কোরক ভাষায় বাচকতা ত্যাগ করেছে এবং এখনও করে চলেছে।

৭। তিওয়া বা লালুঙ: কামরূপ এবং কার্বি আঙলঙ-এর মারিগাঁও জেলায় ৩৫,০০০-এর মতো এই ভাষার বাচক আছে। অহমিয়া, হিন্দি, ইংরেজি-তে সরণ তিওয়া ভাষার বাচকদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ক্রমবর্ধমান।

৮। গাড়ো: মেঘালয়ের পশ্চিম অর্ধে গাড়ো পর্বতের প্রায় ২,৫০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২,০০,০০০ গাড়ো ভাষার বাচক। অসমের কামরূপ ও গোয়ালপাড়া এবং বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলায় আরও প্রায় ৫০,০০০ গাড়ো ভাষার বাচক আছে। এই ভাষা বিলুপ্তির আশু বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলেও ভাষা-ব্যবহারের সামাজিক ক্ষেত্রের সংকোচনের সমস্যা ক্রমশ সংকটজনক হয়ে উঠছে।

এছাড়াও এই এলাকার আরও কিছু বিপন্ন ভাষা হলো:

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
৯. কোচ	৩০০	গাড়ো পর্বতের পশ্চিম প্রান্তে ডালু ও গাড়োবাধা-র কাছে এই ভাষার বাচকদের উপস্থিতি। তারা 'ওয়ানাঙ' বা 'পানি কোচ' নামে পরিচিত।
১০. আটঙ	কয়েক হাজার	গাড়ো পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে সোমাশ্বরী ও বাঘমারা-কে ঘিরে।

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১১. রুঘা	অজানা	গাড়ো পর্বতের দক্ষিণে।
১২. রাভা	কয়েক হাজার	মেঘালয়ের পর্বতাঞ্চলের পাশ কাটিয়ে ব্রহ্মপুত্র যেখানে দক্ষিণে বাঁক নিচ্ছে সেই অঞ্চলে রাভাদের বাস। প্রায় ১,৫০,০০০ রাভা নৃগোষ্ঠীর মানুষ অসমে থাকলেও এখন মাত্র কয়েক হাজারই রাভা ভাষায় কথা বলে। বাকিদের অহমিয়া বা বাংলা ভাষায় সরণ ঘটে গেছে। গোয়ালপাড়া, মাটিয়া, মাঝেরবুড়ি, মাকুড়ি গ্রামগুলোতেই রাভা ভাষার বাচক এখনও পাওয়া যাবে, যদিও তাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যেও অহমিয়ায় সরণ ঘটে চলেছে।
১৩. কার্বি বা মিকির	১,৫০,০০০	মিকির নৃগোষ্ঠী মূলত কার্বি-আঙলঙের মিকির পাহাড়ের বাসিন্দা। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মদের কার্বি বা মিকির ভাষা ছেড়ে অহমিয়া ভাষায় সরণ দ্রুত ঘটে যাচ্ছে।

১০। উত্তর নাগা বা কোনিয়াক ভাষাসমূহ

নাগা জনজাতিদের এই ভাষাসমূহ ইংরেজি বা হিন্দি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র হারিয়ে বিলুপ্তির প্রান্তে দাঁড়িয়ে:

ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১. ওয়ানচোস	৩০,০০০	পাটকোই পর্বতশ্রেণি ও তার পাদদেশের মধ্যে ১১টি 'জান' বা সংঘে সংগঠিত প্রায় ৪১টি গ্রামে ওয়ানচোস-দের বাস।

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
২.	কোনিয়াক	৭০,০০০	ওয়ানচোসদের অঞ্চলের দক্ষিণে।
৩.	ফোম	১৯,০০০	কোনিয়াকদের অঞ্চলের দক্ষিণে।
৪.	চ্যাঙ	১৬,০০০	কোনিয়াকদের অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বে, বর্মা সীমান্ত অবধি।
৫.	মিয়ামঙ্গান	অজানা	অজানা
৬.	তাঙসা	২০,০০০	তিরাপ জেলার চাঙলাঙ ও মিয়াও উপভাগে।
৭.	নোক্‌টে	২৮,০০০	তিরাপ জেলার কেন্দ্রে, ওয়ানচোসদের অঞ্চল থেকে উত্তর-পূর্বে।
৮.	লোথা	৩৫,০০০	নাগাল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলে।
৯.	চুংলি আও, মঙসেন আও, সাটাম, য়িমচুঙরু, ইয়াছাম ও তেঙসা	সবগুলি মিলে প্রায় ৬২,২৭৫	নাগাল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলে।
১০.	আগামি	৩০,০০০	নাগাল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলে।
১১.	সেমা	৬৫,০০০	নাগাল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলে।
১২.	রেঙমা	৯,০০০	নাগাল্যান্ডের মধ্যাঞ্চলে।
১৩.	চেক্‌রি, খেজা, মাও, পোচুরি এঞটেনয়ি, মালুরি	প্রতিটির কয়েক হাজার করে বাচক	
১৪.	জেমে, লিয়াঙমাই, নূরুয়াঙ্গমেই, ঝিয়েমে, পুইরোন, খৈরাও, মারাম	জানা নেই	নাগল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ও মণিপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণের বহু গ্রাম।
১৫.	তাঙখুল ও মারিঙ	প্রায় নেই	মণিপুরের উত্তর-পূর্ব এক-চতুর্থাংশ জুড়ে তাঙখুল ও মারিঙ নৃগোষ্ঠীর মানুষদের বাস। মণিপুরের প্রধান ভাষা মেইতেই এই ভাষাদুটিকে প্রতিস্থাপিত করেছে। বাচক প্রায় অমিল। ভাষাদুটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

১১। আরও কিছু তিব্বতি-বর্মি ভাষা

১। থাদোউ, কোম, চিরু, গাঙতে, লামগাঙ, অনল ও পাইতে—মণিপুরে এই সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। আঞ্চলিকভাবে প্রাধান্য বিস্তারকারী মেইতেই ভাষায় এই ভাষাগোষ্ঠীর নবতর প্রজন্মের সরণ ঘটে যাচ্ছে।

২। হ্রাওকোল, চোরেই, বম, কোম ও মার—ত্রিপুরা, দক্ষিণ অসম ও মিজোরামের দক্ষিণ প্রান্তের এইসব ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের নবতর প্রজন্মের সরণ ঘটছে বাংলা বা অহমিয়া ভাষায়। এই ভাষাগুলিও বিলুপ্তির কিনারে।

৩। 'সাক' গোষ্ঠীর ভাষাদের মধ্যে সাক, কাদু, আন্দ্রো ও সেঙমাই হয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে আর নয়তো বিলুপ্তির আগমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। আগে এইসব ভাষায় যারা কথা বলতেন তাদের উত্তরপুরুষরা এখন মণিপুরে মেইতেই ভাষার বাচকে পরিণত হয়েছে।

১২। দাইক ভাষা

১২২৮ সালে দাইক নৃগোষ্ঠীর একটি দল ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-উপত্যকায় অনুপ্রবেশ করে। তারা বয়ে এনেছিল প্রাচীন দাইক ভাষা। রাজপুত্র সুকোফার নেতৃত্বে দাইক গোষ্ঠীর একটি অভিজাত অংশ এই অঞ্চলে সামাজিক-রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করে। আঞ্চলিক বোড়ো-কোচ জনগোষ্ঠীর উপর তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি আরোপ করতে সফল হয়েছিল। কিন্তু আজ তাদের সেই প্রাচীন ভাষা কেবলমাত্র সেই সময়কার দিনপঞ্জি 'বুরঞ্জি'-র মধ্যেই টিকে আছে। এর পরেও অনেক দাইক গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটে এই অঞ্চলে। যেমন, আঠারো শতকে খাপতি ও তাই ফাকে বা ফাকিয়ালরা উত্তর-পূর্ব ভারতে আসে। আজ অসমের লখিমপুর জেলার পূর্ব কোণ এবং তদসংলগ্ন অরুণাচল প্রদেশের লোহিত জেলায় খাম্পতি নৃগোষ্ঠীর মানুষ আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের ভাষার বাচকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। তাইফাকে ভাষার বাচক এখন আর ২,০০০-এর মতো আছ যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তিনসুকিয়া ও ডিব্রুগড় জেলার ছয়টি গ্রাম—নামফাকিয়াল, তিপম ফাকিয়াল, বার ফাকিয়াল, নাম্মান, নামচাই ও লাঙ—এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই রকমই খামইয়াঙ ও আইতন বা শাম দোয়ানিয়া-র মতো আরও কিছু দাইক ভাষার আঞ্চলিক রূপ এখনও কিছু বাচকের মধ্যে বেঁচে থাকলেও বাচকদের ক্রমাগত অহমিয়া ভাষায় সরণের মধ্য দিয়ে তারাও বিলুপ্তির পথে।

১৩। সিকিমের ভাষা

১। দ্রানজোক: রাজতন্ত্রের অধীনে সিকিমের জাতীয় ভাষা ছিল দ্রানজোক। ১৯৭৫ সালে ভারতের দ্বারা সিকিম অধিগ্রহণের পর সিকিমে নেপালিভাষী মানুষদের অভিবাসনের ঢল নামে। আজ সিকিমের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশই এই নেপালিভাষী অভিবাসী। সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি একে একে নেপালি ভাষার দখলে চলে যাওয়ার পর দ্রানজোক ভাষা আজ মুমূর্ষু।

২। লেপচা: লেপচা ভাষাও সিকিমের আদিবাসীদের একাংশের ভাষা। লেপচা ভাষার নিজস্ব লিপি আছে এবং ১৮ শতক থেকে লেপচা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির ঐতিহ্যের খোঁজ পাওয়া যায়। রাজতন্ত্রের যুগে সিকিমের মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার সিংহভাগ বহুদিন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই দুই অঞ্চল ছাড়া কালিম্পংয়ে লেপচাভাষা অন্যতম প্রধান ভাষা ছিল। দ্রানজোক ভাষার মতো লেপচা ভাষাও নেপালি ভাষার ক্রমপ্রসারমানতার কাছে হার মেনেছে। এই গোটা অঞ্চলে আর খুব অল্প কিছু পরিবারই অবশিষ্ট আছে যেখানে তরুণ প্রজন্ম সক্রিয়ভাবে এই ভাষা চর্চা করে ও বলে। এই গুটিকয় পরিবারও ছড়ানো ছেটানো। লেপচা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি হবে না।

১৪। পশ্চিম হিমালয়ের ভাষা

পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর এবং পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বে নেপাল—এর মধ্যবর্তী হিমালয় অঞ্চলে বহু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অবশিষ্টগুলি বিপন্ন, যেমন:

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
১.	রাঙকাস	শূন্য	বিশ শতকের গোড়ায় বেঁচে ছিল, এখন মৃত।
২.	ঝাঙঝুঙ	শূন্য	রাঙকাসেরওআগেএরমৃত্যুঘটেছে।
৩.	মনচাদ	১৫,০০০	চন্দ্র নদী তীরে ও চেনাব নদীর উচ্চ অববাহিকায়। এই ভাষার আর এক নাম 'পাটানি' বা 'পাট্টানি'। কারণ পাটান উপত্যকার টান্ডি থেকে থিরোট পর্যন্ত এই ভাষার উপস্থিতি পাওয়া যায়।

	ভাষা	বাচকসংখ্যা	কোন অঞ্চলে উপস্থিত
৪.	তিনান	১,৮৩৩	চেনাব নদীর অববাহিকায় মনচাদ অঞ্চলের থেকে ভাটির দিকে, বিশেষত 'গোন্‌ধলা' বলে পরিচিত অঞ্চলে এর উপস্থিতি।
৫.	বুনান	৩,৫৮১	ভাগা নদীর দুপারে গহর উপত্যকায়।
৬.	কানাসি	কয়েকশো	হিমাচল প্রদেশে কুলু-র কাছে মালেনা বলে একটিমাত্র গ্রামেই এই ভাষার বাচক অবশিষ্ট আছে।
৭.	কিন্নরী	৫৯,১৫৪	হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায়।
৮.	রঙপো	১২,০০০	গাড়োয়ালের চামোলি জেলার জোশিমঠ উপভাগের নিতি ও মানা উপত্যকায়, বদ্রীনাথের উত্তরে অলকানন্দা নদীর উচ্চ অববাহিকায়, ধৌলি -গঙ্গা নদীর সঙ্গে অলকানন্দার সংগমস্থলের উপর দিকে।
৯.	দরমা	১,৭৬১	কুমায়ুনের আলমোড়া ও পিথোরাগড় জেলায়, ধোলি নদীর অববাহিকায় দরমা উপত্যকায়।
১০.	বিয়াঙসি	১,৩১৪	দরমা উপত্যকার পূর্বে মহাকালী নদীর অববাহিকায়।
১১.	পশ্চিম পাহাড়ি ভাষাদল, যার মধ্যে আছে বাফগনি, জৌনসারি, সিরমুদি, বাঘাতি, মহাসুই, হাড়ুরি, কুলুই ইত্যাদি ভাষা	কয়েক হাজার	জম্মু-কাশ্মীর থেকে হিমাচল প্রদেশ হয়ে দেহরাদুন অবধি অঞ্চলে।
১২.	মধ্য পাহাড়ি ভাষাদল, যার মধ্যে আছে গাড়োয়ালি ও কুমায়নী বিভিন্ন ভাষা	কয়েক হাজার	গাড়োয়াল ও কুমায়ুন

এই সমস্ত ভাষাগুলিই হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার আগ্রাসনে একের পর এক সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। প্রতিটিরই বাচকসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, ক্রমশ তরুণ মুখ থেকে তা হারিয়ে যাচ্ছে।

১৫। দারুবাণী

দারুবাণী (বা থারুবাণী) কোনো একটি ভাষার নাম নয়, তা অনেকগুলি ভাষার একটি যৌথনাম। এই ভাষাগুলি হলো মৈথিলী, ভোজপুরি ও আওয়াধি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ যা দারু (বা থারু) নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ভাষা ছিল। এই ভাষাগুলির মূল রূপগুলি ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর পূর্ববর্তী পর্যায়ের, সেগুলি এখন মূলত বিলুপ্ত। দারু (বা থারু) নৃগোষ্ঠীর মানুষ যেহেতু ক্রমবর্ধমান হারে হিন্দি আধিপত্যে নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলছে, তাই সামগ্রিকভাবে এই ঐতিহ্য ক্রমবিলীয়মান।

আপাতত তালিকা এখানেই শেষ। কয়েকটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ দিয়ে এবারের চর্চা শেষ করব।

কয়েকটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ

১। তাংগাম ভাষার (তালিকার ৮নং উপভাগে তানি ভাষাসমূহের মধ্যে দ্রষ্টব্য) বাচক ২০০-য় নেমে যাওয়ার কারণ ওই অঞ্চলের আদিবাসী জাতিদের মধ্যে যুদ্ধে তাংগাম ভাষার বাচক গোষ্ঠীর পরাজয় ও গণহারে নিধন।

এই রকম কিছু বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে অন্যান্য ভাষাগুলি সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র ও বাচক হারাচ্ছে আধিপত্যকারী অন্য কোনো ভাষার কাছে। এই আধিপত্যকারী ভাষাগুলি হলো ইংরেজি, হিন্দি অথবা আঞ্চলিক কোনো প্রধান ভাষা।

২। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভাষা বাস্তুতন্ত্রে ক্ষমতার চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। সবার উপরের স্তরে ইংরেজি ভাষা। তার নীচে দ্বিতীয় স্তরে হিন্দি ভাষা। তার নীচে তৃতীয় স্তরে সেই সমস্ত ভাষা যা কোনো রাজ্য-ভাষা হিসেবে বা আঞ্চলিকভাবে প্রভাবশালী কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে আঞ্চলিক আধিপত্যের দাবিদার। আর সবার নীচে চতুর্থ স্তরে বিভিন্ন আদিবাসী,

উপজাতি, ক্ষমতাহীন জনগোষ্ঠীদের ভাষা যারা উপরের বিপন্ন ভাষার তালিকায় উঠে এসেছে।

সর্বোচ্চ স্তরে যে ইংরেজি ভাষা তা আন্তর্জাতিকভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার আধিপত্যবিস্তারের শরিক হয়ে অন্য সমস্ত ভাষার কাছ থেকে সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র দখল করে নিতে চূড়ান্তভাবে আগ্রাসী। তার উপর, ভারত যেহেতু দীর্ঘদিন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনস্থ ছিল এবং সেই অধীনতার ঔপনিবেশিক ঘোর (colonial hangover) আজও সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতি প্রকট, তাই ইংরেজি ভাষার আগ্রাসন আরও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে অন্য সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় স্তরে হিন্দি ভাষা। ব্রিটিশ পরবর্তী ভারতের শাসকরা একটি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলার সহযোগী মতবাদ হিসেবে যেভাবে হিন্দি-হিন্দু জাতীয়তা গড়ে তুলতে চাইছে তা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর থেকে সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্র কেড়ে নিয়ে (বিশেষ করে প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, সরকারি চাকরির মতো ক্ষেত্রে) হিন্দিকে ক্ষমতাশালী করে তুলতে চাইছে। অবশ্য এখানে ইংরেজির আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করেই সে এই প্রক্রিয়া চালাচ্ছে।

তৃতীয় স্তরে ১০০টিরও কম ভাষা যারা আঞ্চলিক স্তরে নিজেদের আধিপত্যের ক্ষেত্র তৈরি করতে চাইছে ইংরেজি ও হিন্দির আগ্রাসনের মুখে দাঁড়িয়েও। এর জন্য একদিকে তারা যেমন বেশ কিছুটা হিন্দির ও কিছুটা ইংরেজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তার সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রের ক্ষয় রুখবার জন্য, অন্যদিকে তেমনই তার চেয়ে ক্ষমতাহীন অগুন্তি ভাষার ওপর আগ্রাসনের মাধ্যমে নিজেকে বিস্তৃত করতেও উদগ্রীব। বাংলা, ওড়িয়া, অহমিয়া, কন্নড়, তামিল, মালয়ালাম, নেপালি, ইত্যাদি, এমনকি মেইতেই-ও তাই চতুর্থ স্তরের অসংখ্য ভাষার ক্ষেত্রে ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

চতুর্থ স্তরের ভাষা অগুন্তি। এই ভাষাগুলিই উপরের তিন স্তরের আগ্রাসনে বিলুপ্তির মুখে দাঁড়িয়ে।

৩। কোনো ভাষা যখন তার ব্যবহারের সামাজিক ক্ষেত্র (সমাজ-প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি) হারাতে থাকে অন্য কোনো

আধিপত্যকারী ভাষার কাছে, তখন সেই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের সামাজিক অধিকার (বিশেষ করে সমাজ-সংগঠন পরিচালনা ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ, শিক্ষার বিষয় ও উপায় নির্ধারণে অংশগ্রহণ, নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চা)-গুলিও হরণ হয়ে যায়। আত্মবিশ্বাসহীন, পরমুখাপেক্ষী, শক্তিহীন এক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয় তারা। ফলে ভাষাবৈচিত্র্যের ক্ষয়, অগুন্তি ভাষার বিপন্নতা যত চলতে থাকে, সমাজও তত অগণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার একাধিপত্য তত সর্বাত্মক হয়ে ওঠে।

৪। এক একটি ভাষা তার মধ্যে ধারণ করে রাখে একটি মানবগোষ্ঠীর দ্বারা এক নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, বৈশিষ্ট্যমূলক সমাজচেতনা ও বস্তুচেতনা। ফলে এক একটি ভাষার বিলোপের মধ্য দিয়ে, ভাষাবৈচিত্র্যহানির মধ্য দিয়ে মানবসমাজের সামগ্রিক জ্ঞানের ভাণ্ডারও দীনতর হয়। আজ দুনিয়াজোড়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের আধিপত্য যখন সমরূপতার কারাগারে পুরে সংস্কৃতিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলেছে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে চরম প্রাকৃতিক সংকটের মাধ্যমে মানবসমাজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে, তখন আদিবাসী মানুষদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও সমাজচেতনা থেকে অনেক কিছু হয়তো নতুন করে আত্মস্থ করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্যে মানবসমাজকে স্থিত করার জন্য। ভারতজুড়ে আদিবাসী ও উপজাতিরা, যাদের দীর্ঘ ঐতিহ্যগত অভিজ্ঞতা আছে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সুষম জীবনযাপনের, তাদের ভাষাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তাই অপূরণীয় ক্ষতি করে ভবিষ্যতকেও ধ্বংস করে যাচ্ছে।

৫। ভাষার বিপন্নতা ও ভাষা বিলুপ্তির বিপরীত পথে, অর্থাৎ সমস্ত ভাষার নিজস্ব বিকাশ ও সমৃদ্ধির বাধাহীন বিস্তারের উপর দাঁড়িয়ে একে অন্যের মধ্যে যাওয়া-আসা, আদান-প্রদান-এর পথে ঘোরা যাবে কি? সেই পথে ঘুরতে গেলে এক ভাষার উপর অন্য ভাষার সমস্ত রকম আগ্রাসন অসম্ভব করে তুলতে হবে, ভারতে ইংরেজি ও হিন্দির আগ্রাসন তো বন্ধ করতে হবেই, আঞ্চলিক প্রভাবশালী ভাষাগুলির আগ্রাসনও বন্ধ করতে হবে। কীভাবে সম্ভব তা? সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের যে বিন্যাস সমাজে ক্ষমতা ও আধিপত্যের স্থাপত্য তৈরি করছে, তাই-ই ভাষাদের মধ্যেও

আধিপত্য ও আগ্রাসনের সম্পর্কের জন্ম দিচ্ছে না কি? ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টাকে তাই বৃহৎ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রূপ দিতে হবে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৬

তথ্যসূত্র:

১. জর্জ ভ্যান প্রিয়েম-এর 'এনডেনজারড ল্যাংগুয়েজেস অফ সাউথ এশিয়া' প্রবন্ধ যা মাথিয়াস ব্রেনজিংগার সম্পাদিত 'ল্যাংগুয়েজ ডাইভারসিটি এনডেনজারড' (২০০৭) গ্রন্থে সংকলিত।
২. সেনসাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৮১, যা ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অফিস অফ রেজিস্ট্রার জেনারেল দ্বারা ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত।
৩। বলবন্ত সিং রচিত সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৮১ সিরিজ ২৪: আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।
৪. জর্জ ভ্যান প্রিয়েম-এর 'ল্যাংগুয়েজেস অফ দি হিমালয়াজ: অ্যান এথনোগ্রাফিক হ্যান্ডবুক অফ দি গ্রেটার হিমালয়ান রিজিয়ন' (২০০১) গ্রন্থ।

আদিবাসীদের ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের উপায় কী?

অনওয়া ম্যাকাইভর

ভূমিকা

স্মরণাতীত কাল থেকে কুমদ্বীপে (মহাদেশটি এখন উত্তর আমেরিকা নামে পরিচিত) আদিম জনগোষ্ঠীদের ভাষাগুলি বিকশিত হয়ে এসেছে। পাঁচশ বছরেরও আগে দূরদেশ থেকে বিদেশিরা এখানে তাদের ভাষা নিয়ে আসে। গণহত্যা, উপনিবেশবাদ, ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ, নতুন রোগব্যাধি, জবরদস্তি উচ্ছেদ এবং জনজাতিদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনের মতো বিপর্যয়কর ঘটনা এরা ঘটায়। এর অনুষঙ্গে আসে সবচেয়ে কুপ্রভাবী উপাদানটি—আদিবাসীদের সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় শুধুই ইংরেজি আবাসিক স্কুল। ফলে জনজাতিদের ভাষাগুলির প্রয়োগ হয়ে আসে ক্ষীণ, অস্তিত্ব হয় লুপ্ত বা বিপন্ন। (ম্যাককার্টি, ২০০৩, স্পলস্কি, ২০০২)

হিসেব করে দেখা গেছে বিদেশিদের সঙ্গে প্রথম সংযোগের সময় কানাডায় ১১টি ভাষাবংশের ৪৫০টি আদিবাসী ভাষা ও উপভাষা ছিল। (অফিস অফ দি কমিশনার অফ অফিসিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজেস, ১৯৯২)

গত ১০০ বছরেই কানাডার অন্তত ১০টি আদিবাসী ভাষা লুপ্ত হয়েছে (নরিস, ১৯৯৮)। বর্তমানে ১১টি ভাষাবংশের আনুমানিক ৬০টি আদিবাসী ভাষার বাচক বজায় আছে (স্ট্যাটিসটিক্স কানাডা, ২০০৮)। এদের মধ্যেও মাত্র

৩টি ভাষা (ক্রি, ইনুকটিটুট ও অনিশনাবে) বাচক সংখ্যার নিরিখে নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে ও উজ্জীবিত হতে পারে (নরিস, ১৯৯৮)। কিন্তু নতুন গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ভাষার স্বাস্থ্যবিচারে শুধু বাচক সংখ্যা দিয়ে সামান্যই বোঝা যায়, বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তরুণতর প্রজন্মে ভাষার সঞ্চরণ, বিশেষত কত শিশু ভাষাটা শিখছে সেই অঙ্কটা (বারেনা ও অন্যান্য, ২০০৭, নরিস, ২০০৩)।

গত ৪০-৫০ বছরের ওপর আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা তাদের ভাষা পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। লিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার ও পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ নিচ্ছে। একদিকে যেমন অনেক জনগোষ্ঠী পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করছে, অন্যদিকে মাতৃভাষার আদিবাচকরা বছরে বছরে দ্রুত মারা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান নিবন্ধটি আদিবাসী ভাষাগুলির পুনরুজ্জীবন পদ্ধতি নিয়ে যত চর্চা হয়েছে তার সারসংকলন। এই সঙ্গে আলোচনার প্রশ্নাবলী ও আদিবাসী ভাষাগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার ভবিষ্যৎ দিক্‌নির্দেশও এখানে করা হয়েছে।

গবেষণার প্রশ্নাবলী

- আদিবাসী ভাষাগুলির টিকে থাকা সুনিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- নিজেদের ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী কী করছে?
- কোন কোন পদ্ধতিতে সুফল পাওয়া যাচ্ছে?
- আদিবাসীদের নিজ নিজ ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের পথে প্রতিবন্ধকতা কী?

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল

আদিবাসী ভাষাগুলির টিকে থাকা সুনিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ডেভিড ক্রিস্টাল (২০০০), রবার্ট ডিক্‌সন (১৯৯৭) এবং মাইকেল ক্রাউসের (১৯৯২) মতো বিশ্বের অগ্রণী ভাষাবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আগামী ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় ৬০০০ জীবিত ভাষার মধ্যে ৯০ শতাংশ

বিলুপ্ত হবে। তাঁদের হিসেবে বিশ্বের ৯৬ শতাংশ ভাষায় বর্তমানে কথা বলে মাত্র ৪ শতাংশ মানুষ। এর মানে পৃথিবীর ভাষাবৈচিত্র্যের বিপুল বৃহদংশ রক্ষার ভার খুব কম সংখ্যক মানুষের হাতে রয়েছে [(ইউনেসকো অ্যাডহক বিশেষজ্ঞ কমিটি (বিপন্ন ভাষাসমূহ, ২০০৩)]।

একটি ভাষার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানব অভিজ্ঞতার অনন্য একটি প্রকাশরূপের মৃত্যু ঘটে (ব্লেয়ার ও অন্যান্য, ২০০২; প্রাগুক্ত, ২০০৩)। একই সঙ্গে বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাক-ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব (ফাউন্ডেশন ফর এনজেন্ডারড ল্যাঙ্গোয়েজের, 2008), সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, মহাকাশভাবনা, বাস্তুতত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মচর্চার নির্দিষ্ট ভাষাবিধৃত অনন্য জ্ঞান হারিয়ে যায়। তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

নিজেদের ভাষার পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী কী করছে?

কানাডা ও অন্যান্য দেশে নানা উদ্যোগী গোষ্ঠী আদিবাসী ভাষা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন করার জন্য সৃজনশীলতা, অভিনবত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় রাখছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ কাজ করতে গিয়ে যেসব পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যে-সব গবেষণা হয়েছে সেগুলির সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার একটি সারসংকলন এই নিবন্ধে করা হয়েছে। মূলত উত্তর আমেরিকার কাজকর্ম নিয়েই আলোচনা। তবে বিদেশের দৃষ্টান্তমূলক মডেলগুলোরও কয়েকটি আলোচিত হয়েছে।

তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যসংরক্ষণ

কোনো বিপন্ন ভাষার তথ্যসংগ্রহকে অনেকসময় নিষ্ক্রিয় ক্রিয়াকলাপ বলে গণ্য করা হয় কারণ এর ফলে নতুন বাচক তৈরি হয় না। তবুও কোনো কোনো আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠী, খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই, তাদের ভাষার যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুর তথ্যসংরক্ষণ করার পক্ষপাতী (ব্লেয়ার ও অন্যান্য, ২০০২; পেনফিলড ও অন্যান্য, ২০০৮)। তথ্যসংরক্ষণ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আছে অভিধান রচনা, বয়স্কদের মুখের কথা রেকর্ড করা এবং সাম্প্রতিক কালে কম্পিউটার ও পারস্পরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ামূলক কথাবার্তার সিডি-রমের ব্যবহার

(মবিসন ও পিটারসন, ২০০৩)। পাঠ্য, শ্রব্য ও দৃশ্য উপাদানের সাহায্যে আদিবাসী ভাষাগুলোর তথ্যায়ন ও অভিসন্ধয়নের কাজ করা সম্ভব। আন্তর্জালভিত্তিক সংগঠন 'প্রথম কণ্ঠস্বর' (First Voice) এ বিষয়ে বহুমাধ্যম প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখেছে (ফার্স্ট পিপলস কালচারাল ফাউন্ডেশন, ২০০৩)। তথ্যায়নের আর একটা দিক লিখনপদ্ধতির উদ্ভাবন ও সংস্কার করা। অনেক আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের লিখনপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে অথবা প্রচলিত লিখনপদ্ধতির উন্নয়ন ঘটিয়েছে (ব্র্যান্ড এবং অন্যান্য, ২০০২; হিনটন, ২০০৯)।

পাঠ্যক্রম/উপাদানের বিকাশ

আদিবাসী বিশেষজ্ঞ এক বিদ্বান জোর দিয়ে বলেছেন, ভাষাপ্রবহণ প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে পাঠ্যক্রমের বিকাশ ঘটানো দরকার (কার্কনেস, ২০০২)। প্রায়ই দেখা যায় ভাষাগোষ্ঠীগুলো মুদ্রণসম্পদ গড়ে তোলে (উইলসন ও কামানা, ২০০১), তা সত্ত্বেও বহুমাধ্যম উপাদানের জনপ্রিয়তা ও সাফল্য দেখা গেছে, যেমন 'ক্রি' ফরকিডস ভিডিওটি পুরস্কার জিতে নিয়েছে। ডিজনি চলচ্চিত্র 'বাম্বি'র 'আরপাহো'[২] সংস্করণ তৈরি করেছেন স্টিফেন গ্রে মর্নিং (২০০১)। ইয়ানচেস শুধু নাভাজো[৩] বেতারকেন্দ্র এবং ইনুইট[৪] সম্প্রচার কর্পোরেশনের কথা জানিয়েছেন যারা সপ্তাহে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা দূরদর্শন অনুষ্ঠান চালায় (রয়েল কমিশন অফ অ্যাবরিজিনাল পিপলস, ১৯৯৬)। সর্বশেষে একটি হাওয়াইয়ান ভাষা পুনরুজ্জীবন গোষ্ঠীর কথা বলতে হয়, যাঁরা অ্যাপলের সঙ্গে চুক্তি করে পুরো হাওয়াইয়ান ভাষায় একটা অপারেটিং সিস্টেম চালু করে। এটাই কোনো আদিবাসী ভাষায় প্রথম MAC OS-এর প্রচলন (ওয়ারসাই ও অন্যান্য, ১৯৯৭)।

ভাষা প্রকৌশল (Language Engineering)

আদিবাসী ভাষাগুলির অবিরাম আধুনিকীকরণ চালিয়ে যাওয়া একটি জরুরি কাজ। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আদিবাসী ভাষায় সমসাময়িক প্রকাশভঙ্গি ও ধারণা নিয়ে আসা, যাতে তরুণ প্রজন্মের মনোযোগ ও আগ্রহ মাতৃভাষায় থাকে, যাতে ইংরেজি ভাষায় তাদের মন আবার ফিরে না যায় (অ্যান্টনি, জেভিস ও পাওয়েল, ২০০৩)। এই প্রচেষ্টার সাম্প্রতিক দু-একটা নিদর্শন দেখা যাক।

কানাডার কেবেক প্রদেশে ‘ক্রি’ স্বাস্থ্য পর্ষদ স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন পরিভাষা নির্মাণের কাজ হাতে নেয়। প্যানক্রিয়াস ও ইনসুলিন-এর মতো শব্দের ‘ক্রি’ পরিভাষা তৈরি করে (বনসপিয়েল, ২০০৫)। হাওয়াইয়ান যন্ত্রগণক প্রকল্পে নতুন হাওয়াইয়ান পরিভাষা তৈরি করা হয়, যেমন ‘upload’-এর হাওয়াইয়ান পরিভাষা হয় ‘হয়ুকা’ hoyouka। শব্দটি সংগ্রহ করা হয় ক্যানোতে মাল বোঝাই করার পরিচিত শব্দ থেকে। ‘save’ শব্দটির বদলে আনা হয় ‘মালামা’ শব্দ। এটি একটি হাওয়াইয়ান পদগুচ্ছের অংশ যার মানে যথাযথ যত্ন নেওয়া।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ/মাধ্যমিক-উত্তর উদ্যোগ

ভাষা সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের অন্যতম পন্থা হিসেবে কোনো কোনো গোষ্ঠী আদিবাসী ভাষাশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। মাতৃভাষার স্বচ্ছন্দ বাচক হলেই মাতৃভাষার দক্ষ শিক্ষক হবেন, তার কোনো মানে নেই। বাস্তবে মাতৃভাষার বাচক অনেক সময়ই ওই ভাষাটা শেখার অসুবিধাগুলো বুঝতে পারেন না (জেকবস, ১৯৯৮)। কার্কনেসের (২০০২) প্রস্তাব, ‘যথোপযুক্ত, শংসাপত্র সহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে, যাতে তারা ভাষাশিক্ষক, ভাষাবিজ্ঞানী, দোভাষী, অনুবাদক, পাঠ্যক্রম রচয়িতা এবং গবেষক হতে পারে’ (পৃষ্ঠা ১৯)। ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর একটি সার্টিফিকেট কোর্স চালু করে। এর নাম ডেভেলপমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড টিচিং সার্টিফিকেট। সম্প্রতি এনওয়কিন ভাষাকেন্দ্রের সহযোগিতায় ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আদিবাসী ভাষা পুনরুজ্জীবনের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে। মাধ্যমিক পাশ করার পরেই এই প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হওয়া যায়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই আদিবাসী জ্ঞান ও শিক্ষার গবেষণার জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তার অধীনে আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের প্রস্তুতি চলছে। এতে পুনরুদ্ধার, পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। কানাডার অ্যালবার্টা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছর একটা গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। তার নাম কানাডিয়ান ইন্ডিজেনাস ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেসি ইনস্টিটিউট (সংক্ষেপে CILLDI)। সমতুল্য

১. কানাডার একটি আদিবাসী ভাষা। নিবন্ধটির লেখকের মাতৃভাষা ‘ক্রি’। ২. একটি বিপন্ন আদিবাসী ভাষা। ৩. উত্তর আমেরিকার একটি আদিবাসী ভাষা। ৪. কানাডা ও গ্রিনল্যান্ডের এই প্রাচীন ভাষাভাষীদের কিছু লোক আলাস্কাতেও থাকে।

একটি প্রতিষ্ঠান আছে আমেরিকার আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে (AILDI)। এই দুটো প্রতিষ্ঠানই নিজের নিজের দেশের আদিবাসী ভাষা শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেয়।

ভাষানীতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভাষাপুনরুজ্জীবন আন্দোলনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে গেলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দুই স্তরেই যেসব প্রতিষ্ঠান ভাষা পরিকল্পনা ও তহবিল প্রদান করে তাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার। অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীই এরকম মনে করে (অ্যাসেম্বলি অফ ফার্স্ট নেশনস, ১৯৯১; ফার্স্ট নেশনস ল্যাঙ্গোয়েজ অ্যান্ড লিটারেসি সেক্রেটারিয়েট, ১৯৯২)। এ ব্যাপারে একটা সাফল্যের নিদর্শন ১৯৯৮ সালে কানাডার 'কেন্দ্রীয় আদিবাসী ভাষা উদ্যোগ' গঠন। এই প্রতিষ্ঠান আদিবাসীভিত্তিক ভাষাপ্রকল্পগুলোকে দেশের সর্বত্র তহবিল মঞ্জুর করে (নরিস, ২০০৩)। আদিবাসী ভাষাগুলো রক্ষা করা ও তাদের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্য কার্কনেস (২০০২) জোর দিয়েছেন আইন প্রণয়নের ওপর। আদিবাসী ভাষাসংস্কৃতির জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স ২০০৫ সালের জুন মাসে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। তাতে কানাডার আদিবাসীদের ভাষা সুরক্ষা, পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়নের রণনীতির প্রস্তাব দেওয়া হয়। কোনো কোনো ভাষাগোষ্ঠী নিজেদের এক একটা 'ভাষিক কর্তৃত্বের সংগঠন' গড়ে তুলেছে। ছোটো ছোটো 'দল' বা 'উপজাতির' সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে দৃষ্টিপাত করে যখন একই ভাষার সংরক্ষণের জন্য সহযোগিতাভিত্তিক আন্দোলন করতে পারবে, তখনই এই ভাষিক কর্তৃত্বের সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে পারবে (ইগনাক, ১৯৯৮)। এ ধরনের কাজের দৃষ্টান্তমূলক মডেলের পরিচয় পাওয়ার জন্য পোতাওয়াতমি পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের ওয়েটজেলের প্রদত্ত (২০০৬) বিবরণী দ্রষ্টব্য।

গবেষণা

আদিবাসী ভাষা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার

জন্য গবেষণা খুব জরুরি। এ বিষয়ে কার্কনেস (২০০২) প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী প্রধানত ভাষাবিজ্ঞানীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট গবেষণা সহযোগী হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন। নিজেদের ভাষায় কার্যকরী শিখনবস্তু উৎপাদন ও অভিসঞ্চয়নের জন্য ভাষাতত্ত্ব শেখাটাই তাঁদের উদ্দেশ্য (অ্যান্টনি ও অন্যান্য, ২০০৩; ব্লেয়ার ও অন্যান্য, ২০০২; ১, ২০০১)। ম্যাককার্টি, রোমেরো ও জেপেদা (২০০৬)-র মতো গবেষকরা ভাষাপুনরুজ্জীবনের নানা দিক নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী। তার মধ্যে প্রধান দিক হল ভাষা হারিয়ে যাওয়া ও শিক্ষা নিয়ে তরুণদের মনোভাব।

ভাষা পঠনপাঠন

এটা বোধ হয় ভাষাশিক্ষার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি, যদিও এই পদ্ধতিতে সচ্ছন্দ বাচকের সংখ্যা বাড়বেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই (ব্লেয়ার ও অন্যান্য ২০০২)। এই উদ্যোগে সাধারণত দেখা যায় শিশুদের জন্য 'বিষয়' হিসেবে মাতৃভাষা পড়ানো অথবা বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যপঠনের ব্যবস্থা করা (ইগনাক, ১৯৯৮)। স্টিফেন গ্রেমর্নিং (২০০৬) এব্যাপারে আরাপাহো জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে সহমত প্রকাশ করেছেন। তারা K-১২ স্কুল ব্যবস্থায় 'বিষয়' হিসেবে আরাগাহো শেখানোর ব্যবস্থা চালু করার চার বছর পর আবিষ্কার করল যে এতে নতুন বাচক তৈরি হচ্ছে না।

দ্বিভাষিক স্কুলব্যবস্থা

বেশ কয়েকটা পুরোপুরি দ্বিভাষিক স্কুল নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলছে। এদের মধ্যে আছে উত্তর-পূর্ব আরিজোনার প্রসিদ্ধ রক পয়েন্ট আদিবাসী স্কুল যা নাভাজো জাতির জন্য নিবেদিত। প্রথম দ্বিভাষিক ক্রি-ইংরেজি স্কুল খোলা হয়েছে মানিটোবার টমসন অঞ্চলে ২০০১ সালে। ভাষা পুনরুজ্জীবন রণকৌশলে দ্বিভাষিক স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যদিও ইংরেজির আধিপত্যের ফলে ভাষাপুনরুজ্জীবনে এদের সাফল্যের মাত্রাভেদ ঘটে। একদিকে যেমন ম্যাককার্টি (২০০৩) মনে করেন সুপরিচালিত দ্বিভাষিক স্কুল ব্যবস্থার ফল ইতিবাচক, অন্যদিকে ব্ল্যাক ফিট সমাজকর্মী ডারেল কিপস (২০০০) দ্বিভাষিক স্কুলের

পদ্ধতি সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ এই ব্যবস্থা কার্যত পুরো ইংরেজি ভাষা বিকাশের মধ্যবর্তীস্তর হিসেবে কাজ করে।

ভাষা নিমজ্জন পদ্ধতি

নানা বয়সের/গোষ্ঠীভিত্তিক অনেক ভাষাগোষ্ঠী গ্রীষ্মকালীন নিমজ্জন রীতির কর্মসূচি গ্রহণ করে (ডানিয়েল-ফিস, ২০০৫; জেকবস, ১৯৯৮)। এগুলিতে এক বা দু-সপ্তাহের শিবিরে শুধুমাত্র মাতৃভাষায় নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর সুবিধা হচ্ছে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে দৈনন্দিন জীবনের ভাষিক অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়।

ছোটো শিশু ভিত্তিক

'তে কোহাঙ্গো রিও' অর্থাৎ 'ভাষানীড়ে' কর্মসূচির সূত্রপাত ঘটে ১৯৮০-র দশকে। অতিশৈশবেই শিশুদের কথাবার্তা ও শিক্ষা দু'দিক থেকেই শুধুমাত্র মাতৃভাষায় নিমজ্জিত রাখা হয় (কিং, ২০০১; তে কোহাঙ্গো রিও, ২০০৮)। ভাষাপুনরুজ্জীবনের সবচেয়ে সফল মডেল বলে এটি বিশ্বে গণ্য হয়েছে; নিউজিল্যান্ডের আওতেয়ারোয়ায় মাওরি ভাষার পুনরুজ্জীবনে এটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে (কিং, ২০০১; ইয়ানচেস, ২০০৪)। মাওরি ভাষার পুনরুজ্জীবনে সাফল্যের কাহিনি শুনে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের একটি ছোটো দল ১৯৮০তে নিউজিল্যান্ডে খুঁটিয়ে দেখতে আসে সেখানে মাওরিরা কী করছে। বর্তমানে মাওরি ও হাওয়াই ভাষীদের সব কটি প্রজন্মের বাচক নিমজ্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার বাচকে পরিণত হয়েছে (ওয়ার্নার, ২০০১; উইলসন ও কামানা, ২০০১)।

প্রধানত 'আহা পুনানা লিও'র হাওয়াই ভাষানীড় সাফল্যের জন্য যেসব বিপন্ন ভাষাগোষ্ঠী পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশা করছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বিদেশে যেখানেই হোক, তাদের কাছে হাওয়াই একটি অগ্রণী মডেল, এবং আশার প্রতীক। বর্তমানে হাওয়াইয়ান জনগোষ্ঠীর K-১২ (কিন্ডার গার্টেন থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত) নিমজ্জন বিদ্যালয় আছে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবুও 'আহা পুনানা লিও' প্রাকবিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠান হাওয়াই ভাষা পুনরুজ্জীবনের ভিত্তি হিসেবে এখনো চলছে।

আকর্ষণীয় বিষয় হল, হাওয়াই আর মাওরি নেতারা ভাষাপুনরুজ্জীবনের লড়াইতে নামার আগে প্রথমে কানাডার ফরাসি নিমজ্জন মডেলটি ভালো করে পরীক্ষা করেছিলেন (বেন্টন, ১৯৯৬; ওয়ার্নার ২০০১)। কানাডার বিভিন্ন বাছাই করা এলাকায় প্রাকবিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে নিমজ্জন কর্মসূচি গড়ে তোলা হচ্ছে, যেমন অনিয়ন লেক ও কানওয়াকে অঞ্চলে সম্পূর্ণ নিমজ্জন কর্মসূচি শিশুশ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বিরাজ করছে। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার অ্যাডামস লেক এলাকার ভাষাগোষ্ঠীদের মধ্যে প্রাকবিদ্যালয় থেকে সপ্তমশ্রেণি পর্যন্ত নিমজ্জন প্রক্রিয়া চলছে (ইগনাক, ১৯৯৮ ; ম্যাকাইভার, ২০০৬)। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সরকারের ২০০৪ সালের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে গত কয়েক বছরে তারা ১৮টি 'ভাষানীড়' কর্মসূচি চালাতে সহায়তা করেছে। এটাই দেশের সবচেয়ে ঘননিবদ্ধ 'ভাষানীড়ে'র অঞ্চল।

K-১২ নিমজ্জন

কিন্ডারগার্টেন থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত নিমজ্জন বিদ্যালয় চালিয়ে যাওয়া কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। প্রথমে মাওরি এবং তারপর হাওয়াই জনগোষ্ঠী এই সাফল্যের প্রথম দুই দাবিদার। ১৯৯৭ সাল থেকে মাওরিরা প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত কেবলমাত্র মাওরি মাধ্যমেই স্কুল শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজি শুধু একটা বিষয় হিসেবেই পড়ানো হয় (হ্যারিসন ও পাপা, ২০০৫)।

বয়স্কদের জন্য নিমজ্জন

নির্দিষ্টভাবে বয়স্কদের জন্য কয়েকটা নিমজ্জন পদ্ধতি আছে। কারিগর-শিক্ষানবীশ ভাষাশিক্ষা কর্মসূচি (হিন্টন ও অন্যান্য ২০০২) ক্যালিফোর্নিয়ায় সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে। ব্যাপারটা এরকম, একজন অল্পবয়স্ক আর একজন বয়স্ক মাতৃভাষাভাষীকে নিয়ে দুজনের একটা করে নিমজ্জন জোড় বেঁধে দেওয়া হয়। স্থির হয় প্রতিটি জোড় ওই ভাষায়ই নির্দিষ্ট একটা সময় পরস্পরের সঙ্গে কাটাবে। আর একটা উদ্যোগ মোহক বয়স্ক নিমজ্জন কর্মসূচি।

এতে শিক্ষার্থীদের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করা হয়। প্রতিটি দল সেপ্টেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত এক একটা বাসস্থানে সপ্তাহে ৫ দিন কাটাবে। সেখানে তারা একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে, বয়স্কদের ও মাতৃভাষাদক্ষ লোকেদের সঙ্গে আলাপচারি করবে (ম্যারাকেল অ্যান্ড রিচার্ডসন, ২০০২)। গ্রেমর্নিং আর একটি নিমজ্জন মডেলের উল্লেখ করেছেন। অতিসফল এই মডেলটির নাম ত্বরান্বিত দ্বিতীয় ভাষাশিখন। আরাপাহো অঞ্চলে শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে তিনি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন (গ্রেমনিং, ২০০৫)।

কোন মডেলে সুফল পাওয়া যাচ্ছে?

পূর্ববর্তীদের সমীক্ষা ও গবেষণার ভিত্তিতে হার্মেস (২০০৭) মন্তব্য করেছেন, 'আদিবাসী ভাষা পুনরুজ্জীবনের সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে নিমজ্জন পদ্ধতি দ্রুত মান্যতা পাচ্ছে...' (পৃ. ৫৮)। ম্যাকার্টি (২০০৩) এই পথনির্দেশের সমর্থনে লেখেন, 'স্বচ্ছন্দ মূলবাচকের এক নতুন প্রজন্মের উদ্ভব ঘটানোর পথ যাঁরা খুঁজছেন সেইসব আদিবাসী বাচক সম্প্রদায়ের কাছে ভাষানিমজ্জন... ক্রমশ প্রথম পছন্দের শিক্ষাতত্ত্বে পরিণত হচ্ছে' (পৃ. ৪৮)। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা আদিবাসী ভাষায় পুনরুজ্জীবনের প্রবক্তা হিসেবে লেগে আছেন সেই গ্রেনোবল ও হোয়ালে (২০০৬) জানিয়েছেন, "ভাষা পুনরুজ্জীবনের সেরা উপায় সম্পূর্ণ নিমজ্জন কর্মসূচি...' (পৃ. ৫১)। যাই হোক, শুরুতেই সম্পূর্ণ নিমজ্জন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় বলে দেখা গেছে। তাই ভাষাগোষ্ঠীকে প্রথমে আংশিক নিমজ্জন থেকে ধাপে ধাপে পূর্ণ নিমজ্জনের দিকে এগোনো যেতে পারে (আগুইলেরা ওলে কোঁৎ, ২০০৭)।

ওপরের দুই গবেষক ভাষা নিমজ্জনের ব্যাপারে তিনটি আদিবাসী গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে এই তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর কৃতিত্বকে সামনে এনেছেন। একটা বিষয় তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন ভাষাশিক্ষার নিমজ্জন পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে চালাতে পারলে পড়ুয়ার ইংরেজি ভাষাদক্ষতারও কোনো ক্ষতি হয় না। তাঁদের মতে, সুশিক্ষিত দ্বি-ভাষিক, দ্বি-সাংস্কৃতিক ব্যস্ত মানুষেরা স্বজাতি ও স্বসমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। ওকলাহোমায় চেরোকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করতে করতে

একটা 'নিমজ্জন দল' 'সাংস্কৃতিকভাবে সাড়াদায়ী মূল্যায়ন'-এর একটা মডেল তৈরি করে। লিজেট পিটার (২০০৩) তার বিবরণ দিয়েছেন। এই হাতিয়ারকে তাঁরা চলতে চলতে আরো উন্নত করে তুলছেন। তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী এটা সাংস্কৃতিকভাবে সাড়াদায়ী, মুক্তপ্রান্তিক (open-ended) সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় হাতিয়ার যার সাহায্যে কর্মসূচির শক্তি ও দুর্বলতা সনাক্ত করে মডেলটির উন্নয়ন সম্ভব হয়।

নরিস (২০০৩) জানিয়েছেন, যে-মুষ্টিমেয় দেশগুলিতে ভাষা ব্যবহার ও ভাষাক্ষমতার তথ্যসংগ্রহ করা হয়, কানাডা তাদের মধ্যে অগ্রণী। হোয়টালে (২০০৩) বলেন, "ভাষাপুনরুজ্জীবনের অনেকগুলো রণকৌশল অল্পদিন হল প্রয়োগ করা হচ্ছে, ফলে ভাষার প্রাণশক্তির ওপর তাদের প্রভাবের দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাতথ্য সামান্যই পাওয়া গেছে...' (পৃ. ৯৬৭)। ওয়েটজেল (২০০৬) মন্তব্য করেছিলেন, আদিবাসী ভাষাগুলোর অবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু পুনরুজ্জীবন কর্মসূচি নিয়ে কাজ খুবই কম; বিশেষত, এসব কর্মসূচির প্রয়োগ করে পুনরুজ্জীবন কতটা হল তার বিবরণ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। স্পষ্টতই আদিবাসী ভাষা পুনরুজ্জীবনের কর্মকৌশলগুলির কার্যকারিতা নিয়ে আরো অনেক কাজ করার দরকার।

নিজের নিজের ভাষা পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাফল্যলাভের পথে বাধা কী কী?

বারেনা ও অন্যান্যর (২০০৭) ভাষাপুনরুজ্জীবনের লড়াইয়ের অনেকগুলি কারণ দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল: বাচকসংখ্যার স্বল্পতা, মর্যাদাহীন অবস্থান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং ভাষাপরিত্যাগের জন্য বাইরের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ। কানাডার ক্ষেত্রে একটা বিজয় অর্জন করা গেছে। আদিবাসী ভাষা উদ্যোগ (Aboriginal Languages Initiative = ALI) বছরে ৫০ লক্ষ ডলার এ বাবদ মঞ্জুর করেছে। প্রদেশ ও অঞ্চলগুলির মধ্যে সমহারে এই অর্থ বণ্টন করা হবে। ২০০৬-এর আদমসুমারি অনুযায়ী আদিবাসী জনসংখ্যা মোট ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ৭শ ৯০। তাদের ভাষাপুনরুজ্জীবনের জন্য বছরে মাথা পিছু জোটে ৪.২৫ ডলার। নিঃসন্দেহে

অতি নগণ্য বরাদ্দ। অবশ্য এই নগণ্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের সঙ্গে কোনো কোনো প্রদেশ বা অঞ্চল নিজেদের তহবিল থেকে কিছু অর্থ মঞ্জুর করা হয়।

ভাষাপুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার পথের অন্যতম বাধা তরুণ প্রজন্মের অনাগ্রহ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কোনো কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা লজ্জা (ম্যাককার্টি ও অন্যান্য, ২০০৬)। ক্রাউস (১৯৯৮) দ্বিভাষিক শিক্ষকদের এক সমাবেশে প্রয়াত এইলিন ম্যাকলিনের একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাকলিন বলেছিলেন, 'আমাদের আর ভাষাবিজ্ঞানীর দরকার নেই, বরং আমাদের দরকার ভালো মনোরোগ বিশেষজ্ঞ'। আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা মাতৃভাষাকে অন্তরে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন, তরুণদের সেটা শেখান। ওই একই লোকেরা যারা নিমজ্জন কর্মসূচি ও নিমজ্জন বিদ্যালয়ে পড়ান, তাঁরা প্রায়ই বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়ে ও নাতিনাতনিদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালান (গ্রেমর্নিং ২০৪০; ক্রাউস, ১৯৯৮)।

ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ

ভাষাঘাতে সাফল্যের সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত হয়
সেই লক্ষ্যে আদিবাসী ভাষাগোষ্ঠীর জন্য অবশ্যকরণীয় কী?

আদিবাসীদের আবাসিক বিদ্যালয়ের শোচনীয় অভিজ্ঞতার দায় যখন সরকার মেনে নিয়েছে (প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ২০০৮), তখন কানাডা সরকারকে অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। আবাসিক বিদ্যালয়ের শিকার ব্যক্তিদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া একটা ভালো পদক্ষেপ, সন্দেহ নেই, কিন্তু এতে হারিয়ে যাওয়া ভাষা ফিরে আসবে না। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রভাব পড়বে সরকার যদি আমাদের ভাষাগুলোকে আবার বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

আদিবাসীদের ভাষাকে এদেশের আদি কণ্ঠস্বর হিসেবে ঘোষণা করে তাদের সরকারি ভাষার মর্যাদা দিতে হবে।

যে ভালো কাজ ইতিমধ্যে করা হয়েছে সেগুলোর ওপর আরও নজর দিন, একটি হল 'রয়াল কমিশন অব অ্যাবরিজিনাল পিপল (১৯৯৬)। অন্যটি টাস্কফোর্স অন অ্যাবরিজিনাল ল্যাঙ্গোয়েজেস অ্যান্ড কালচারস-এর দ্বারা ২০০৫-এ প্রকাশিত 'নতুন আরম্ভের অভিমুখে' নামে প্রতিবেদন। এই দুটি

দলিলে অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়েছে, যেগুলো কার্যকরী হলে বহু সমস্যার সমাধান হবে। সুপারিশগুলোর কয়েকটা হল: জাতিকে সংগঠিত হওয়ার ডাক; আদিবাসী ভাষাসমূহের জাতীয় কেন্দ্র (NCIL) গঠন যেমন আছে জাতীয় আদিবাসী স্বাস্থ্য সংস্থা (NAHO)। NCIL-এর কাজ লিখন পদ্ধতি, শিখন উপাদান, পাঠ্যক্রম, বাচকদের সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক গঠন এবং গবেষণাকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন।

ভাষা পুনরুজ্জীবনের জন্য জীবন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার

গোষ্ঠীদের মধ্যে 'সমগ্রগোষ্ঠীগত' দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলায় সহায়তা করতে হবে। ভাষাকে অবশ্যই পরিবার ও গোষ্ঠীর ভেতর জীবন্ত, কাজের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হার্মেস (২০০৭) কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন— কোনো উপলক্ষ ছাড়াই নৈশভোজের আয়োজন করা, সর্বজনীন উৎসব বা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেখানে মাতৃভাষার ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়; এভাবে সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভাষিক অভ্যাসের একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। সিমস (২০০৫) একটা উদাহরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিউ মেক্সিকোর দুটি পুয়েবলো গোষ্ঠী একটা সর্বজনীন মোচ্ছবের আয়োজন করে যেখানে নানারকম খেলাধুলো আর খাবারের দোকান ছিল। এগুলো চালাচ্ছিল মাতৃভাষার সাবলীল বাচকেরা। যেসব ছাত্ররা খেলায় যোগ দিতে বা খাবার কিনতে আসত তারা মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলার জীবন্তচর্চার প্রবাহে চলে আসত। এভাবে ভাষাশিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে গোষ্ঠীজীবনের ভেতর টেনে আনা হত।

উপসংহার

কানাডা ও অন্যান্য উপনিবেশিত দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে আদিবাসী ভাষাগুলোর টিকে থাকার ব্যাপারে হতাশ হওয়ার অনেক কারণ আছে। তবুও দেখা যাচ্ছে আদিবাসী জাতিগুলোর অভূতপূর্ব গতিতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে (স্ট্যাটিকটিকস কানাডা, ২০০৮)। আমাদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, এই দাবি নিয়ে ভাষাগোষ্ঠীর মানুষরা ক্রমশ বেশি বেশি করে এগিয়ে আসছে।

অনেক গোষ্ঠী ভাষাপুনরুজ্জীবনের পদ্ধতিতে নতুন নতুন উদ্ভাবন ও পরিশীলন নিয়ে আসছে।

উপযুক্ত রসদ পেলে এক প্রজন্মের মধ্যেই ভাষাগোষ্ঠীগুলি তাদের মাতৃভাষা ফিরিয়ে আনতে পারে। বয়স নিরপেক্ষভাবে 'গোষ্ঠীর প্রতিটি' সদস্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনা কার্যকরী করলে মাতৃভাষাগুলো আবার বিকশিত হয়ে উঠবে। আদিবাসী ভাষার যাতে মৃত্যু না ঘটে তা সুনিশ্চিত করার দায় এদেশের প্রথম জনগোষ্ঠীদের ওপরই বর্তেছে। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য সহযোগী বন্ধুদেরও প্রয়োজন।

অনুবাদ : সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৬

তথ্যসূত্র

(নিবন্ধে উল্লেখিত তথ্যসূত্রের তালিকাটি সুবিশাল। আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলির তালিকা দিচ্ছি। অন্য সূত্রগুলি আন্তর্জালে পাওয়া যাবে। মিলিয়ে নেওয়ার সুবিধার জন্য ইংরেজি ভাষায়/রোমান অক্ষরে তথ্যসূত্রটি পরিবেশিত হল।)

Aguilera, D, & Le Compte, MD (2007). Resiliency in native languages, 'The tale of three indigenous communities' experience with language immersion. Journal of American Indian Education, 46 (3), 11-36.

Aha Punana Leo (2004). http: \\ www . ahapunanaleo.org.

Assembly of First Nations (1991). Towards linguistic justice for first nations: the challenge ottawa: Aboriginal Languages and Literacy conference.

Blair, H. Rice. S, and others (2002). In B. Burnaby & J. A. Reyhner (Eds), Indigenous languages across the community (pp 89-98). Flagstaff, AZ: Northern Arizona University: Center for Excellence in Education.

Crystal, David. Language Death (2000) Cambridge University Press.

Dixon, R. N. W. (1997) The rise and fall of Languages. Cambridge University Press.

Foundation for Endangered Languages (2004) Manifesto. http:\\www.ognius.org/manifesto.ttm.

Greymorning, S (2001) in L. Hinton & K. Hale (Eds), The Green book of language revitalization in Practice (pp 287-297). San Diego, CA: Academic Press.

Ignac (1998). Handbook for aboriginal language program planning in British Columbia.

Kirkness, V. (2002) in Hinton and Hale (eds). The Green book of Language revitalization in practice.

Norris (2203). From generation to generation: survival and maintenance of Canada's aboriginal Languages within families, Communities and Cities.

Te Kohanga Reo. (2004). Hisory http:\\www.kohango.ac.nz/history. html.

Warschanr and others (1997). Leoki : A powerful voice of Hawaian language revitalization. Computer Assisted Language Learning.

Whaley (2003). The future of native languages

Yannches, A. (2004). Building a language nest. Native Peoples revitalize their languages using proven approach from across the globe. Rural Roots, 5(3), 1-8

ভাষা-সাম্য ও বহুত্ব প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাসূত্র

বিপ্লব নায়ক

১

বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভবিন্দু হিসেবে নেওয়া যাক মার্কস-এর একটি বহু-পরিচিত বহু আলোচিত উক্তিকে। উক্তিটি মার্কস ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'লুই বোনাপার্টের আঠারোই ব্রুমেয়ার'-এ করেছিলেন। উক্তিটি এইরকম:

> মানুষ তাদের নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই তৈরি করে, কিন্তু তা তাদের যেমন ইচ্ছা তেমনভাবেই তৈরি করে না; নিজেদের পছন্দমতো বেছে নেওয়া পরিস্থিতিতেও তৈরি করে না, বরং তৈরি করে অতীত থেকে সরাসরি প্রেরিত, প্রদত্ত ও প্রাপ্ত পরিস্থিতিতে।
> (Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly found, given and transmitted from the past.)

এখানে দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি হল মানুষের নিজেদের ইতিহাস নিজেরা তৈরি করার মুক্তি ও দ্বিতীয়টি হল অতীত থেকে সরাসরি প্রেরিত, প্রদত্ত ও প্রাপ্ত পরিস্থিতির অধীনতা। এই মুক্তি ও এই অধীনতার মধ্যে কোনটি বেশি, কোনটি প্রধান, কোনটি নির্ধারক তা নিয়ে বিতর্ক-বিশ্লেষণ-তত্ত্বায়ন-এর অবকাশ প্রচুর এবং তা প্রচুর হয়েছেও, একটি বা অপরটির উপর তুলনামূলকভাবে জোর দেওয়ায় দৃষ্টিভঙ্গির বহু পার্থক্য ও বিভিন্নতা তৈরি

হয়েছে। সেই সমস্ত পার্থক্য ও বিভিন্নতাকে মর্যাদা দিয়েও আমরা ধরতে পারি যে, নিজেদের ইতিহাস নিজেরা তৈরির মুক্তি ও অতীত থেকে সরাসরি প্রেরিত, প্রদত্ত ও প্রাপ্ত পরিস্থিতির অধীনতা একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত; একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব অভাবনীয়, অর্থাৎ তারা দুয়েই একে অপরের অস্তিত্বের শর্ত নির্ণয় করে। আর, এই দুইয়ের সংশ্লেষের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মানুষদের কাজ (action) বা মানুষদের চর্চা (practice)। মানুষদের এই কাজ বা চর্চার মধ্য দিয়ে ইতিহাস প্রতিনিয়ত নির্মিত-পুনর্নির্মিত হতে হতে চলে।

২

মার্কসের উদ্ধৃত বক্তব্য এবং তা নিয়ে উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আলোচনায় 'ইতিহাস' শব্দটিকে যদি 'ভাষা' শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তাহলেও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে। অর্থাৎ, ভাষাও মানুষদের কাজ বা চর্চার দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্মিত-পুনর্নির্মিত হতে হতে যায়; এবং এই কাজ বা চর্চা নতুন কিছু তৈরি করার মুক্তি ও অতীত থেকে সরাসরি প্রেরিত, প্রদত্ত ও প্রাপ্ত পুরানোর অধীনতা—এই দুইয়ের সংশ্লেষ থেকে উৎসারিত। ভাষার জীবনীশক্তি বা প্রাণমূল সেই ভাষার শব্দাবলির প্রাচুর্য, ব্যাকরণের সুসংগতির উপর নির্ভর করে না; যদি তা করত, তাহলে লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদির মতো প্রাচুর্যপূর্ণ শব্দভাণ্ডার ও সুসংগত ব্যাকরণ সম্পন্ন ভাষা মরে যেত না। ভাষার জীবনীশক্তি বা প্রাণমূল নির্ভর করে সেই ভাষার ব্যবহারকারীদের কাজ বা চর্চার উপর। কোনো ভাষা-ব্যবহারকারীদের কাজ বা চর্চা যত বিবিধ, বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হতে থাকে, সেই ভাষা তত সজীব ও সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, সমৃদ্ধ কোনো ভাষারও যখন ব্যবহারকারী কমতে থাকে, ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকে, তখন ভাষার সজীবতা শুকিয়ে আসে, তার প্রভূত সম্পদও জাদুঘরের অচল সামগ্রীতে পরিণত হয়। ফলে, ভাষার জীবনীশক্তি বা প্রাণমূল প্রতিনিয়ত সেই ভাষা ব্যবহারকারী মানুষদের কাজ বা চর্চার দ্বারা পুনরুৎপাদিত হতে হতে যায়।

৩

পৃথিবীজুড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ প্রাকৃতিক অবস্থার অংশ হিসেবে মানুষদের কাজ বা চর্চাও তার পরম্পরায় ও বর্তমানতায় বিবিধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ—এই বহুত্ব যেমন প্রতিটি মানবগোষ্ঠীর সমাজ-আকার ও জ্ঞানোৎপাদনের বিভিন্নতায় প্রতিফলিত, তেমনই তা প্রতিফলিত তার ভাষায়।

৪

এখন প্রশ্ন হল যে এই বিভিন্নতাকে আমরা কীভাবে দেখব? বিভিন্নতাকে দেখার দুইটি উপায় আছে—একটি হল তাদের একটি একমাত্রিক সারিতে বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর সম্পর্কের নিরিখে বিন্যস্ত করা, আর একটি হল বহুমাত্রিক প্রসারে তাদের সমমর্যাদায় বিন্যস্ত করা, যেখানে বৃহত্তর-ক্ষুদ্রতর বিচার অবান্তর। গণিত থেকে একটি উদাহরণ নিয়ে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি। গণিতে বাস্তব সংখ্যারা (real numbers) বিন্যস্ত একটি একমাত্রিক সংখ্যা-রেখায় (number line), যেখানে বড়-ছোট-র (greater than/less than, >/<) সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট। অন্যদিকে দ্বিমাত্রিক জটিল রাশি (complex number) বা বহুমাত্রিক ভেক্টর রাশি বিন্যস্ত দ্বিমাত্রিক বা বহুমাত্রিক এক প্রসার (space)-এ যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু বড়-ছোট (greater than/less than, >/<) নেই। সুতরাং বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিন্যাস দুইভাবেই হতে পারে—বড়-ছোট, পশ্চাৎপদ-আগুয়ান সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একমাত্রিকতায় বিন্যস্ত করেও হতে পারে, আবার বহুমাত্রিক প্রসারে বড়-ছোট, পশ্চাৎপদ-আগুয়ান সম্পর্ক থেকে মুক্তভাবেও হতে পারে।

৫

মানুষদের মধ্যে সমাজ-আকার, জ্ঞানোৎপাদন ও ভাষা-র বিভিন্নতাকে একমাত্রিক সারিতে বড়-ছোট/আগুয়ান-পশ্চাৎপদ সম্পর্কে বেঁধে বিন্যস্ত করার মতবাদই এখন প্রতাপশালী। এই মতবাদ তার কৃত বিন্যাসের যুক্তি উৎপাদনের জন্য সমাজ-ইতিহাস বা প্রকৃতির বিকাশের একটি একমুখী গতির

কল্পনা হাজির করে যা অনাদি-অনন্ত অতীতের সমস্ত কিছুকে ব্যাখ্যা করা ও অনাদি-অনন্ত ভবিষ্যতের পথরেখাকে বলে দিতে পারার দাবি করে। এর নানা চেহারা আছে। যেমন, দাবি করা হয় যে সরলতা থেকে ক্রম-জটিলতায় উত্তরণ হল প্রকৃতির গতি, দাবি করা হয় যে বিকেন্দ্রীভূত আলগা অবস্থা থেকে দৃঢ় কেন্দ্রীভূত কাঠামোয় বাঁধা পড়াই হল বিকাশের পথ, আবার দাবি করা হয় যে মানুষের কাজ ও চর্চাকে জড় উৎপাদন (material production)-এর সঙ্গে বেশি বেশি করে অভিন্ন করে তুলে জড় উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধিই হল অগ্রগামীতার লক্ষণ। এই মতবাদিক কল্পনার উপর দাঁড়িয়ে তথাকথিত জটিলতা, কাঠামোর কেন্দ্রীভূতকরণ ও জড় উৎপাদনের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নিরিখে মানুষদের মধ্যের সমাজ-আকার, জ্ঞানোৎপাদন ও ভাষাদের আগুয়ান-পশ্চাৎপদের সারণিতে ভেঙে একমাত্রিকতায় বিন্যস্ত করা হয়। এইভাবেই বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সমাজ-আকার, জ্ঞানোৎপাদন পদ্ধতি ও ভাষাকে চূড়ান্ত পশ্চাৎপদতার নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে ক্রম-সোপানতন্ত্র নির্মাণ করে কতিপয় পশ্চিম-ইউরোপীয় ও মার্কিনি সমাজ-আকার, জ্ঞানোৎপাদন পদ্ধতি ও ভাষাদের সর্বাগ্রগণ্যতার শিখরে অধিষ্ঠিত করা হয়।

একমাত্রিক সারণিতে বড়-ছোট, পশ্চাৎপদ-আগুয়ান সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এহেন বিন্যাস আরোপ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোয় পুঁজিবাদী সমাজ-আকার রূপ নেওয়ার প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতির বৈশিষ্ট্যমূলক পুঁজির অন্তহীন পুঞ্জীভবনের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-আধিপত্যের অন্তহীন ভৌগোলিক বিস্তারের রাজনীতি যখন ঔপনিবেশিকতার চেহারা ধরে প্রথম জন্ম নিল, তখন থেকেই শ্রেষ্ঠত্ব উৎপাদনে অস্ত্রশক্তি অন্যতম প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। ক্ষমতা-আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক অস্ত্রোল্লাসের যৌক্তিকতা উৎপাদনের জন্য তাকে প্রকৃতির বা ইতিহাসের অমোঘ গতি হিসেবে তুলে ধরতে ব্যবহৃত হয়েছে এই একমাত্রিক সারণির বিন্যাস, বলা হয়েছে যে পশ্চাৎপদের ঐতিহাসিক নিয়তিই হলো নিজে বিলীন হয়ে আগুয়ানের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া বা আগুয়ানের মধ্যে মিশে যাওয়া। আধিপত্যকারীর আধিপত্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই মতবাদ যখন আধিপত্যাধীনদেরও আচ্ছন্ন করে, তখন আধিপত্যাধীনরা নিজেদের

পরাধীনতার দুর্দশার জন্য আধিপত্যকারীদের আগ্রাসনকে দায়ী করার থেকে নিজেদের সমাজ-আকার, জ্ঞানোৎপাদন ও ভাষার ছোটত্ব বা পশ্চাৎপদতাকে দায়ী মেনে আধিপত্যকারীর সমাজ-আকার, জ্ঞানোৎপাদন পদ্ধতি ও ভাষাকে অনুকরণ করার এক প্রাণহীন কাজ বা চর্চায় আত্মসমর্পণ করে। ফলে তাদের নিজেদের সমাজ-আকার ধসে পড়ে, তাদের ভাষাও জীবনীশক্তি বা প্রাণমূল হারায়, আধিপত্যকারীর ভাষা দ্বারা ক্রম-প্রতিস্থাপিত হয়। ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হতে হতে, বাচকসংখ্যা ক্রমশ কমতে কমতে তাদের ভাষা ক্রমশ অবলুপ্তির ঢাল বেয়ে নামে।

৬

আমাদের চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য ভাষা এইভাবে মরে গেছে, মরে যাচ্ছে। তার মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, তুলনামূলক (সংখ্যায়) বড় জনগোষ্ঠীর ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা ভাষার দেহেও রোগের নানা লক্ষণ ফুটে উঠেছে। দীর্ঘদিনের ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের মতবাদিক ঘোরে আচ্ছন্ন থেকে বাংলা-বাচকরা সমাজ-ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—উচ্চশিক্ষা-গবেষণা থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব, আইন প্রশাসনের কাজ পর্যন্ত তার প্রকল্পিত আধুনিক জীবনের প্রতি স্তরে—কাজ বা চর্চার ভাষা হিসেবে ইংরেজিতেই মোহাবিষ্ট হয়ে আছে। ফলে বাংলা ভাষার প্রাণমূলও শুকিয়ে যাচ্ছে।

৭

একটি ভাষার প্রাণমূল শুকিয়ে গেলে, এমনকি একটি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেলে কী আসে যায়? ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা লুপ্ত হয়ে যাওয়া ভাষার যারা বাচক ছিলেন, তারা, বা তাদের পরবর্তী প্রজন্মরা যদি আর একটা ভাষায়, হোক না তা আধিপত্যকারীদের ভাষা, রপ্ত করে নিতে পারেন তো সমস্যা কোথায়?

কী আসে যায় বা সমস্যা কোথায় দানা বাঁধে, তা আমরা দুইটি দিক থেকে আলোচনা করতে পারি। প্রথম দিকটি হল ভাষাবাচকদের ভাষিক অধিকারের দিক ও দ্বিতীয় দিকটি হল ভাষার মধ্যে ধারিত জ্ঞানোৎপাদনের দিক।

৮

ভাষাবাচকদের ভাষিক অধিকারের দিক থেকে প্রথমে আলোচনা করা যাক। তার জন্য দেখা যাক ভাষাদের একমাত্রিক বড়-ছোট/আগুয়ান-পশ্চাৎপদ সম্পর্কে বিন্যাসের মতবাদ যেখানে প্রভুত্ব বিস্তার করে, সেখানে বিভিন্ন ভাষার বাচকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী চেহারা নেয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আধিপত্যবিস্তারকারীদের ভাষা সবচেয়ে উন্নত বা সবচেয়ে আগুয়ান ভাষা হিসেবে প্রতিপন্ন হয় কারণ সেই ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত থাকে সমাজে সম্মান ও ক্ষমতার অনেকগুলো অলিন্দে প্রবেশাধিকার। সেই অলিন্দগুলো হল—১) সরকার-প্রশাসন-বিচারালয়, অর্থাৎ সমাজ-সংগঠনের কাজ বা চর্চার অলিন্দ, ২) উচ্চ বেতনের ও উচ্চ সম্মানের পেশাগত কাজের অলিন্দ, ৩) শিক্ষা-গবেষণার অর্থাৎ জ্ঞানোৎপাদনের প্রাতিষ্ঠানিক অলিন্দ। নির্দিষ্ট উন্নত বা আগুয়ান ভাষাটি ব্যবহারের দক্ষতা যেহেতু এই সমস্ত কাজ বা চর্চার স্বীকৃত অলিন্দে প্রবেশের ছাড়পত্র দেয় এবং ওই ভাষাটি ব্যতিরেকে অন্য যা বা যা যা ভাষাতেই যত দক্ষতা থাকুক না কেন তা যেহেতু সেই ছাড়পত্র দেয় না, তার ফলে ওই ভাষাটির সঙ্গে ক্ষমতা ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির বিশেষ যোগ তৈরি হয়। এর ফলে ওই ভাষা ব্যবহারে দক্ষতাকে একটি ভাষিক পুঁজি হিসেবে দেখা হতে থাকে, যে ভাষিক পুঁজির বিনিয়োগ ক্ষমতা ও সুবিধাপ্রাপ্তির পুঞ্জীভবন-চক্রকে ক্রমদ্রুতিসম্পন্ন করে দেয়। অন্যান্য ভাষার বাচকরা এই বিশেষ ভাষিক পুঁজি আহরণ করতে যত উদগ্রীব হয়ে ওঠে, ততই তারা নিজেদের ভাষাগুলিকে অকার্যকরী, সীমাবদ্ধ হিসেবে দেখতে থাকে। যতই ভাষিক পুঁজি জমতে থাকে, ততই নিজেদের ভাষাগুলি অতীত বা দূর এক অসম্মানজনক অস্তিত্বের বর্জনযোগ্য অবশেষ হয়ে ওঠে, নিজেদের ভাষা সম্পর্কে তারা হয়ে ওঠে উদাসীন, এমনকি ঘৃণাভাবসম্পন্ন। এইভাবে ভাষিক পুঁজি দুই দিক থেকে সমাজে ভাষাদের মধ্যে সম্পর্কে বৈষম্য বাড়িয়ে চলার কাজ করে। একদিকে যেমন তার জন্ম ও প্রসার ঘটে সমাজ-সংগঠন, উচ্চ-স্বীকৃতির পেশাগত কাজ এবং জ্ঞানোৎপাদনের অলিন্দকে এমন এক কেন্দ্রীভূত অগণতান্ত্রিক কাঠামোয় বাঁধার মধ্য দিয়ে, যেখান থেকে অপরাপর ভাষারা নির্বাসিত, অন্যদিকে তেমনই ক্ষমতা ও সুবিধাপ্রাপ্তির আকর্ষণে

অপরাপর ভাষার বাচকদের মধ্যে এমন একটা ভাষিক মতবাদের প্রসার তা ঘটাতে থাকে যা ক্রমশ সেইসব ভাষাকে তাদের চোখেই হীন/অকাজের/ পশ্চাদবর্তী করে তোলে। ফলত, উন্নত বা আগুয়ান বলে চিহ্নিত একটি ভাষার জয়যাত্রা ক্রমশ সমাজ- প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীভূত করে তুলে মুষ্টিমেয়র নিয়ন্ত্রণে কাজ বা চর্চার ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করে এবং তাতে বেশি বেশি সংখ্যক মানুষদের অংশগ্রহণকে অসম্ভব করে তোলে ও সেই বেশি বেশি সংখ্যক মানুষদের ভাষা, জ্ঞানোৎপাদন ও অভিজ্ঞতাকে অবমূল্যায়িত করতে করতে মূল্যহীন বলে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

৯

কোনো মানবগোষ্ঠীর ভাষা সেই মানবগোষ্ঠীর জ্ঞানোৎপাদন প্রক্রিয়ার থেকে অবিচ্ছেদ্য। ভাষার মধ্যে যেমন ধারিত থাকে সেই মানবগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীববৈচিত্র্য, গাছগাছালি, ভূবৈচিত্র্য সম্পর্কে বহু প্রজন্ম ধরে আহরিত জ্ঞান, প্রকৃতি সম্পর্কে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনোভঙ্গি ও দর্শন, লোকায়ত ইতিহাসের সূত্র, তেমনই ভাষা নিজে সেই মানবগোষ্ঠীর একটি অনন্য জ্ঞানসৃষ্টি। একটি ভাষা তার স্বাভাবিক বিবর্তনের নিয়মে পরিবর্তিত হতে হতে যে রূপই নিক না কেন, তা তার অন্তঃস্থ সম্পদকে বহন করে নিয়েই চলে, তাকে কোনো বাঁকে ফেলে আসে না। কিন্তু আধিপত্যকারী কোনো ভাষার রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ক্ষমতা যখন অপর একটি ভাষাকে মুছে দেয়, তখন সেই মুছে যাওয়া ভাষার মধ্যে ধারিত সমস্ত জ্ঞানের সম্পদও চিরতরে মুছে যায়। ক্ষমতা-আধিপত্য একটি ভাষাকে মুছে ফেলার প্রক্রিয়ায় সেই ভাষায় ধারিত জ্ঞান, দর্শন, অভিজ্ঞতা ও মানবসৃষ্টিকে অবমূল্যায়িত করতে করতে যায়, কুসংস্কার, পশ্চাৎপদ ভাবনা, অপরিণত চিন্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে করতে যায়—এহেন ভাষিক মতবাদ গঠন সেই ভাষার সঙ্গে সংযুক্তিকে একটি সামাজিক লজ্জার বিষয় রূপে প্রতিপন্ন করে। ফলে বাচকসংখ্যা হারাতে হারাতে, তরুণ প্রজন্মের মুখ থেকে হারিয়ে যেতে যেতে শেষ বাচকটি পর্যন্ত হারিয়ে যখন সে লুপ্ত হয়, তার বহু আগেই তার মধ্যে ধারিত মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের অংশটি ব্রাত্য প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মানুষদের জ্ঞানোৎপাদন প্রক্রিয়ার বহুবিবিধ পরিসর ধ্বংস হয়ে ক্ষমতার

তিলকধারী একটি প্রক্রিয়ার একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে মানুষদের জ্ঞানোৎপাদনের জগতে সমরূপতার পক্ষাঘাত জারি হয়।

সমরূপতাকে পক্ষঘাত বলা হচ্ছে কেন, মানুষদের মধ্যে কাজ ও চর্চার ক্ষেত্রে জ্ঞানোৎপাদনের প্রক্রিয়ার বহুত্ব জরুরি কেন? জরুরি এই কারণে যে একমাত্র তা বজায় থাকলে তবেই কোনো বস্তুকে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফল পাশাপাশি হাজির হয়ে একে অন্যের সীমাবদ্ধতা বা তির্যকতা নিরসন করে বাস্তব সম্পর্কে বহুমাত্রিক বোধ গড়ে তুলতে পারে। এই বহুত্বের ক্ষয় হয়ে সমরূপতার পক্ষাঘাত জারি হলে নির্দিষ্ট একটি মতবাদের দৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ দেখা বাস্তব সম্পর্কে বহুমাত্রিক বোধ গড়ে তোলে না, ফলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত চেতনায় বাস্তব প্রতিভাত হয় না, স্বয়ংসম্পূর্ণতার মায়া-নিশ্চয়তা এক ছদ্ম-বাস্তবতার মধ্যে নির্বাসন নিশ্চিত করে গেল।

১০

একমাত্রিক সারণিতে বড়-ছোট, পশ্চাৎপদ-আগুয়ান সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষদের বিভিন্ন ভাষাকে বিন্যস্ত করে দেখা ক্ষমতা-আধিপত্যের রাজনীতির অঙ্গীভূত হয়ে ভাষিক বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করার, মানুষদের কাজ বা চর্চার ক্ষেত্রে পক্ষাঘাত ছড়ানোর কাজ করে চলেছে। তাই এর বিকল্প প্রয়োজনীয়। গণিতের উদাহরণ থেকে আমরা আগে দেখেছিলাম যে বিভিন্নতার বিকল্প বিন্যাস সম্ভব— সেই বিন্যাস হল বহুমাত্রিক প্রসারে বড়-ছোট, পশ্চাৎপদ-আগুয়ান সম্পর্ক থেকে মুক্তভাবে সমতার তলে বিন্যাস ।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা আছে, কিন্তু ছোট-বড় নেই। প্রতিটি ভাষা তার মানবগোষ্ঠীর জীবন-অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে বিশিষ্ট কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে প্রতিটি ভাষাই ভাবপ্রকাশ ও জ্ঞানোৎপাদনের কাজে সম সম্ভাবনাসম্পন্ন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক এই সিদ্ধান্তই যথেষ্ট নয়। ক্ষমতা-আধিপত্যের রাজনীতির বিকল্প হতে পারে এমন রাজনৈতিক অবস্থানও প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে সমাজ-ইতিহাস বা প্রকৃতির একমুখী গতি-কল্পনা ছেড়ে বেরিয়ে একমাত্রিক যাত্রাপথে অনুন্নতের উন্নত দ্বারা প্রতিস্থাপনের ঐতিহাসিক অনিবার্যতার ধারণা থেকে

মুক্ত হওয়া যায়। কোনো নতুন মতবাদ তৈরি করে নয়, মানুষদের মধ্যের কাজ বা চর্চার জগতে বিভিন্নতা ও বহুত্বকে স্বাভাবিক ও কাম্য বলে ধরে নিয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কি আমরা তা করতে পারি না?

মানুষদের মধ্যের কাজ ও চর্চার জগতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষরা তখনই একে অপরকে তখনই অধিকার দিতে পারে এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা পেতে পারে যখন মানুষদের মধ্যের সমস্ত ভিন্নতা, বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্য সমগুরুত্বের বলে গৃহীত হয়, অর্থাৎ বহুত্বকে স্বাভাবিক বলে ধরা হয়। কাজ ও চর্চার জগতের এই পারস্পরিক বোঝাপড়া এমন নয় যে তা একবার সম্পন্ন হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থায়ী চেহারা নিয়ে নিতে পারে, বরং এই বোঝাপড়া ক্ষণিক ও ভঙ্গুর হতে বাধ্য। কাজ ও চর্চার ক্ষেত্রে অনবরত অপ্রত্যাশিত নতুনের মুখোমুখি হতে হতে প্রতিনিয়ত নতুন করে এই বোঝাপড়াকে নবীকৃত করতে করতে যেতে না পারলে, এ বোঝাপড়া ভেঙে পড়বেই এবং মানুষদের অধিকার ও সমানাধিকারও লঙ্ঘিত হবে। মানুষদের এমন এক বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক সক্রিয়তার মধ্য দিয়েই সমানাধিকার প্রতিনিয়ত পুনর্নবীকৃত হতে হতে যেতে পারে যা বহুত্বকে স্বাভাবিক ও শ্রেয় রূপে গণ্য করে অপরাপরের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলে। কোনো মতবাদের শক্তি দিয়ে কেন্দ্রীভূত কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতার বলে মানুষদের অধিকার ও সমানাধিকারকে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার কোনো লক্ষ্য-নির্ধারিত কর্মসূচি নয়, বরং নিয়ত পরিবর্তমান চর্চার উপজাত হিসেবে অধিকার ও সমানাধিকার প্রতিনিয়ত অর্জন করা ও রক্ষা করা—পরস্পরের প্রতি এমন একটি অঙ্গীকারকে আমরা বহুত্বের রাজনীতি বলতে পারি, যা ক্ষমতা-আধিপত্যের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জায়গা করে দিতে পারে।

১১

সর্বজ্ঞ মতবাদ, কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কাঠামো—এইসবের বদলে আমরা যদি মানুষদের মধ্যের কাজ ও চর্চার ক্ষেত্রে বহুত্বের রাজনীতির ভিত্তিতে অপরাপরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমাদের সমাজ-আকার আমূল বদলে যাবে।

একালের নৈর্ব্যক্তিক, যান্ত্রিক, অতিকায় ও সার্বিক শক্তিশালী রাষ্ট্র-এর কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্রের কারাগারের বদলে মুক্ত-সম্বন্ধিত অপরাপরের মধ্যে সম্মান, সমানাধিকারের স্বীকৃতি ও নিত্য-নবীকৃত অঙ্গীকার-এর বিকেন্দ্রীভূত স্বাধীন চর্চার পরিসর গড়ে উঠতে পারে।

সর্বাত্মক শক্তিশালী রাষ্ট্র তার কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতার প্রয়োজনে ভাষাক্ষেত্রে ভাষিক পুঁজির জন্ম দেয় রাষ্ট্রীয় ভাষা বা সরকারি ভাষা হিসেবে একটি বা কয়েকটি ভাষাকে চিহ্নিত করে। মুক্ত-সম্বন্ধিত বিকেন্দ্রীভূত স্বাধীন চর্চার পরিসরে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সমতার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ প্রতিটি ভাষাকে সমাজ-ব্যবহারের সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেবে, ফলে ভাষিক পুঁজি জন্ম নিতে পারবে না।

কেন্দ্রীভূত শাসনে জ্ঞানোৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকেই প্রমিত ধরে নিয়ে জ্ঞানোৎপাদনের অন্য সমস্ত প্রক্রিয়াকে যেহেতু অস্বীকার করা হয়, তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা আবশ্যক হয়ে ওঠে। জ্ঞানোৎপাদনের একটি প্রক্রিয়াকে একমেবাদ্বিতীয়ম করে তোলার ফলে আধিপত্যকারী ভাষা (যা সেই জ্ঞানোৎপাদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাড়তি সুবিধা ভোগ করে। তাছাড়াও কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখার প্রয়োজনও শিক্ষার ভাষা-মাধ্যমকে হাতে গোনা কয়েকটি ভাষার বাইরে বাড়তে দিতে পারে না। অন্যদিকে, মুক্ত-সম্বন্ধিত বিকেন্দ্রীভূত স্বাধীন চর্চার পরিসরে জ্ঞানোৎপাদনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সবগুলোই যেহেতু সমমর্যাদায় স্বীকৃত হবে, শিক্ষাপ্রক্রিয়ার পক্ষেও আবশ্যিক হয়ে উঠবে বিভিন্ন ভাষায় সঞ্চিত জ্ঞান ও জ্ঞানোৎপাদন প্রক্রিয়াকে তার অলিন্দে মুক্ত-সম্বন্ধে বিরাজ করতে দিতে। ফলে, শিক্ষাপ্রক্রিয়া তার ভিতরের তাগিদেই বহুভাষিক হয়ে উঠবে, কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের শিকলও খুলে পড়বে। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দায় না থাকায় শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে প্রতিটি ভাষার ব্যবহার স্বতঃ স্ফূর্তভাবেই সম্ভব হবে।

১২

এই ভাবনাগুলো ভাবনার সুতোই, তার বেশি কিছু নয়। এই সুতোর বিন্যাসে টানা-পোড়েন জুড়ে ভাবনার বুননকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন পাঠকরা

তাঁদের ভাবনা হাজির করার মধ্য দিয়ে। অন্যতর উপস্থাপনা, মতখণ্ডন বা অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতার পথ দেখানো—পাঠকদের এমত সহযোগিতার প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনাটি আপাতত এখানেই অসমাপ্ত রইল।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৭

সহায়ক পাঠ

উপরোক্ত ভাবনাসূত্রে সূত্রকারে উপস্থাপিত কিছু ভাবনার বিশদ রূপ বা ব্যাখ্যা যে সহায়ক পাঠের মধ্য দিয়ে পাওয়া সম্ভব তার কিছু উল্লেখ এখানে রইল:

১. লিভিং ল্যাংগুয়েজ, অ্যান ইনট্রোডাকশন টু লিংগুয়িস্টিক অ্যানথ্রোপোলজি। লেখিকা: লরা এম অ্যাহার্ন। প্রকাশক: উইলি-ব্ল্যাকওয়েল। প্রকাশনাকাল ২০১২। (ভাষার সঙ্গে মানুষদের কাজ বা চর্চার সম্পর্ক, ভাষা ও ক্ষমতা-আধিপত্যের রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার সারসংক্ষেপ এখানে আছে।)

২. ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড সিম্বলিক পাওয়ার। লেখক: পিয়ের বোর্দো, মূল ফরাসি থেকে ইংরেজি অনুবাদ: জি রেমন্ড ও এম আদমসন। প্রকাশক: হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। প্রকাশনাকাল ১৯৯১। (ভাষিক পুঁজির ধারণার তাত্ত্বিক অবতারণা ও বিস্তার এখানে আছে।)

৩. হানা আরেন্ট, এ রিইনটারপ্রিটেশন অফ হার পলিটিকাল থট। লেখিকা: মার্গারেট কানোভান। প্রকাশক: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। প্রকাশনাকাল ১৯৯২। (হানা আরে-এর রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে এই আলোচনা থেকে মতবাদিক রাজনীতির সর্বাত্মকতাবাদ ও তার বিপরীতে বহুত্বের রাজনীতি সম্পর্কিত চিন্তার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। উৎসাহী পাঠকরা অবশ্যই হানা আরেন্ট-এর মূল বইগুলোও দেখতে পারেন।)

ভাষিক মানবাধিকার ও শিক্ষা

আলমা ফ্লোর আদা

[নিবন্ধটির লেখিকা সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসাংস্কৃতিক কর্মসূচির গবেষণা বিভাগের অধিকর্তা। বহুসাংস্কৃতিক ও বহুজাতিক জনগোষ্ঠী নিয়ে যেসব শিক্ষকরা কাজ করেন তাঁদের প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দেওয়া শ্রীমতী আদার কাজ। শ্রেণিকক্ষে দ্বিভাষিক শিক্ষায় ব্যবহৃত, শিশুদের ও শিক্ষকদের জন্য প্রচুর বই তিনি লিখেছেন। এখানে কয়েকটি প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে তিনি বহুভাষিক শিক্ষার অভাবে আমেরিকার অভিবাসী অন-ইংরেজি ভাষীদের সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন]

- আমার বাড়িতে ছুতোরমিস্ত্রির কাজ চলছিল। এক মেকসিকান তরুণ মিস্ত্রি রোজই আমাকে জিজ্ঞাসা করত, আমার ছেলেমেয়েরা কতটা হিস্পানি ভাষা বলতে পারে। প্রশ্নটার মধ্যে যে ব্যগ্রতা ছিল তাতে আমি অবাকই হতাম। অবশেষে একদিন গভীর আবেগের সঙ্গে সে বলল, ‘সেদিন আমার মা গত হলেন, একেবারেই আচমকা। এখন আমি বুঝতে পারছি, তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতাম না। আমি মায়ের সঙ্গেই বাড়িতে থেকেছি, অথচ কোনোদিনই তাঁর সঙ্গে আসলে কোনো কথাই বলিনি। সাত ভাইবোনের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে ছোটো, তাই তাঁর সঙ্গে হিস্পানিতে কোনো কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না। আমি সবসময় ইংরেজিতে কথা বলতাম। আশপাশে কেউ না কেউ থাকত যে কথাটা বুঝে নিত। আমিই শুধু শেষপর্যন্ত বাড়িতে থেকে

গিয়েছিলাম। আমি বুঝি মা আমাকে ভালোবাসতেন, তিনি আমার জন্য রান্না করতেন, আমার জামা-কাপড় ইস্ত্রি করতেন, রোজ আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কখনও কোনোদিন কোনো কথা হয়নি, কারণ তিনি তো শুধু হিস্পানিই জানতেন। আমি এখন ভাইবোনদের কাছে কাকুতিমিনতি করে মায়ের স্মৃতির টুকরো কুড়িয়ে নিই। মা কী ছিলেন, কী ছিল তাঁর ভাবনাচিন্তা, তাঁর অনুভূতি, তাঁর স্বপ্ন—কিছুই আমার জানা নেই, এটা আমার অসহ্য মনে হয়। আমাকে কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু এ কষ্ট আমার অসহ্য। আমি শুধু নিজেকে প্রশ্ন করি, কেন ছেলেবেলায় আমি হিস্পানি শিখিনি।'

- আমার একটা কর্মশালার শেষে এই বৃত্তান্তটা শুনেছিলাম। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার এক স্কুল প্রশাসক গল্পটা বলেন। তাঁর জার্মান মা কলেজে পড়াতেন। সুশিক্ষিত, ইংরেজিও সাবলীলভাবে বলতে পারতেন। এই পরিবারটি জার্মানি থেকে আমেরিকায় আসার পর প্রশাসক মহিলা ও তাঁর তিন বোন জার্মান বলা বন্ধ করলেন। একসময় ভাষাটা ভুলেও গেলেন। বাড়িতে সব কথাবার্তা ইংরেজিতে হত। কোনো কিছুর অভাববোধ করছেন, কখনও তা মনেই হয়নি। অবশেষে বুঝলেন। তাঁদের মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে কোমায় চলে গেলেন। যখন তাঁর চেতনায় ফেরার আশা ছেড়ে দিয়ে এই বিয়োগবেদনাকে তাঁরা সামলে নিচ্ছেন, তখন একদিন মায়ের চেতনা ফিরল। মা এক একজন মেয়ের দিকে আকুলভাবে তাকিয়ে মৃত্যুর আগে গড়গড় করে অনেক কথা বলছিলেন। সবাই আন্দাজ করতে পারছিল মায়ের কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মার ভাষা কেউ বুঝতে পারল না। তাঁদের শৈশবের শেখা জার্মানে মা শেষ কথাগুলো বলছিলেন। কিন্তু তারা সে-ভাষা পুরোটাই ভুলে গেছে।
- নিউইয়র্কে আমার এক বন্ধু ছিল। মেয়েটি বাবার একমাত্র সন্তান। প্রাজ্ঞ বাবাকে সে খুব ভালোবাসত, শ্রদ্ধাও করত। হঠাৎ একদিন দেখা গেল বাবার সঙ্গে কোনো সংলাপ চালানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সারা জীবন আমেরিকায় কাটানোর পর বৃদ্ধ বাবা

আবার ফিরে গেছে ইদ্দিস ভাষায়। এ ভাষা সে ছোটোবেলায় শুনেছে বটে কিন্তু কখনোই বলতে শেখেনি।

- সিয়াটেলের এক মেক্সিকান মা খুব দুঃখ ও যন্ত্রণা নিয়ে জানালেন, তিনি তার কিশোর ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। মা শুধু হিস্পানি ভাষাই বলতে পারেন। কিন্তু ছেলে হিস্পানি কতটা ভুলেছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাঁর ছিল না, কারণ বড়ো মেয়ে তাঁর আর ছেলের মধ্যে দোভাষীর কাজ করত। মা ভেবেছিলেন বেশির ভাগ ছেলেছোকরার মতো তাঁর ছেলেও ইংরেজি বলতেই পছন্দ করে। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে, ছেলে হিস্পানি বলার ক্ষমতা পুরোটা হারিয়ে ফেলেছে। ইতিমধ্যে ভারসাম্য রেখে দ্বিভাষিক হয়ে বড়ো হয়েছে যে-মেয়ে সে কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল। অন্যদিকে, কিশোর ছেলেটিকে হাইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিকল্প বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালানোর জন্য কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিল। ছেলের অনুভূতি কেমন, কী সে ভাবছে, মা সেটা বোঝার উপায় খুঁজে পেলেন না। অন্যদিকে, ছেলেটাও মা যে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে বা পাশে দাঁড়াচ্ছে, মায়ের সেই ভাষা বোঝার ক্ষমতা হারিয়েছে।
- পোর্টল্যান্ডের একদল ভিয়েতনামি বাবা-মা (দোভাষীর মাধ্যমে) তাঁদের ছেলেমেয়েদের কী-দশা হয়েছে সেটা বলছিলেন। তাঁদের কথায়, তাঁরা অনুমানও করতে পারেননি সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের ভাষাবিচ্ছেদের ফলে পারিবারিক ইতিহাস ও মূল্যবোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা যাবে না। পরিণামে সন্তানরা বাবা-মায়ের থেকে অনেক দূরে সরে যাবে, গেছেও। এমনটা আগে জানলে কখনোই তাঁরা আমেরিকায় আসতেন না। 'একটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে আমরা আমাদের সন্তানদের হারাতে চাইনি, অথচ একটা ঘোষিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমরা তাদের পুরোপুরি হারিয়ে ফেললাম।'
- মেধাবী এক মেক্সিকান-আমেরিকান ছাত্র স্কুল থেকে পাশ করার পর তার পছন্দসই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারল না। কারণ, দ্বিতীয় ভাষায় সে যথেষ্ট সবল নয়।

- পুয়ের্টোরিকান ইঞ্জিনিয়ারটির বদলে চাকরিতে পদোন্নতি হল এক আমেরিকানের যে সেভিলে এক বছরের একটা স্প্যানিশ কোর্স করেছে।

বাপ-মায়ের অধিকার

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার কী বাবা-মায়ের আছে? বাবা-মা ও আত্মীয়রা যাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পারিবারিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বদৃষ্টি সঞ্চারিত করতে পারেন সেজন্য তাঁদের ভাষা সংরক্ষণের অধিকার কী সন্তানদের আছে? সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর এই মানবাধিকার কী আছে যাতে তাঁরা তাঁদের সংস্কৃতির সবচেয়ে মৌলিক উপাদান—তাদের ভাষা—রক্ষা করতে পারে? কোনো ছাত্রের ঘরের ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় বা জীবিকার ভাষা না হতেই পারে, সেখানে বিদ্যালয়স্তরে কর্তৃপক্ষ কি সে-ভাষাকে হারিয়ে যেতে দিতে পারে? সেটা কি নীতিসঙ্গত বা আইনসম্মত?

মনে হতে পারে এ-সব প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় ও উদ্ভট, কিন্তু তা নয়। ১৯৯৫ সলে টেক্সাসের এক জজসাহেব রায় দিলেন যে মায়ের পক্ষে শিশুর সামনে মাতৃভাষায় কথা বলা শিশুনির্যাতন বলে গণ্য হবে এবং মাকে এমন কাজ করতে নিষেধ করলেন। যদিও এই রায় আপিলে নাকচ হয়ে যায়, তবু কোনো জজ যে আদৌ এমন রায় দিতে পারেন সে কালি কীভাবে মুছবে? এভাবেই জোরালো আর্থিক সমর্থনে 'শুধু ইংরেজি' আন্দোলন চলছে।

মানব-ভাষার বিকাশ মানবজাতির শীর্ষকৃতিত্বের একটি কীর্তি। চিন্তা ও অনুভূতির প্রকাশ ও নতুন নতুন আবিষ্কার করতে সক্ষম প্রতিটি ভাষা হাজার হাজার বছরে এক একটা সুসংহত ব্যবস্থা হিসেবে বিকশিত হয়েছে, যা আছে তা বর্ণনা করার আর যা কোনোদিন ছিল না তার স্বপ্ন দেখার হাতিয়ার ভাষা। ভাষার আধারেই আমরা অতীতকে রক্ষা করি। প্রতিটি প্রজন্ম একটা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের স্বাদ পায়, ভাষার মাধ্যমেই আমরা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ চালাই এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য নানা প্রকল্পের উদ্ভাবন করি।

যেকোনো ভাষা লুপ্ত হয়ে যাওয়া গোটা মানবজাতির পক্ষেই মারাত্মক ক্ষতি। কোনো ভাষার সংস্পর্শে এলে সে-ভাষা শেখার সুযোগ নষ্ট করা একটা

বড়ো অপচয়। মাতৃভাষা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা মহা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। ভাষিক মানবাধিকারকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুভাগে দেখতে হবে। ভাষিক অধিকারগুলো ভাষা সম্প্রদায়কে টিকে থাকার রসদ জোগায়, আর ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।

ভাষাবিদ্বেষ (Linguicism)

অন্য ভাষাগুলির ওপর কয়েকটা ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে যে জাতিবিদ্বেষী (Racist) মনোভাব গড়ে উঠেছে তার অভিঘাতে ভাষিক মানবাধিকারগুলো বিপন্ন হয়ে পড়েছে। অন্তর্গত ক্ষমতার বিচারে সব ভাষাই যোগাযোগের সমান কার্যকরী হাতিয়ার। ভাষাগুলোর মধ্যে যে পার্থক্য তার মূলে আছে বাচকদের ইতিহাস ও প্রয়োজন। অন্যদের চেয়ে কোনো কোনো ভাষার আপাত-শ্রেষ্ঠত্ব[বাচকসংখ্যার আধিক্য, পেশাদারি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা ইত্যাদি] কোনোভাবেই ভাষিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন নয়, ক্ষমতা ও সম্পদের প্রতিফলন। প্রযুক্তি, বিজ্ঞানচর্চা বা কূটনীতিক কাজকর্ম—এরকম যেকোনো ক্ষেত্রেই, বাচকদের প্রয়োজন অনুযায়ী, পৃথিবীর যেকোনো ভাষা ব্যবহার করার যোগ্য। এসব ক্ষেত্রে কোনো কোনো ভাষাকে যে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়, তার কোনো ভাষিক ভিত্তি নেই, আছে শুধু ক্ষমতার ভিত্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা অথবা দুটোই।

বৈষম্য উসকে দেওয়া ও টিকিয়ে-রাখার জন্য যে-সব যুক্তি ও কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তাদের ভিত জাতিবিদ্বেষ। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের ন্যায়বহির্ভূত বণ্টনকে ভাষাশ্রেষ্ঠত্বের ধারণা মান্যতা দিতে চায়। টোভ স্কুটনাব কাঙ্গাস এবং রবার্ট ফিলিপসন কোনো কোনো ভাষার বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বিরূপতার নাম দিয়েছেন Linguicism বা ভাষাবিদ্বেষ।

ভাষা এমন একটা সম্পদ যা নিজেদের বুঝতে, অন্যদের সঙ্গেও বোঝাপড়ার জন্য অনন্য। সংজ্ঞাপন ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের জন্যও দরকার এই ভাষিক সম্পদ। শিক্ষার জন্যও চাই ভাষিক সম্পদ। একটা ভাষা যদি সম্পদ হয়, তবে দুই বা তার বেশি ভাষায় অধিকার তো দ্বিগুন সম্পদ, বহুমাত্রিক সম্পদ। 'দুটো ভাষা বলতে পারার চেয়ে একটা ভাষা বলতে পারাই ভালো'—এমন কথার

পক্ষে কোনো সুস্থমস্তিষ্কপ্রসূত যুক্তি নেই। একভাষী লোকেদের মধ্যে পৃথিবী সম্বন্ধে এক-বগ্‌গা দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। দ্বিভাষিকদের সামনে থাকে পৃথিবী সম্বন্ধে দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি। বহুভাষিক মানুষের সামনে খুলে যায় বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বকে দেখার মানবীয় অভিজ্ঞতা। নানা ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে সংজ্ঞাপনের সুযোগ ঘটে নানাভাষা জানলে।

ভাষা শেখা

মানবশিশুর ভাষাশিক্ষা শৈশবে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। প্রক্রিয়াটা দীর্ঘ, কিন্তু শিশুরা এই শিক্ষার জন্য সহজভাবেই তৈরি থাকে। যখন শিশু দেখতে পায় ভাষার সাহায্যেই সে যোগাযোগ তৈরি করতে পারে তখন তার ভাষা শেখার চেষ্টাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। তারা ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে তার সুফল পায়, উৎসাহও পায়। ভাষাটার গায়ে যদি হীনতার দাগ লেগে না থাকে তবে সেই ভাষার নিয়মিত সংস্পর্শে মোটামুটি ছ-বছর বয়স পর্যন্ত কাটালে ভাষাটিতে প্রায় পুরো দখল এসে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, শিশুটি যদি দেখে তার ভাষাকে (সংখ্যালঘু ভাষা) ক্ষমতার ভাষার তুলনায় হেয় জ্ঞান করা হচ্ছে, অথবা তাকে বিশ্বাস করানো হচ্ছে যে উঁচুমানের ভাষাটাকেই বেছে নিতে হবে, তখন প্রায়ই দেখা যায় বাড়ির ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা তার হারিয়ে যাচ্ছে। নিজের অস্তিত্বের একটা অংশকে অস্বীকার করার যন্ত্রণার ফলে অনেক সময় ভবিষ্যতে ভাষাটা আবার ফিরে পাওয়ার ক্ষমতাটাও হারিয়ে যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটা সাধারণ মনোভাব হল, 'অভিবাসীদের ঘরের ভাষা বজায় রাখতে বা প্রসার ঘটাতে পারো বটে, তবে তার দায়িত্ব তোমাদের বাবা-মার। স্কুলের দায়িত্ব ইংরেজি শেখানো।' ঘরের ভাষা কচিকাঁচাদের ঘরেই শেখাতে হবে, এই যুক্তি যে ভুল তার বড়ো প্রমাণ ইংরেজি শেখানোর ক্ষেত্রে স্কুলের ভূমিকা। ইংরেজিভাষী বাচ্চাদের শিশুশ্রেণি থেকে কলেজ পর্যন্ত প্রচুর সময় ইংরেজি শেখানোর জন্য ব্যয় হয়। তারা মনেই করে না যে বাবা-মা'র দায়িত্বে বাড়িতেই মাতৃভাষা শেখানো যায়। যদি তাই মনে করত, তবে আর ইংরেজি শেখানোর জন্য স্কুলে প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষক, প্রচুর পয়সা ঢেলে পাঠ্যক্রম ঠিক করা আর পাঠ সহায়ক উপকরণ জোগান দেওয়ার দরকার হত না।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্কুলের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। বড়ো পরিবার আর নেই, প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত অল্পবয়সীদের মধ্যে অন্য ধরনের আগ্রহ ও চাহিদা তৈরি করেছে তা ছাড়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যাওয়ায় একদিকে পাঠ্যক্রমের আয়তন বেড়েছে, অন্যদিকে জীবিকার বাজারে প্রতিযোগিতায় নামার জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্য আরো ভয়াবহ হয়েছে, সামাজিক অপরাধ ও অসুস্থতা আতঙ্কে পরিণত হয়েছে।

ঠিক এসব কারণেই স্কুলগুলোর পক্ষে পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া অনুচিত, বরং স্কুলের প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবারকে সার্থকভাবে যুক্ত করা দরকার। বাড়ির ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখে উন্নয়ন ঘটানোকে একটা বাড়তি বোঝা হিসেবে না দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত একাজে অগ্রাধিকার দেওয়া। পড়ুয়াদের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের একটা উৎস হিসেবে দেখা। গবেষণায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে, যে-সব পড়ুয়া মাতৃভাষা ভুলে গেছে তাদের চেয়ে যারা মাতৃভাষা বজায় রাখতে পেরেছে, সমান পরিস্থিতিতে তাদের সাফল্যের সুযোগ বেশি। মাতৃভাষার পাশাপাশি একটা দ্বিতীয় ভাষা, এমনকি, তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষা যুক্ত করায় শিক্ষা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়। সংবর্ধক দ্বিভাষিকতার (Additive bilingualism—*দুটি ভাষা পাশাপাশি এলে শব্দভাণ্ডার সহ যে ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে তার পক্ষে এই দ্বিভাষিকতা শুভ ফলদায়ক। এধরনের দ্বিভাষিকতাকে সংবর্ধক দ্বিভাষিকতা বলা হয়। বিপরীতটিকে বলা হয় subtractive বা বিয়োজক দ্বিভাষিকতা।—টীকা অনুবাদকের*) একাধিক মনস্তাত্ত্বিক অবদান আছে, যেমন এতে চিন্তনের নমনীয়তা বাড়ে। নতুন নতুন সমস্যা ও বাধার সম্মুখীন হওয়া ও সমাধান করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিশুর বিশ্বদৃষ্টি প্রসারিত হয়। চিন্তন প্রক্রিয়া এখানেই থেমে থাকে না, ভাষাদক্ষতা সঞ্চারিত হয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে। পূর্বার্জিত জ্ঞান নবার্জিত জ্ঞানকে পুষ্ট করতে সহায়তা করে।

বিপরীত প্রক্রিয়ার ফল কী হয় তা আমরা সাধারণত দেখে থাকি। প্রথম ভাষা (মাতৃভাষা)-কে অন্য ভাষা দিয়ে উৎখাত করলে নানা সমস্যা দেখা দেয়, যেমন—আত্মপরিচয় হারিয়ে যেতে থাকে, বাবা-মা-পরিবার ও সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষোভ ভেতরে স্থায়ী আকার নেয়। ভাষিক অনিশ্চয়তা ও লেখাপড়ার সমস্যা তো থাকেই। তাছাড়া, এটা ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক।

দুটি ভাষা শেখার সুযোগ শুধু সংখ্যালঘু ভাষার বাচকদের পক্ষেই উপকারী নয়, দ্বিভাষিকতা প্রতিটি শিশুর পক্ষেই একটি আশীর্বাদ।

ছোটো শিশুরা বিশেষভাবে ভাষাশিক্ষার ক্ষমতাসম্পন্ন। যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ছোটো শিশুরা ভাষার ধ্বনিরীতি, রূপরীতি ও বাক্যরীতি শেখে এবং জন্মের পর প্রথম কয়েক বছরেই কয়েক হাজার শব্দ আয়ত্ত করে, তা দেখে ভাষাবিজ্ঞানী ও শিশুবিকাশ বিশেষজ্ঞরা চমৎকৃত হয়ে যান। কচিশৈশবে শিশুরা যতক্ষণ জেগে থাকে তার বেশির ভাগ সময় ভাষা শেখে। চারপাশের দুনিয়াকে বুঝতে, এই বোধকে মস্তিষ্কে সাজিয়ে নেওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ভাষা। এই হাতিয়ারের সাহায্যেই শিশু দুনিয়া সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে তোলে, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। শিশুদের এই সহজাত ক্ষমতাকে কাজে লাগাতেই হবে। যাতে প্রতিটি শিশুর অন্তত একটি দ্বিতীয় ভাষা শেখা নিশ্চিত হয়। আরও ভালো হয় তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষাও যদি তারা শেখে।

মাতৃভাষার সঙ্গে শিশুর আত্মিক সংযোগের ব্যাপ্তি যে কত নিবিড় তা বোধহয় এখনও আমরা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই এই সংযোগের শুরু, যে মুহূর্ত থেকে অ-জাত শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় তৈরি হয়, সে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। মাতৃগর্ভের অ্যামনিওটিক তরল পদার্থ শব্দতরঙ্গের বাহকের কাজ করে। মায়ের কণ্ঠস্বর সাধারণত ঘনিষ্ঠতম ও প্রায় প্রতিনিয়ত শ্রুত শব্দ। মায়ের কণ্ঠস্বরেই নির্দিষ্ট ভাষার উচ্চারণ ও রূপরীতি ধরা থাকে। জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরেই শিশু অন্য অনেক কণ্ঠস্বর থেকে মায়ের কণ্ঠস্বরকে আলাদা করে চিনতে পারে। এই কণ্ঠস্বর সহজাতভাবেই ভাষাটির বিভক্তির সঙ্গে যুক্ত।

শিশুর ভাষাবিকাশের অন্যতম প্রধান চালক উপাদানগুলো হল তাকে উৎসাহিত করা, প্রশংসা করা, সমর্থন দেওয়া আর তার সাফল্য যেগুলো প্রথম শব্দ ও বাক্যগুলো উচ্চারণের সময় সে পেয়েছিল। তারা নতুন কোনো শব্দ বা বাক্যাংশ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা বা আয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা প্রশংসা পায়, তাদের কোলে তুলে নেওয়া হয়, আদর করা হয়। শিশুরা অনেক সময়ই লক্ষ্য করে যে তারা যেটা চায় সেটা শব্দে উচ্চারণ করতে পারলে পাওয়া যায়। কিন্তু যে ভাষা শিশু শেখে সেটা তার একার নয়। এটা বরং বাবা-মা, পরিবার ও ঘরের ভাষা। এ কারণে ভাষা তার আত্মপরিচয়ের চিহ্ন, 'আমিও এদের একজন'—এই বোধের বাহক। কোনো শিশুর ভাষাকে যখন অবহেলা

করা হয়, বিদ্রূপ করা হয়, বাতিল করা হয়, নীচে ফেলে রাখা হয় বা হেয় করা হয়, তখন ভাষার সঙ্গে আত্মিক বাঁধনের ফলে শিশু ও তার পরিবার নিজেদেরই অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বাতিল, নিপীড়িত ও হেয় করা হল বলে মনে করে।

ভাষাবৈচিত্র্যের প্রতি অঙ্গীকার

সমাজ ও বিদ্যালয় শিশু-কিশোরদের দ্বিভাষিকতার মূল্য সম্বন্ধে যে বার্তা আজকাল দিচ্ছে তা মারাত্মক ক্ষতিকারক। [শুধুমাত্র দ্বিমুখী নিমজ্জন এবং বিকাশমূলক দ্বিভাষিকতার কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া] কেন দ্বিভাষিক পাঠদান পড়ুয়ার বাবা-মায়ের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে? অন্য কোনো পাঠ্যবিষয়ে তো এরকম হয় না। বিদ্যালয়ই পুরোটা ঠিক করে, কী হবে পাঠ্যসূচি, কী পদ্ধতিতে শেখানো হবে। আলাদা আলাদা করে অভিভাবকের মতামত তো নেওয়া হয় না অঙ্ক, বানান বা সমাজবিদ্যা পড়ানো নিয়ে। অথচ যখন ভাষাশিক্ষার বিষয়টা আসে স্কুলের কর্তারা কোনো দায়িত্ব নিতে চান না। পড়ুয়া ও অভিভাবকদের কাছে এতে কী বার্তা পৌঁছোচ্ছে?

ধরা যাক, কোনো পড়ুয়া অঙ্ক বা ভূগোলে এগিয়ে থাকা জ্ঞান নিয়ে স্কুলে ভর্তি হল। তাকে কি বলা হয় যা শিখেছ ভুলে যাও ক্লাসে কখনও এগুলোর কথা বলবে না? কিন্তু যারা স্কুলের শিক্ষা মাধ্যম ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলে তাদের বলা হয় ও ভাষা পাশে সরিয়ে রাখো, ওটাকে উপেক্ষা করো। পড়ুয়াদের অঙ্ক বা সরবপাঠ বাতিল করতে বলা হয় না, বরং আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়। অথচ, দ্বিভাষিক শিক্ষা তাদের ক্ষেত্রে বাতিল করা হয় যেন অন্য ভাষায় সাক্ষরতা পরিত্যাজ্য, সেটা ভুলে যাওয়াই ভালো। এভাবে সেই পড়ুয়াদের মাতৃভাষা-জ্ঞানকে স্থবিরতার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয় অথবা মৃত্যুই হয় ওই ভাষাজ্ঞানের ভবিতব্য।

ভাষান্তর: সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০১৭

ইংরেজি পড়ে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে?

রবার্ট ফিলিপসন-এর তত্ত্বায়ন সূত্র ধরে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে কিছু ভাবনা

বিপ্লব নায়ক

১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল একটি বই—রবার্ট ফিলিপসন-এর লেখা 'লিঙ্গুয়িস্টিক ইমপেরিয়ালিজম' (বা বাংলায় 'ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ')। এই বইয়ের বক্তব্য বিষয় ঘিরে পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের ঢেউ ওঠে, এবং এখনও তা উঠে চলেছে ভাষাতাত্ত্বিক, শিক্ষাতাত্ত্বিক, সমাজভাষা-বিজ্ঞানীদের মহলে। তার মধ্য দিয়ে 'ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ' একটি বিতর্কিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণা হয়ে উঠেছে।

এনিয়ে বিতর্ক এখনও অবধি মূলত তাত্ত্বিক মহলে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিতর্কের বিষয় কিন্তু সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে নিত্য সিদ্ধান্ত নিতে হয় এমন নানা প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। যেমন, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিশুদের জন্য কোনটা বেছে নেব—ইংরেজি না মাতৃভাষা (মাতৃভাষা ইংরেজি নয় ধরে নিয়ে)? মাতৃভাষা শেখায় ও ব্যবহারে জোর না দিয়ে ইংরেজি শেখা ও ব্যবহারে চৌকস হয়ে ওঠোর চেষ্টা করাটাই কি উচিত নয়? 'আধুনিকতা', 'অগ্রগতি', 'গোটা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ'—এসব কি ইংরেজি ভাষার গুণেই ছোঁয়া সম্ভব নয়?

হ্যাঁ, এসব নিয়ে আপনাদের প্রত্যেকেরই হয়তো নিজস্ব উত্তর তৈরি আছে। আপনারা হয়ত 'হ্যাঁ' বা 'না'-তে তাই ফিলিপসন কী উত্তর দিয়েছেন তা জেনে নিতে চান আর নিজের উত্তরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চান। মিললে একটা

বেশ তাত্ত্বিক জোর পাওয়া গেল আর না মিললে, ওসব 'তত্ত্ব-ফত্ত্ব' বাস্তবে কাজের নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কিন্তু ফিলিপসন আসলে এমন কিছু চটজলদি উত্তর সরবরাহ করতে চেয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে গেলে আমরা সাধারণত যতটা যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতা সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ায় কাজে লাগাই, ফিলিপসন আসলে সেই যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রশ্ন করে তার অসম্পূর্ণতাগুলোকে উন্মোচিত করে দিয়ে আমাদের যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতা-র জগতের সীমাটাকে ঠেলে বাড়াতে চেয়েছেন। 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর বুঝে নেওয়া মুলতুবি রেখে আসুন রবার্ট ফিলিপসন-এর সেই ভাবনার সীমা ঠেলে সরানোর প্রচেষ্টা অর্থাৎ তত্ত্বায়নের সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর নিজের মতো করেই গ্রহণ-বর্জন করবেন, 'হ্যাঁ' বা 'না'-এর উত্তরে না হয় আবার নিজের মতো করেই পৌঁছবেন।

পাঠকের কাছে প্রথমে এইটুকু বিশ্বাস বা আস্থা ভিক্ষা করে নেব যে আমি রবার্ট ফিলিপসনের বক্তব্য বলে এমন কিছু হাজির করব না যা আসলে তাঁর বক্তব্য নয়। এই ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি কারণ এই লেখায় আমি ফিলিপসনের লেখা থেকে হ্রস্ব-দীর্ঘ উদ্ধৃতির মালা গাঁথার পথে যাব না। তাঁকে পড়ে যেমনটা আমি বুঝেছি, তা আমার বোধমতো নিজের ভাষায় বলব। অবশ্যই আমি কী বুঝেছি ও তারপরও আমার ভাষা কী বলছে, তার মধ্য দিয়ে রবার্ট ফিলিপসনের বয়ানের সঙ্গে পার্থক্য ঘটে যাবেই, তবে সে পার্থক্য উদ্ধৃতি সাজিয়ে দিলেও এড়ানো যায় না। যে পাঠক চাইবেন, তিনি যাতে রবার্ট ফিলিপসনের মূল লেখা পড়ে মিলিয়ে নিতে পারেন, তার জন্য অবশ্যই রবার্ট ফিলিপসনের কোন কোন লেখা পাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আমার এই পরিচিতি-প্রদান প্রয়াস, তার তালিকা লেখার শেষে দিয়ে দেব।

যাই হোক, শিবের গাজন এখানেই শেষ, এবার ধান ভানার পালায় আসা যাক। ধরা যাক এই প্রশ্নটাকে: কীভাবে শিশুদের (এখানে এবং এই আলোচনার সর্বত্র ধরে নেওয়া হবে যে শিশুটির মাতৃভাষা ইংরেজি নয়) ভালোভাবে ইংরেজি শেখানো যায়? ইংরেজি ভাষা শেখানোর প্রতিষ্ঠানসমূহে দীর্ঘদিন ধরে পেশাদার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা সারসংকলন করে রবার্ট ফিলিপসন বলছেন যে, এই প্রশ্নের মান (standard) উত্তর হিসেবে পাঁচটি উপপাদ্য তুলে ধরা হয়:

১. **এক ভাষিকতার উপপাদ্য:** এতে বলা হয় যে পড়ুয়ার মাতৃভাষার সাহায্য না নিয়ে কেবল ইংরেজির মাধ্যমেই ইংরেজি শেখালে তবে ইংরেজি ভালো শেখানো যায়।

২. **খোদ ইংরেজ-এর কাছে শেখার উপপাদ্য:** ইংরেজি যার মাতৃভাষা, তেমন ইংরেজের কাছে শিখলেই ইংরেজি সবচেয়ে ভালো শেখা যায়।

৩. **যত আগে সম্ভব শিখতে শুরু করার উপপাদ্য:** যত তাড়াতাড়ি (অর্থাৎ যত কম বয়সে) ইংরেজি শিখতে শুরু করা যাবে, তত ভালো শেখা যাবে।

৪. **সর্বাধিক সংস্পর্শের উপপাদ্য:** দৈনিক জীবনে যত বেশি বেশি ইংরেজির সংস্পর্শে শিশুকে আনা যাবে, তত সে ভালো ইংরেজি শিখবে।

৫. **বাদ দেওয়া/ত্যাগ করার উপপাদ্য:** ছাত্র যত ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষা (তার মাতৃভাষা) ব্যবহার কম করবে, তত সে ভালো ইংরেজি শিখবে।

'সমান্তরাল রেখা একে অপরকে ছেদ করে না'—এই উপপাদ্যের সত্যতা যেমন আমাদের কাছে প্রশ্নাতীত, তেমনই প্রায় প্রশ্নাতীত উপরোক্ত 'উপপাদ্য'গুলির সত্যতা। তাই ইংরেজি শেখানোর বই আগাপাশতলা ইংরেজিতে লেখা হলে তবেই তাকে 'জব্বর' বলে মনে হয়, মাতৃভাষার সাহায্যে ইংরেজি শেখানোর বইকে নেহাতই 'থার্ড গ্রেড' বলে দিই। তাই ইংরেজি শিক্ষক ইংরেজ হলে আমরা একেবারে ধন্য হয়ে যাই, আর নেহাত তা না হলে ইংরেজদের লেখা ইংরেজি শেখার বই, পাঠবস্তু ('স্টাডি মেটেরিয়াল') বা সিডি স্কুলের বুকলিস্টে দেখলে তবেই আশ্বস্ত হই।

তৃতীয় উপপাদ্য নিয়ে আর বলার কী আছে—একদম 'চার বছর' থেকে ইংরেজি শেখানো হয়নি বলে আমাদের কত ছেলে 'ইংরেজিতে' দুর্বল রয়ে গেল তা নিয়ে তো মিছিল-মিটিং-সই সংগ্রহ আজ অবধি থামতে চায় না! চতুর্থ আর পঞ্চম উপপাদ্য তো প্রতি মুহূর্তে প্রযুক্ত হয়ে চলেছে—শিশুশ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উপর স্কুলে ফরমান জারি হচ্ছে 'ইংরেজিতে' একে অপরের সঙ্গে কথা বলার (ফরমান ভাঙা হলে শাস্তিপ্রদানও হচ্ছে) আর বাবা-মা-রাও ছেলেমেয়েদের 'ব্রেড' খেতে দেন, 'জু'-তে গিয়ে 'টাইগার', 'এলিফ্যান্ট' দেখান...।

এই 'সবার জানা কথা' উপপাদ্যগুলো কি সত্য? হ্যাঁ, রবার্ট ফিলিপসন সেই প্রশ্ন তুলেছেন এবং এগুলি যে 'সত্য' নয় তা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে এই সবগুলোই ভ্রান্ত ধারণা। তা কী করে হতে পারে? একটু ভেবে দেখা যাক।

একজন শিশু জন্মের পর থেকে তার প্রথম বোধোদয়ের বছরগুলোয় তার চারপাশের মানুষজনদের মুখে যে ভাষা শোনে সেই মাতৃভাষাতেই চারপাশের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বোঝে, বস্তুগুলো সম্পর্কে বোধ তৈরি করে। শিক্ষাদানের সময় তার এই স্বতঃস্ফূর্ত জায়মান বোধের সঙ্গে যদি সম্পর্ক তৈরি করা যায়, অর্থাৎ সেই বোধকে ছোঁয়া যায়, তবেই সেই শিক্ষাকে সে তার চারপাশের বস্তু ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজের মতো করে আয়ত্ত করতে পারে। এই ছোঁয়া সম্ভব একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই। কারণ ইংরেজি শব্দগুলি তার স্বতঃস্ফূর্ত জায়মান বোধের অংশ নয়, সেগুলি কোনো বস্তু বা অভিজ্ঞতার 'অনুরণন' তৈরি করে না, কেবল কিছু অবোধ্য 'চিহ্ন' হিসেবে থেকে যায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে শেখালে ইংরেজি ভাষার চিহ্নগুলো বস্তু ও অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে অনুরণনের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, অন্যথায়, ইংরেজির মাধ্যমেই ইংরেজি শেখালে ভাষার চিহ্নগুলো অর্থহীন তাৎপর্যহীন (বা ধূসর অর্থের, ধূসর তাৎপর্যের) এমন কিছু স্মর্তব্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায় যারা বস্তু-অভিজ্ঞতা ও চিন্তার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ফলে ভাষা 'শেখা' হয় না, কিছু ভাষার 'চিহ্ন' মুখস্থ করা হয় শুধু। তাই প্রথম উপপাদ্যটি উপপাদ্য নয়, বিভ্রান্তি।

দ্বিতীয় উপপাদ্যের কথা ধরা যাক। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত জায়মান বোধ-অভিজ্ঞতার জগতকে ছুঁতে পারে একমাত্র সেই শিক্ষক যে নিজে শিশুটির ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের শরিক অথবা সেই পরিবেশে নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণকারী, যা একজন ইংরেজ শিক্ষক কখনোই হতে পারে না। ইংরেজ শিক্ষক ইংরেজি ভালো জানতে পারেন, কিন্তু তিনি শিশুটির ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ জানেন না, তাই তিনি 'ভালো' শিক্ষক হতে পারেন না, তাই দ্বিতীয়টিও একটি বিভ্রান্তি।

এই সূত্র ধরে ভেবে দেখলে আমরা দেখব যে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম উপপাদ্যগুলি ভ্রান্ত তো বটেই, তার উপর শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। কারণ, এগুলোর মধ্য দিয়ে মাতৃভাষার স্বাভাবিক শিক্ষা ও ব্যবহারকে অবরুদ্ধ

করে শিশুটির বস্তু-অভিজ্ঞতার জগতের বিকাশটিকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

তাহলে কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এইটাই যে ইংরেজি শিখতে গেলেও তা 'অনলি ইংলিশ' ফরমান মেনে মাতৃভাষার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে একটি কৃত্রিমভাবে তৈরি একভাষিক (কেবলমাত্র ইংরেজি) পরিমণ্ডলে ভালোভাবে শেখা যায় না, বরং তা প্রকৃত অর্থে শেখা যায় শিশুর স্বাভাবিক ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে পরিকল্পিত মাতৃভাষাকে মাধ্যম করে বহুভাষিক (multi-lingual) শিক্ষার মাধ্যমে। আর 'অনলি ইংলিশ' ফরমানে যখন এভাবে ইংরেজি ভাষাটাকেই আয়ত্ত করা যায় না, তখন সেই ইংরেজি ভাষাকে মাধ্যম করে অন্য সমস্ত বিষয় (ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, সাহিত্য) শিক্ষা দেওয়া তো আরোই অসম্ভব। এ বিষয়ে রবার্ট ফিলিপসন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শিশুদের শিক্ষার উপর নানা গবেষণার ফলকে সামনে এনেছেন। তার থেকে আমরা কী দেখতে পাই? দেখতে পাই যে স্ক্যান্ডিনেভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ভারত, উত্তর আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শিশুশিক্ষার অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণের ব্যাপক গবেষণা চালানোর পর ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদের দল এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে একজন শিশু তার মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভাষা যদি ভালোভাবে ন্যূনতম ছয় থেকে আট বছর শেখে, তবেই সেই দ্বিতীয় ভাষার মাধ্যমে অন্য বিষয় শেখার মতো সক্ষমতা অর্জন করে। তাহলে একবার ভেবে দেখুন তো আমাদের সব ইংরেজি মাধ্যম শিশুশিক্ষার স্কুলগুলোতে কী চলছে? মাতৃভাষাকে অস্বীকার করে, ছাত্রছাত্রীদের ভাষিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করে শ্রেণিঘরের একটি কৃত্রিম 'অনলি ইংলিশ' আবহে বন্দি করে শিশুদের আদৌ কি কিছু শেখানো যাচ্ছে? নাকি তার বোধ-অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক জগতটির ওপর একটি অস্বাভাবিক পক্ষাঘাত আরোপ করা হচ্ছে? চারদিকের বস্তুজগৎ, প্রাণ ও প্রকৃতির সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ তৈরির মধ্য দিয়ে ভাষাশিক্ষা ও অন্য বিষয়ে শিক্ষা শিশুর সত্তাকে যেভাবে ক্রমাগত আবিষ্কারের নতুন গণ্ডি পেরোনোর আনন্দ ও রোমাঞ্চে বিকশিত করতে পারে, তা হচ্ছে না, বরং 'অনলি ইংলিশ'-এর বিজাতীয় বর্মের মধ্যে আটকে গিয়ে শিশুর সত্তা সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ততাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখছে, আবিষ্কার নয়, মুখস্থ করাকেই জ্ঞানার্জনের পন্থা হিসেবে

চিনছে। জ্ঞান তার কাছে স্ব-উদ্যোগে অর্জন করা আনন্দ ও রোমাঞ্চের সামগ্রী নয়, জ্ঞান তার কাছে আসলে গোমড়ামুখো চিকিৎসকের নিদান দেওয়া তিক্ত বড়ি যা তার অক্ষমতা-অপারগতা দূরীকরণকল্পে প্রত্যহ চোখ-নাখ টিপে ধরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গিলে নিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এহেন বিভ্রান্তিগুলো কীভাবে এহেন 'প্রশ্নাতীত উপপাদ্য'-র বেশ ধরে বিরাজ করছে? কেনই বা করছে? রবার্ট ফিলিপসন এই দুই প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর হাজির করেছেন। তাঁর সেই উত্তরগুলো এবার দেখা যাক। বিভ্রান্তিগুলো 'প্রশ্নাতীত উপপাদ্য' হয়ে উঠেছে সামাজিক ঐতিহাসিক এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সেই প্রক্রিয়া হল গোটা বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থাকে সমসত্ত্বতার শৃঙ্খলে বাঁধা কেন্দ্রীভূত এমন এক কাঠামোয় রূপান্তরিত করার প্রয়াস, যেখানে কেন্দ্রটি স্থিত থাকবে ইউরোপ বা আমেরিকায় আর সেই কেন্দ্র থেকেই শিক্ষাপদ্ধতি, শিক্ষার মালমশলা, বইপত্র, মানপত্র সবকিছু সরবরাহ করা হবে গোটা বিশ্বে। এই সরবরাহ অবশ্য মোটেই দান-খয়রাতি নয়, পুরোদস্তুর বাণিজ্যিক লেনদেন ও মুনাফা নিঙড়ানোর খেলা। এই প্রসঙ্গে ফিলিপসন আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের চেয়ার লর্ড নিল কীনক-এর ২০০৬-এর একটি লিখিত মন্তব্য: 'The English language teaching sector directly earns nearly £ 1.3 million for the U.K. invisible exports and our other education-related exports earn up to £10 billion more.' ['ইংরেজি ভাষা শেখানোর শাখা ইউ.কে. (ব্রিটেন)-র জন্য (বছরে) ১৩ কোটি পাউন্ড অদৃশ্য রফতানি অর্জন করে আর অন্যান্য শিক্ষা-সম্পর্কিত রফতানি থেকে আমাদের আয় হয় আরও ১০০ কোটি পাউন্ড।] বোঝাই যাচ্ছে যে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ব্রিটিশ-আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গোটা বিশ্বজুড়ে ইংরেজি ভাষা বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য শিক্ষা-সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ভাড়া খাটানোর ব্যবসা ও ইংরেজি-মাধ্যম-শিক্ষাসত্র বিক্রির ব্যবসা বেশ ধরে-কষে চালাচ্ছে। আর এই ব্যবসার বাজার তৈরি করার জন্য আমাদের পূর্বালোচিত বিভ্রান্তিগুলোকে উপপাদ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া খুবই জরুরি।

প্রতিষ্ঠা দেওয়া জরুরি হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি যা খুশি যখন খুশি তখন প্রতিষ্ঠা করা যায়? ইংরেজরা বলল, আর বাকি সবাই বোকার মতো মেনে নিল—এতই কি সহজ? না, এতো সহজ নয়। ইংরেজরা চালাকি করে

সবাইকে বোকা বানিয়েছে তা নয়। এই ইউরোপ-আমেরিকা কেন্দ্রীক কেন্দ্রীভূত শিক্ষাকাঠামো বা শিক্ষা ব্যবসার কাঠামো তৈরি হয়েছে দীর্ঘ এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যে প্রক্রিয়া হল ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের রক্তাক্ত হিংস্র ইতিহাস। এই রক্তাক্ত হিংস্র ইতিহাসে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়ার অসংখ্য জনজাতিকে গণনিধনের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে, আধিপত্য ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে ইউরোপমুখী রাষ্ট্র তৈরি করা হয়েছে, সেই রাষ্ট্র চালিয়েছে প্রথমে সরাসরি ইউরোপীয়রা ও তারপর ক্রমশ ইউরোপীয় শিক্ষা ও ভিক্ষাসত্রের মধ্য দিয়ে তৈরি করা গায়ে গতরে দেশীয় অথচ মতাদর্শে ইউরোপীয় শাসকরা। এর মধ্য দিয়ে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়ার অসংখ্য জনজাতির ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জ্ঞান, প্রকৃতিচেতনা ও বোধ সমেত। আর যে ভাষা-সংস্কৃতিগুলি টিঁকেও থেকেছে, তাদের ওপর চালানো হয়েছে বৌদ্ধিক সন্ত্রাস—বর্ণীকরণের নামে তাদের উপর 'পশ্চাৎপদ', 'অসভ্য', 'বুনো', 'পচা-গলা' অভিধা আরোপ করে সমাজ-সংগঠনে, রাজনৈতিক-ব্যবস্থা সংগঠনে ও জ্ঞান উৎপাদনে তাদের ভূমিকা নাকচ করা হয়েছে। ইউরোপীয় ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতির আদলে সমাজ-সংগঠন, রাজনৈতিক- ব্যবস্থা ও জ্ঞান উৎপাদনই একমাত্র অনুমোদনীয় করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞান-উৎপাদন, শিক্ষা-সঞ্চার ও সমাজ-সংগঠনের বহুবিধ সম্পদগুলো ধবংস হয়েছে, ইউরোপ-আমেরিকা কেন্দ্রীক কেন্দ্রীভূত ধাপবন্দি কাঠামো তৈরি হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই গোটা বিশ্বে ইংরেজি ভাষা তার 'ভাষিক পুঁজি' সঞ্চয় করেছে, অর্থাৎ ইংরেজি হয়ে উঠেছে সেই ভাষা যা আয়ত্ত করলে সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতাধারীদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় অথবা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশের আবেদনপত্র জমা দিয়ে রাখা যায়, আর সেই ভাষা আনায়ত্তে সেই প্রকোষ্ঠের বাইরে চির-নির্বাসন বরাদ্দ হয়। ইংরেজি ভাষার 'ক্ষমতা' আসলে গোটা বিশ্বজুড়ে বিন্যস্ত করা ক্ষমতার চরম কেন্দ্রীভূত ধাপবন্দি প্রসার থেকেই পুষ্টি সংগ্রহ করছে আবার ফিরে সেই প্রসারকেই পুষ্ট করছে। ক্ষমতার এই চরম কেন্দ্রীভূত ধাপবন্দি প্রসার তার মতো করে 'জগতকে দেখার ও জগতকে দেখানোর' যে মতবাদ নির্মাণ ও আরোপ করে চলেছে তার প্রতিটি অংশের কলকব্জার কাজের মধ্য দিয়ে, সেই মতবাদের অংশ হল

'ইংরেজি শিক্ষা' নিয়ে ওই পাঁচটি বিভ্রান্তি যা আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই গোটা প্রক্রিয়াটিকেই ফিলিপসন নাম দিয়েছেন 'ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ'।

রবার্ট ফিলিপসন এই তত্ত্বায়ানের মধ্য দিয়ে মূল যে প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছেন তা হল এই: আমরা কী বেছে নেব? বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত ধাপবন্দি নির্মাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত একভাষিক 'অনলি ইংলিশ' শিক্ষা, না কি, জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানউৎপাদনকে বহুত্বের আকাশে মুক্তি দিতে পারে যে মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক (multilingual) শিক্ষা, তা? আসলে এ তো কেবল শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি ঠিক করার বিষয় নয়, এ আসলে কোন বিশ্বে আমরা বাস করতে চাই তারও বিষয়। অথবা একটু ভুল বলে ফেললাম, ব্যাপারটা ঠিক 'বেছে নেওয়ার' নয়। কারণ, প্রথমটি এখন প্রায় সর্বময়ভাবে হাজির, আর দ্বিতীয়টি নেই বললেই চলে। তাই একই স্তরে হাজির দুটি বিষয়ের মধ্যে পছন্দ করার ব্যাপার এ নয়, যদি দ্বিতীয়টি পছন্দ হয় বা সমীচীন বলে মনে হয়, তাহলে সময়ের স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তা গড়ে তোলার দায়িত্বও আমাদেরই নিতে হবে। তাই ভেবে দেখুন, সময় নিয়ে সব মিলিয়ে ভাবুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

পাঠকদের কাছ থেকে এই যাত্রায় বিদায় নেওয়ার আগে শেষ নিবেদন রূপে বিবেচনার জন্য আমাদের পূর্বজ এক ভাবুকের বক্তব্য উদ্ধৃত করে যাব। তাঁর নাম বুদ্ধদেব বসু। তিনি বাংলা ভাষার সাহিত্য জগতের যেমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তেমনই ইংরেজি ভাষার পণ্ডিত ও শিক্ষক হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। ১৯৪৫ সালে লেখা 'স্বদেশ ও সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধ তিনি শেষ করেছিলেন এইভাবে:

> যতদিন আমাদের বিশ্বাস থাকবে যে জ্ঞানবিজ্ঞান বাণিজ্যের পক্ষে ইংরেজি আমাদের অপরিহার্য অবলম্বন, ততদিন কোনো ভারতীয় ভাষা ও-সব বিষয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেই না। আজকের দিনে আমাদের শিক্ষিত সমাজ ইংরেজিতে অভিজ্ঞ,তাই বিদেশিরা বহুকাল ধরে এ-দেশে বাস করেও আমাদের ভাষা শেখবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না। ভারতভূমিতে ইংরেজি ভাষার স্থায়িত্ব সর্বান্তকরণে কামনা করি, তবু একথাও ভাবি যে আমরা যদি কোনোদিনই ইংরেজি না ভুলি, তাহলে ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশিদের আমাদের ভাষা শেখার গরজ হবে কেন, আর তা যদি না হয়, তাহলে, কবে তাদের সঙ্গে আমাদের বৃহত্তর

মানসবিনিময় আরম্ভ হবে? এখন পর্যন্ত আমাদের দেশ থেকে এ-ধারণা একেবারে দূর হয়নি যে ইংরেজি যে জানে না, সে-ই অশিক্ষিত। আমাদের মনের দাসত্বেরই পরিচয় এটা। শিক্ষা বলতে যতদিন আমরা ইংরেজি ভাষার পরিচয়মাত্র বুঝব, ততদিন শিক্ষা আমাদের জীবনের মধ্যে সত্য হতে পারবে না। ইংরেজি ভালো, কিন্তু ইংরেজির প্রতি ঐকান্তিক আনুগত্য ভালো না। সেটি আমাদের পক্ষে বিদেশি ভাষা, এই কথাটি উপলব্ধি করা চাই। যত্ন, প্রীতি, অধ্যবসায়—বিদেশি ভাষাকে যা-কিছু দেয়, তা-ই ইংরেজিকে দেব আমরা—আর শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার জন্যই উৎসুক ও প্রস্তুত হয়ে থাকব। এইভাবে বিশ্ব সাহিত্যের বহু ও বিচিত্র ধারা আমাদের চিত্তে এসে মিলিত হবে, ইংরেজির সঙ্গে অতি-সান্নিধ্যের অবরোধ ভেঙে আমরা জগতের পথে যাত্রী হতে পারব। তখনই পশ্চিমের সাহিত্যকে স্পষ্ট ও সত্য করে উপলব্ধি করার শক্তি হবে আমাদের, এবং নিজের সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের দৃষ্টি অন্ধ ভক্তি ও অন্ধ অশ্রদ্ধা থেকে মুক্ত হবে।'

(বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র, খণ্ড ৪, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ. ৩৩৪)

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

পাঠপ্রস্তাব

১. রবার্ট ফিলিপসন, লিংগুয়িস্টিক ইমপেরিয়ালিজম, ১৯৯২, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
২. রবার্ট ফিলিপসন, ইংলিশ-অনলি ইউরোপ? চ্যালেঞ্জিং ল্যাংগুয়েজ পলিসি, ২০০৩, রুটলেজ।
৩. রবার্ট ফিলিপসন, লিংগুয়িস্টিক ইমপেরিয়ালিজম কন্‌টিনিউড, ২০০৯, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।
৪. রবার্ট ফিলিপসন ও টোভ সুকটনাব-কাঙ্গাস রচিত প্রবন্ধ 'দি গ্লোবাল পলিটিকস্ অফ ল্যাংগুয়েজ: মার্কেটস,মেইনটেনেন্স, মারজিনালাইজেশন অর মার্ডার?' যা নিকোলাস কুপল্যান্ড সম্পাদিত উইলি-ব্ল্যাকওয়েল দ্বারা প্রকাশিত 'দি হ্যান্ডবুক অফ ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন' গ্রন্থে ৭৭ থেকে ১০০ পৃষ্ঠায় সংকলিত।

ভাষা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কী হারিয়ে যায়?

জোশুয়া ফিশম্যান

[সংলগ্ন লেখাটি পড়বার আগে লেখকের পরিচয় দিতে চাই। ১৯২৬ সালে আমেরিকায় অভিবাসী এক ইহুদি পরিবারে জোশুয়া ফিশম্যানের জন্ম হয়। তাঁদের মাতৃভাষা ছিল ইড্ডিশ। এই পরিবার প্রবাসেও তাঁদের মাতৃভাষা বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় খাওয়ার টেবিলে বসে বাবা সন্তানদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ সারাদিন তোমরা ইড্ডিশ ভাষার জন্য কী করেছ?' অভিবাসিত দেশে দ্বিভাষিক অবস্থানে থেকেও কীভাবে মাতৃভাষাকে নিজেদের জীবনে বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে টিকিয়ে রাখা যায় সে ব্যাপারে সেখানের অন্যান্য ইহুদি পরিবারদের মধ্যেও চেষ্টা অব্যাহত ছিল। জোশুয়া ইংরেজি মাধ্যম সরকারি স্কুলে পড়ার পাশাপাশি শ্রমিকচক্রের একটি বেসরকারি পাঠশালায় ইড্ডিশ শেখেন।

ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পুরোধাপুরুষ ছিলেন। দ্বিভাষিকতা, বহুভাষিকতা, ভাষার বিপন্নতা ও বিপন্নভাষার সংরক্ষণ নিয়ে সারাজীবন তিনি চর্চা করে গেছেন। জীবনসঙ্গিনী গেল্লা শোয়েলড ছিলেন একই পথের পথিক। ফিশম্যান কলম্বিয়া ও ইয়েশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজভাষাবিজ্ঞান পড়িয়েছেন। স্ট্যানফোর্ডে তাঁর পড়ানোর বিষয় ছিল ফলিত ভাষাবিজ্ঞান। তিনি একহাজারের বেশি নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। জীবিত থাকা কালেই তিনি কিংবদন্তীতে পরিণত হন। ১৯৯৪ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জোশুয়া ও গেল্লার পান্ডুলিপি ও অন্যান্য স্মারক বস্তুর এক মহাফেজখানার উদ্বোধন করা হয়। জীবৎকালে এটি এক মহাসম্মান। এছাড়াও ২০০৪ সালে তিনি পান ভাষাবিজ্ঞানে

নোবেল প্রাইজ তুল্য 'লিঙ্গুয়া প্যাকস' পুরস্কার। তাঁকে নিয়ে প্রকাশিত দুটি সম্মান গ্রন্থের প্রকাশও ফিশম্যান দেখে যান। ২০১৫ সালে ৮৮ বছর বয়সে নিপীড়িত ভাষার দরদী এই মানুষটি প্রয়াত হন।

১৯৯৪ ও ৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-দফায় বিশাল ও মনোজ্ঞ সম্মেলন হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল 'জনজাতিদের ভাষার মজবুতিকরণ ও তার জন্য জনজাতির মধ্য থেকে শিক্ষক ও ভাষা বিশেষজ্ঞ গড়ে তোলা'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২১টি রাজ্য ও কানাডার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এখানেই জোশুয়া ফিশম্যান দুটি বক্তৃতা দেন। তার প্রথমটি ভাষান্তরে এখানে প্রকাশ করা হল।

ফিশম্যানের বক্তৃতায় বেশ কয়েকটি ভাষার, ভাষিক জনগোষ্ঠীর, স্থানের ও ভাষাবিজ্ঞানের সূত্রের উল্লেখ আছে। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা নানাসূত্র থেকে সংগ্রহ করেছি এবং পাঠকদের সুবিধার জন্য টীকার আকারে সাজিয়ে দিয়েছি।—অনুবাদক]

মাতৃভাষার ওপর আমার প্রথম নিবন্ধটা বেরোয় ১৯৪৮ সালে। এই প্রবন্ধে পড়ুয়াদের ওপর দ্বিভাষিকতার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তখনও এমন অভিভাবকরা ছিলেন যাদের উদ্বেগ ছিল—সন্তানরা যদি অন্য একটা ভাষা শেখে তবে তাদের ইংরেজিতে কথা বলার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইংরেজি বলার সময় যদি অন্য একটা ভাষার সুর এসে যায় তাহলে কীভাবে তারা চাকরি পাবে? লোকেই বা তাদের কী ভাববে? তারপর ৪৫ বছর কেটে গেছে। এখনও আমরা জনমত বা কর্তৃপক্ষকে 'বোঝানোর ক্ষমতা অর্জন' করতে পারিনি যে সব ভাষাই আমাদের দরকার। এজন্য এ-প্রশ্নটা দিয়ে আমার আলোচনা শুরু করতে চাই—'একটা ভাষা হারিয়ে গেলে কী ক্ষতি হয়?' এই প্রশ্নটা করলে লোকে যে কী অস্বস্তিতে পড়ে তা বলবার নয়। আমার মনে পড়ছে মায়ের কথা। তিনি সবসময় আমাকে বোঝাতেন, 'যখন তুই কোনো আলোচনা শুরু করবি তখন যেন মনে থাকে যে প্রশ্নটা কী সেটা যেন লোকের জানা থাকে, আর শুরু করবি একটা ভালো প্রশ্ন দিয়ে। একটা ভালো প্রশ্ন সবচেয়ে দামি।' আমি তাঁকে বলতাম, 'মা, তুমি তো জানো আমেরিকানরা একটা মজার কথা বলে সম্মেলন শুরু করে। এমন একটা মজার কথা তোমাকে বলতে হবে যাতে শ্রোতারা আঁচ করতে পারে কী নিয়ে তুমি বলতে চলেছ।' মা বলতেন, 'মশকরা? একটা ভলো

প্রশ্ন করো।' এটা ইহুদিদের একটা প্রাচীন পরম্পরা, যদি তোমার কোনো ভালো প্রশ্ন থাকে, তাহলে ভাববার উপাদানও থাকবে।

ভাষা হারানোকে দেখার মনোভাব পরিপ্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিত থেকে ভাষা হারানোর বিষয়টা দেখা যাক। নিজের ভাষাটা অনেকে চেপে গিয়ে নানা সমস্যায় পড়েন। নিজের ভাষা ছাড়া অন্যভাষায় কথা বলার সময় আপনি হয়তো একটা তুলনা দিতে চান, দেখবেন আপনার চাপা পড়া ভাষার রূপকটাই মুখে আসছে, অথচ বলতে হবে অন্যভাষায়, তখন আসে তোতলানো, আসে আনিশ্চয়তার ভাব। এভাবে ব্যক্তিগত আত্মমর্যদায় ঘা তো লাগছেই।

সংস্কৃতি হারানোর দিক থেকেও বিষয়টা দেখা যায়। নির্দিষ্ট সংস্কৃতিটি তার নির্দিষ্ট ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। সংস্কৃতির সঙ্গে যে ভাষা পরম্পরাগতভাবে যুক্ত সেটা হারিয়ে গেলে কী ক্ষতি হয়? কী হারায়? আমেরিকার আদিবাসীদের পক্ষে সেটা একটা গুরুত্বর বিষয়। প্রশ্নটাকে জাতীয় দিক থেকে দেখা যায়। কোনো জাতি বা দেশ যখন তার ভাষাগুলো হারায় ,তখন কী হারিয়ে যায়? এখানে খাপছাড়াভাবে একটা ভাষিক লাভক্ষতির খতিয়ান দেওয়া গেল। উত্তরে আপনারা ভান করবেন কিছুই তো হারাল না, শুধু ভাষাটা হারাল। শুধু একটা ছোট ভাষা। কিন্তু একটা দেশ তো তার সবকটা সৃজনশীল সম্ভাবনার যোগফল। যে সব মানুষেরা নিজেদের নিয়ে অস্বস্তিবোধ করে না, দেশ থেকে তারা যখন হারিয়ে যায়, তখন দেশ কী হারায়? সেইসব মানুষদের আসল সংস্কৃতি যখন হারিয়ে যায়, তখন কী হারিয়ে যায়? যখন সংবেদনশীলতার পথে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে যায়, প্রজ্ঞা হারায় এবং জীবনের যে একটা উদ্দেশ্য আছে তার ন্যুনতম স্বীকৃতি যদি হারিয়ে যায়—তখন কী হারায়? জীবনের দিশা হারিয়ে ফেলার দিকে যে দেশ মানুষকে উৎসাহিত করে তাদের হারাতে আর কী বাকি থাকে?

আজ আমি এইসব পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে একটা সম্বন্ধে শুধু বলব। সেটা সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত। কারণ ভাষা হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত। ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্কটা কী? এটা কি আমার প্যান্টের সঙ্গে আমার রুমালের সম্পর্কের মতো? যেমন একটা রুমাল প্যান্টের পকেট থেকে বের করে ফেলে দিয়ে আর একটা রুমাল

ভরলাম। তেমন, নাকি, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে অন্য ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সম্পর্ক আছে? সেখানেও নানা পরিপ্রেক্ষিত থাকতে পারে। 'বহিরাগতর' বিশেষ করে বিদ্যাচর্চাকারীদের একটা পরিপ্রেক্ষিত দেখা যায়। যেমন আমাদের মতো নৃতাত্ত্বিক আর ভাষাবিজ্ঞানীরা বসে বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবি। আমরা যখন ভাষা আর সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে বিবেচনা করি তখন সেই সংস্কৃতির মানুষ হিসেবে বিষয়টা ভাবি না, ভাবি বাইরের মানুষের মতো। বাইরে থেকেই আমরা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য জোগাড় করার চেষ্টা করি। ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির বাগবিধি বা বাগভঙ্গি ধরনের একটা সম্পর্ক আছে। যে ভাষা দীর্ঘদিন ধরে কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে, সে ভাষাতেই সেই সংস্কৃতির ভাবনা, শিল্প, মূল্যবোধ এবং স্বার্থ সবচেয়ে সহজে, সবচেয়ে সঠিকভাবে, সবচেয়ে সমৃদ্ধভাবে, প্রয়োজনীয় জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব। ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বের বিষয় হল এই প্রকাশভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্যটি।

সংস্কৃতির সিংহভাগটাই থাকে ভাষায় আর ভাষার মাধ্যমেই তার প্রকাশ। এই সম্পর্কটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা হারালে সংস্কৃতি হয়ে পড়ে নিরালম্ব। সংস্কৃতি থেকে ভাষাকে সরিয়ে নাও, হারিয়ে যাবে সম্বোধন, সম্ভাষণ, হারিয়ে যাবে গালাগালি, হারিয়ে যাবে প্রশংসার কথা। হারাবে এর আইনকানুন, সাহিত্য, সঙ্গীত, ধাঁধা, প্রবাদপ্রবচন, উপশম, প্রজ্ঞা আর প্রার্থনা। অন্য কোনো উপায়ে সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতি প্রকাশ করা বা প্রবাহিত করা অসম্ভব। কী পড়ে থাকবে? ভাষার কথা যখন বলা হচ্ছে, আসলে তখন কিন্তু সংস্কৃতির কথাই বলা হচ্ছে। তার মানে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে সেইসব জিনিস যা জীবনধারার আবশ্যিক অংশ, চিন্তাধারার, মূল্যমান আরোপের এবং মানবীয় বাস্তবতার আবশ্যিক উপাদান।

ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আর একটা গভীর সম্পর্ক আছে, সেটা প্রতীকী সম্পর্ক। এর মানে ভাষা পুরো সংস্কৃতির প্রতিনিধি। বাচকদের মনে, বহিরাগতদের মনেও ভাষাটা ওই সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। বাচকদের পুরো অর্থনীতি, ধর্ম, স্বাস্থ্যপরিষেবা, দর্শন—এই সব কিছুর সারসংকলন হয় ভাষার মাধ্যমে। এজন্য যখন আমরা অন্য কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে যাই তখনই তার ভাষা সম্বন্ধে নানারকম অপমানজনক মন্তব্য করি। 'ওহ, কী কর্কশই না শোনায় ভাষার ধ্বনিগুলো। ভাষাটা শুনলে কেমন নিষ্ঠুর মনে হয়।' কারণ আমাদের

ধারণা ভাষটার বাচকরাই নিষ্ঠুর। যখন আমাদের কানে ভাষাটা হেলাফেলার ভাষা বা আদিম ভাষা বলে মনে হয় তখন আসলে আমরা যারা ওই ভাষায় কথা বলে, তাদেরই আদিম বলে ভাবি। আমাদের কাছে ভাষাটা গোটা সম্পর্কের প্রতীক দ্যোতনা করে।

এতক্ষণ যা বললাম, সেটা বহিরাগতের চোখে ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক। বহিরাগতের ভাবনা নিয়ে আমার খুব মাথাব্যথা নেই। এটা একটা উচ্চাঙ্গের বিমূর্তায়ন। কিন্তু লোকের কাছে যদি জিজ্ঞেস করেন, তাদের কাছে ভাষার গুরুত্ব কোথায়, ওই সংস্কৃতির সদস্যদের সঙ্গে যদি কথা বলেন, তবে কিন্তু তারা ভাষার বাগভঙ্গি বা প্রকাশক্ষমতা নিয়ে বলবেন না। প্রতীকদ্যোতনার কথা বলবেন না। তাঁরা সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে কথা বলবেন। সে-কথা থেকে অপনারাই জানতে পারবেন কী হারায় বলে তাঁদের ধারণা। ভাষার পবিত্রতার কথা তাঁরা বলবেন। পবিত্রতা ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো কোনো তুচ্ছ জিনিস নয়। আমি অন্তত তেমনটা কখনও মনে করিনি। তা সত্ত্বেও লোকে বলতে থাকবে ভাষাটা কীভাবে আবির্ভূত হল। বলবে আকাশ আর পৃথিবীর যখন জন্ম হল, মানুষের যখন সৃষ্টি হল, তখনকার কথা। আপনি ভাববেন এটা একটা পুরাণকল্প, কিন্তু এর মূল্য সত্য মূল্যকে ছাপিয়ে যায়। এটাই তো পুরাণকল্পের সংজ্ঞা—সত্যকে অতিক্রম করে যায় বলেই এর গুরুত্ব এবং সেকারণেই পুরাণকল্পকে আঁকড়ে ধরে থাকে মানুষ। এমন কথাও তাদের ভাবনায় থাকতে পারে—বিশ্বসৃষ্টির আগেই সাদা আগুন আর কালো আগুন হিসেবে তাঁদের ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান এক একবার মুখ খুলে কথা বললেই কালো আগুন আর সাদা আগুনের চেহারায় তাঁদের অক্ষরগুলো বেরিয়ে এসেছিল। গল্পটা আপনাদের কাছে হাস্যকর মনে হবে, কিন্তু এটাই একটা পবিত্রতার বোধ। লোকে এসব কথা এভাবেই বলে থাকে। আমেরিকার জনজাতিদের সাধারণ মানুষ এভাবেই বিষয়টা বলবে। মহান স্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে তারা কথাগুলো বলবে। ভাষার মধ্যে যে নৈতিকতা আছে সে কথা তাঁদের মুখেই শুনবেন। তাছাড়া সক্রিয় নৈতিকতাই তো পবিত্রতা। ভালো হওয়ার জন্য কী করতে হবে, গোষ্ঠীর উপযুক্ত সদস্য হতে গেলে করণীয় কী, স্রষ্টার প্রতি অঙ্গীকার কীভাবে পালনীয়—এসব কথাই ধরা আছে ভাষার আধারে। তাদের বিশ্বাসে কিছু ভাষা নিজেই পবিত্র। অন্য কোনো কোনো ভাষায়

হয়তো ঐশী বাণী বর্ষিত হয়েছে, এসেছে প্রভুর নির্দেশ। লোকের কাছে নানা উপমায় পবিত্রতার কথা শুনবেন। নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে পবিত্রতার কথা বলা সবচেয়ে প্রচলিত ব্যাপার। ভাষা জনগণের আত্মা। এই রূপকটি ভাষা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায়। ভাষাকে জনগোষ্ঠীর মন, তাদের প্রাণবায়ু বলা রূপকটি নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। এগুলো রূপক ঠিকই তবে নিছক রূপক নয়। এর মধ্যে নিহিত আছে গভীর কোনো পবিত্রতা যেটা হারিয়ে যায় ভাষা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে। একটা পবিত্রতার বোধ জনজাতির জীবনকে ছেয়ে থাকে যেমনভাবে সংস্কৃতি ছেয়ে থাকে জীবনে। ভাষার মাধ্যমেই এগুলো ঘটে।

লোকে বলে আমরা আমাদের ভাষাকে ভালোবাসি, আমাদের কাছে ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। কেন আপন ভাষা প্রিয়, কেন তার গুরুত্ব, এ প্রশ্নের উত্তরে তারা আত্মীয়তার কথা বলেন। বলেন, 'আমাদের মা, বাবা, কাকা, কাকি, ভাই বোন— সমস্ত গোষ্ঠীটাই এ ভাষা বলত। যাঁরা আমাদের ভালোবাসতেন তাঁদের সবার মুখেই ছিল এই ভাষা। ছোটোবেলায় এভাষাই আমরা শুনেছি। মা মারা যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে মা এই ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।' আত্মীয়তার মধ্যে প্রীতি ও প্রতিপালনের যে মধু নিহিত, তা গোষ্ঠীর এক প্রাণবান সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সেখানে লোকে একে অপরের পরিচিত। তারা জানে এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা সবাই। অন্তর্ভুক্তিতেই তারা এক। এ পুরনো সমাজবিজ্ঞানীরা একেই বলেন জেমেলনশ্যাফট[১]। আমরা সবাই এক সাথের সাথী, আমাদের এমন কিছু আছে যা সবার মধ্যেই পাওয়া যায়। ভাষার বন্ধনে আমরা একে অপরের সঙ্গে বাঁধা। পবিত্রতার বোধও যেমন হারাতে চাই না, তেমন গোষ্ঠীর মহামূল্যবান বোধও আমরা হারাতে রাজি নই। দুর্ভাগা সেই জনগোষ্ঠী যারা এই পবিত্রতার বোধ হারিয়ে ফেলেছে, যাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না। দুর্ভাগা সেই জনগোষ্ঠী যারা একে অপরের কাছে দায়বদ্ধতা হারিয়ে ফেলেছে।

এভাবেই লোকেরা নিজেদের ভাষা সম্পর্কে আপনাদের বলবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো নৃবিজ্ঞানীর বা অন্য কোনো বাইরে থেকে দেখা জিজ্ঞাসুর নয়। এগুলো ভাষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে ভাষাগোষ্ঠীর ভেতর থেকে আসা অনুভূতির কথা। এটা কোনো বুদ্ধিজীবীকরণ নয়, কারণ এটা আবেগসিক্ত, আর এর আলো পড়েছে অন্তর্গত অভিজ্ঞতার উপর।

ভাষা সম্বন্ধে আর একটা কথা লোকেরা বলে। সেটা দায়িত্বের কথা। নিজেদের ভাষার প্রতি তাঁদের একটা দায়িত্ব আছে, তাই ভাষা নিয়ে তাঁদের কিছু করা উচিত। এধরনের কথা কম শোনা যায়, কিন্তু একান্ত বিরল বললে ভুল হবে। শুনতে পাওয়া যায়—'আমার কিছু করা উচিত। আরো বেশি কিছু করা উচিত। ভাষা নিয়ে আমি যা করা উচিত তা করিনি। কিছু কাজ যে এখন করছি তাতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।' এরকম কথা শুনতে মনে হয় যে কোথাও যেন একটা নৈতিক দায় ও বাধ্যবাধকতা আছে, এটার একটা মূল্য আছে। ভাষা আত্মীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি যদি সজ্জন লোক হই তাহলে মাতৃভাষা আমাকে যা দিয়েছে, তার জন্য আমি ঋণী। কী দিয়েছে সে? দিয়েছে ভালোবাসা, লালন ও সংযোগ। ইতিবাচক নৃভাষিক চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে ওপরের তিনটে উপাদানকেই ঠিকঠাক পাওয়া যায়। সেগুলি হল—পবিত্রতার বোধ, আত্মীয়তা-বন্ধনের বোধ এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতার বোধ। লোকে নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে ইতিবাচকভাবেই সচেতন। ভাষাবোধকে নষ্ট করার জন্য অথবা তাকে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে উন্নীত করার জন্য তাঁদের ভাষাবিজ্ঞানের পাঠ নিতে হয়নি। তাঁরা যখন ইতিবাচকভাবে নৃভাষিক দিক থেকে সচেতন, তাঁরা নিজেদের কাছে যে কথাগুলো গভীর অর্থবহ সেগুলোই বলবেন। সেগুলোই ভাষা হারালে ভাষীর যা হারায় সেই হারাধন। এঁরা হারান পরিবারের এক সদস্যকে, বিশ্বাসের স্তম্ভকে, জীবনের এক অঙ্গীকারকে। এগুলো কি কোনো মানুষ বা সংস্কৃতির পক্ষে তুচ্ছ বিষয়? এই সম্মেলনে একটা সাধারণীকৃত আলোচ্য বিষয় আছে—'ভাষা সরণের মুখ ফিরিয়ে দেওয়া' অথবা 'জনজাতিদের ভাষার মজবুতিকরণ'। ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে বিষয়টা সবকটা মহাদেশের, আক্ষরিক অর্থে কোটি কোটি জনগণের একটা আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করছে। এটা বুঝতে পারার একটা দাম আছে। ছোটো ছোটো আমেরিকান জনজাতিগোষ্ঠীগুলি ভাবতে পারে যে তারাই কেবল বিপন্ন ভাষার বোঝায় উদ্বেগে ভুগছে। এখন বোঝা গেল সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ নিজের নিজের ভাষা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন, সব মহাদেশেই তাঁরা আছেন, সুস্পষ্ট নিদর্শনের জন্য আমরা ইউরোপের দিকে তাকাতে পারি। সেখানে দেখি আইরিশ[২], বাস্ক[৩], কাতালান[৪] ও ফ্রিজিয়ানের[৫] মতো বিপন্ন ভাষাগুলোকে।

একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে। আমি তখন মিশরে। একদিন কপ্‌টিক গোষ্ঠীর একজন মানুষ আমার কাছে এলেন। কোনো লোক যখন অনুভব করে যে আপনি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল কেবল তখনই সে গভীর বেদনার বিষয়ে আপনার কাছে মুখ খুলবে। আগন্তুক আমার আগ্রহের বিষয়টা বুঝতে পারলেন। বললেন, কীভাবে তাঁরা কপ্‌টিক[৬] ভাষা পুনরুজ্জীবনের কাজ করছেন। তাঁরা কপ্‌টিক শিশুদের জন্য ছোটো ছোটো পুস্তিকা রচনা করেছেন। তিনি সাগ্রহে জানতে চাইলেন আমি সেগুলো দেখব কিনা। হাজার হাজার বছর আগেই মাতৃভাষা হিসেবে কপ্‌টিকে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছে। আজ তাঁরা এভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি আফ্রিকা-আন[৭] বাচকদের সঙ্গে আমার কিছু কথা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য নীতি দূর হওয়ার ফলে আফ্রিকা-আন ভাষার বিপদ ঘনিয়ে আসাই স্বাভাবিক। ইংরেজি হয়ে উঠেছে যোগাযোগের ভাষা। আর ন-দশটা ভাষাকে জাতীয়ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম দিকে আগের শাসন আমলের ভাষাটারই কিছুদিন প্রতিপত্তি থাকবে। বর্ণবৈষম্যনীতির সঙ্গে সেটির অনুষঙ্গ জড়িত। অবশ্য এটাই একমাত্র প্রতীকী অনুষঙ্গ নয়। যাই হোক সর্বস্তরেই অফ্রিকা-আন মর্যাদা হারাতে শুরু করেছে।

এশীয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আর অস্ট্রেলিয়ার যেসব আদিম ও জনজাতীয় ভাষা এখনো টিকে আছে, সম্প্রতি তাদের ওপর বড়োমাপের 'উদ্ধার যজ্ঞ' চালানো হচ্ছে, নিউজিল্যান্ডের জনজাতীয় ভাষা মাওরি[৮] তাদের অন্যতম।

সেখান থেকে আসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা হল, তিনি জানালেন মাওরিদের মধ্যে এখন ছ'শো নার্সারি-কিন্ডারগার্টেন গোছের শিশু পালন কেন্দ্র চলছে। যে সব শিশুরা মাওরি বলতে পারে না প্রবীণ মাওরি বাচকরা এই কেন্দ্রে তাদের দেখভাল করেন। মাওরি ভাষা মাধ্যমের প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন বেড়েই চলেছে।

এতে দেখা যাচ্ছে, শুধু অভিবাসী উত্তর আমেরিকা মহাদেশেই নয়, প্রতিটি মহাদেশে যেখানে মানুষ বাস করে, সেখানের লোকেরা জনজাতিদের ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিক চার্চ[৯] ও আরমেনিয়ান চার্চের[১০] প্রতিনিধিদের আপনারা দেখতে পাবেন। এদের ভাষিক প্রয়াসের কথা তাঁরা

আপনাদের বলবেন। তাঁরা প্রশ্ন করবেন, 'গ্রিক ভাষা না জেনে আপনি কি গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের অনুগামী হতে পারেন?' তাঁদের ধারণায় এটা আমেরিকান বিচ্যুতি। ইতিপূর্বে গ্রিক ইতিহাসে এরকমটা কখনো হয়নি। 'আর্মেনিয়ান ভাষা না জেনেই আপনি কি আরমেনিয়ান চার্চের সদস্য হতে পারেন?' আরমেনিয়ান ভাষার সঙ্গে যুক্ত একজন সন্তও আছেন। এজন্যই আরমানি ভাষা তাঁদের কাছে অতি পবিত্র। আরমানি বর্ণমালার উদ্ভব পবিত্রতার ভূমি থেকে। কিন্তু আমেরিকায় প্রশ্নটা উঠেছে, আরমানি ভাষা ছাড়া আরমানি মানুষ কি হওয়া যায়? ঔপনিবেশিক ভাষা স্প্যানিশের নাম বহু ভাষার ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। অন্তত নিউইয়র্ক শহরের ক্ষেত্রে এটা প্রকট। সেই স্প্যানিশের ক্ষেত্রে এই শহরে কী ঘটেছে দেখুন। স্প্যানিশ বাচক ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আন্তঃপ্রাজন্মিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে একই প্রশ্ন, 'স্প্যানিশ বলতে পারেন না অথচ আপনি হিস্পানিক[১১] এটা কি সম্ভব?' এ প্রশ্নটা নতুন। কিন্তু সত্যিকথা বলতে গেলে দেখাতে হয় অনেক স্প্যানিশবাচকের ভাইপো ভাইঝিরা স্প্যানিশ বলেনা। কোথাও একটা গভীর ভ্রান্তি ঘটে গেছে। এজন্য ক্ষতির অনুভূতিও খুব গভীর।

সুতরাং, জনজাতি ভাষাগোষ্ঠীর যে সদস্যরা তাঁদের ভাষার পুনরুজ্জীবন চান, ভাষাকে শক্তিশালী করতে চান, তাকে বিকশিত করতে চান, তাঁদের দলে আরও অনেকেই আছেন। দলটা বেশ ভারী। এই দলে এমন বহুমানুষ আছেন যারা একধরনের পুনরুজ্জীবনের কাজে, কখনও বা একই কাজে কঠোর শ্রম দিয়েছেন। এতে তাঁরা বলার মতো কিছু সাফল্যও পেয়েছেন। যদিও সব মিলিয়ে, তুলনামূলক বিচারে, এই কাজ নিয়ে থাকাটা খুব সুখের নয়। আমার মা বলতেন, গরিব হওয়া, বুড়ো হওয়া আর অসুস্থ হওয়া কখনোই সুখের নয়। ঠিক সেরকমই, ছোটো, দুর্বল বা আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র সংস্কৃতির সদস্য হওয়া ভালো নয়। কিন্তু আমরা তো আমাদের মা বেছে নিতে পারিনা। তেমনি পারিনা আমাদের পছন্দ মতো সংস্কৃতি বেছে নিতে। নিজের সংস্কৃতির জন্য যদি কিছু আপনারা করেন তবে অন্তত আংশিক ক্ষতিপূরণ আপনাদের হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে এমন বিশদ আকারে একাজ চলছে যে, আমার মনে হয়, একসঙ্গে মিলে অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করার এটাই উপযুক্ত সময়। ভাগ করে নিতে হবে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা। সাফল্য ও ব্যর্থতা দুটোই ভাগ করে নেওয়া দরকার। সাফল্য আমাদের নিঃশেষ

হওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। ব্যর্থতার উদাহরণগুলোও জানা দরকার। কারণ সেগুলো না জানা থাকলে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। ধরা যাক এক ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা আগে বার বার করা হয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো সুফল আসেনি। আপনাদের যদি এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা জানা না থাকে, তবে আপনারা এই পরীক্ষা নিরীক্ষাকে ভালো মনে করে নিজেরাই আবার সেটার নিষ্ফল প্রয়োগ করবেন। আমার মনে হয় কতকগুলো কারণে ভাষা পুনরুজ্জীবন একটা সুকঠিন কাজ। এটা জেনে বুঝেই আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে।

দুর্বল ভাষাগুলোর মজবুতিকরণের ক্ষেত্রে সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার সংখ্যা বেশি। এর অনেকগুলো কারণ আছে। সবার প্রথম কারণ হিসেবে বলতে হয় প্রতিযোগিতার কথা। কোনো দুর্বল সংস্কৃতিকে যখন শক্তশালী সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, সে বড়ো অন্যায্য প্রতিযোগিতা। দুর্বলের পক্ষে বাধাগুলো মোটেই উৎসাহজনক নয়। কখনোই নয়। চলতে চলতে যত সামান্য ভুলই হোক না কেন তা সামলে ওঠার মতো পরিসর দুর্বলের হাতে থাকে না। এটা যেন গরিব লোকের শেয়ার বাজারে টাকা খাটানোর মতো ব্যাপার। ফাটকা যদি না লাগে তাহলে আঁকড়ে ধরার মতো আর কিছু থাকে না। ছোটো ছোটো দুর্বল সংস্কৃতির চারপাশে ঘিরে আছে আধিপত্যকারী সংস্কৃতিগুলো। অথচ তাদের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। আধিপত্যকারী সংস্কৃতিগুলো দুর্বল সংস্কৃতিকে হটিয়ে দিচ্ছে, অথচ এইসব বিতাড়ক সংস্কৃতির কাছে প্রয়োজনে হাতপাতা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই পরিস্থিতি মোটেই ঈর্ষনীয় নয়। বড়ো কঠিন। চারপাশের সবচেয়ে বড়ো বাধার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে নেমেছে দুর্বল সংস্কৃতিগুলো, আর নেমেছেও যখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তাঁদের ভাষার কপালে যে কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে এটাই অনেকে মানতে চান না। 'একটু পিছিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ঠিক ধরে ফেলবে। তাই আগেও তো এরকমটা হয়েছে। ছোটোদের কথা বলছেন? তারা ঠিক শুধরে নেবে। বড়ো হলে তারা মাতৃভাষায় কথা বলতে থাকবে।' খুব দেরিতে ভাষাসংরক্ষণের কাজটা শুরু করলে কতকগুলো দিক থেকে দেরি হয়ে যাবে। প্রথমত, বয়সের দিকে থেকে দেরিটা খুব বেশি হয়ে যেতে পারে। কখনো কখনো দেখা গেছে সংস্কৃতিগুলো যখন 'কিছু একটা করা দরকার' বলে 'কোমর বেঁধেছে' তখন

তাদের চারপাশে এমন বয়সি লোকেরাই শুধু আছে যাঁদের সংসারে আর শিশুজন্মানো সম্ভব নয়। এই বয়সের লোকেরা হয়তো নিজেদের মাতৃভাষাতেই কথা বলে, কথাবলাটা উপভোগ করে, হাসিতামাসা করতে পারে, গল্প বলতে পারে, এমনকি পরম্পরাগত কাজকর্ম সবই এই ভাষাতে করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নতুন কোনো বংশধর জন্মানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। স্বনির্ভর আন্তঃপ্রাজন্মিক যোগসূত্রের প্রবাহ টিকিয়ে রাখার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতেও কেউ কেউ চেষ্টা চালাতে পারেন, সেটা হবে ভ্রূণকে হিমায়িত করে একশ বছর পরে আবার সেটাকে ফিরিয়ে আনার সমান। যে ভাষার স্বাভাবিক প্রজন্মের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে, সে-ভাষার জন্যও অস্বাভাবিক কিছু চেষ্টা কেউ কেউ করে দেখতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওইসব অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া সত্যিই অস্বাভাবিক। তা চালানোও প্রায় অসাধ্য।

মতাদর্শ বা সংস্কৃতিগত দিক থেকেও ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কারণ জীবনযাপনের এক নতুন কৌশল, বিপরীতকে মেলানোর নতুন চেষ্টা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভাষার মৃত্যু হলেও মানুষ তো কথা বলা বন্ধ করে না। সংস্কৃতি ডানা গুটিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে মিলিয়ে যায় না। মাতৃভাষা-হারানো মানুষগুলো চলতেই থাকে। তাঁরা একটা নতুন ভাষায় কথা বলে। অন্য ভাষা নিয়ে তাঁরা চলতে থাকে। ভাষা ও সংস্কৃতির এক নতুন সম্পর্ক তাঁরা গড়ে তোলে। এই সম্পর্কটায় একটার সঙ্গে অন্যটার জোড় খোলা যায়। এমন আলগা সম্পর্ক গড়ে তুলতেও অনেক সময় লাগে। একটা ভাষা একবার হারিয়ে গেলে সেই ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির পরম্পরাগত সম্পর্ক আবার গড়ে তুলতে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া দরকার। কারণ ইতিমধ্যে আর একটা ভাষা যে তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে। লোকে এই অবস্থায় বলছে, 'দেখ বাপু, আমরা চিপ্পেওয়া,[১২] সেনেকা,[১৩] ব্ল্যাকফুট,[১৪] যাই হই না কেন ইংরেজিতেই সেটা হতে পারি।' এটা অন্যরকম একটা ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্ক। এরকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরনো ভাষাকে ফিরিয়ে এনে তাকে শক্তিশালি করা খুব দুষ্কর, বিশেষত পুরনো ভাষাটা ইতিমধ্যেই যখন নানা চাপ ও বাধার ভেতর দিয়ে গেছে।

সব অঙ্গীকার সত্ত্বেও, পবিত্রতা ও আত্মীয়তার সব বোধ সত্ত্বেও ভাষা সংরক্ষণ যে তুলনামূলকভাবে অসফল তার আর একটা কারণ, লোকে জানে

না করণীয় কী। এযেন এমন একটা রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেখানে কী করতে হবে সেটাই আজানা। ধরা যাক, মাতৃভাষা শেখা, মাতৃভাষা ব্যবহার ও মাতৃভাষার সংবহন—এ তিনটের মধ্যে পার্থক্য কী লোকের তা জানা নেই। এ তিনটে এক নয়। তার ফলে তারা প্রায়ই স্কুলের অভিজ্ঞতা থেকে ভাষা শেখার পক্ষে থাকে, মাতৃভাষা হিসেবে ভাষাটা অর্জন করার পক্ষে নয়। কিন্তু স্কুলের ভাষা তো মাতৃভাষা নয়, ইতিমধ্যেই তারা অন্য একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছে। স্কুলগুলো তো আন্তঃপ্রাজন্মিক ভাষা সংবহনের চালন ভূমি নয়। স্কুল তো চলে কয়েকঘন্টা, জীবনের কয়েকটা মোটে বছর, তারপরই শেষ। কীভাবে সেখানে শেখা ভাষা পরবর্তী প্রজন্মে সংবাহিত হবে? এই বিভ্রান্তির জন্য লোকে ভাবে ছেলেমেয়েরা যখন মেধাবী তখন সপ্তাহে কয়েকঘন্টা বছরে কয়েক সপ্তাহ স্কুলে কাটাতে পারলেই তারা ভাষাটা ধরে নেবে। তাঁরাও কর্তব্যপালনের স্বস্তি পাবেন।

কিন্তু এঁরা এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করতে পারেননি যা নিজেকে বারবার নবীন করে তুলতে পারে। তেমন একটা স্ব-নবীনায়ন, স্বয়ং-ক্ষয়পূরক ব্যবস্থা দরকার। কারণ স্কুলের পালা সাঙ্গ হলেও অনেকদিন পরে শিশুর পালা আসে শিশুর পিতা-মাতা হবার, যার মধ্যে সে মাতৃভাষার প্রবাহ সঞ্চারিত করতে পারে। এই বিষয়টা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বুঝতে হবে, স্কুল নিজে নিজেই ভাষাকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারেনা। কারণ, স্কুলের পরে সমাজ এমন কোনো সংবহন প্রকৌশল গড়ে তুলতে পারেনি যা স্কুলের অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যেতে পারে। স্কুলের গুরুত্ব অবশ্যই আছে, বিশেষ করে ভাষা ব্যবহারের কয়েকটা ক্ষেত্রে। এগুলোর মধ্যে সাক্ষরতা, বহুমুখিতা ও আনুষ্ঠানিকতার কথা বলা যায়। কিন্তু এগুলো মাতৃভাষা অর্জন বা মাতৃভাষা সংবহন নয়। করণীয় কী না জানার ফলে বা বুঝিয়ে দেওয়ার উপকরণ না থাকার ফলে শেষ পর্যন্ত মাতৃভাষা পুনরুজ্জীবনের জন্য শুরু হয় একসঙ্গে সবকিছুই উলটো মুখে চালানো। এর তুলনা চলে রোগের ঠিক ওষুধটি না জানার ফলে একসঙ্গে সবকটা ওষুধ খেয়ে ফেলা, এর মধ্যে একটা না একটা তো লেগে যাবে। এর মধ্যে এমন কিছু পদ্ধতি আছে যা খুব খরচসাপেক্ষ। সেগুলো প্রয়োগ করলেন কিন্তু কোনো কাজেই লাগল না। টাকা পয়সাই গচ্চা গেল। পেলেন হতাশা।

এজন্য কী করণীয় সেটা ভীষণ জরুরি, জরুরি হল কখন সেটা করতে হবে। (নজরটান মূলের) ধরা যাক কেউ একজন পরামর্শ দিলেন :

'শুনুন, এদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমস। আমরা ওই কাগজে আমাদের নাভাজো[১৫] ভাষায় একটা পুরো পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিই না কেন। এতে লোকে জানতে পারবে আমাদের কী চমৎকার একটা ভাষা আছে। এতেই আসল কাজটা হবে। আমরা সবসময় তাদের ভাষা ব্যবহার করছি। কাগজ খুলেই তারাও আমাদের ভাষা দেখুক'। (নজরটান মূলের)

যাইহোক, এটা কোনো সঠিক রাস্তা নয়। এতে কাজের কাজ কিছু হবে না।

আসল কাজের কাজ নির্ভর করে আপনারা ভাষাক্ষয়ের কোন স্তরে আছেন তার উপর। স্তর বিভাগের এই আলোচনা পাবেন আমার লেখা 'রিভার্সিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিফট' (মালটিলিঙ্গুয়াল ম্যাটারস, ১৯৯৯) গ্রন্থে। অথবা ক্ষয়ের প্রকৃতি, বলতে পারেন, ভাষা বিপন্নতার হুমকির মাত্রার ওপর। যেমন ধরুন, আন্তঃগোষ্ঠী সংযোগের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার কোনো স্বীকৃতি নেই —এটাই হয়তো সমস্যা। যেমন পেনসিলভানিয়ার[১৬] জার্মান বা ওলন্দাজদের এখন এই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ল্যাঙকাস্টার[১৭] অঞ্চলে কেনার মতো আর জমি নেই। যুবকদের অনেকে বিয়ে করে সংসারী হয়। তারা কানসাস[১৮] বা অন্য যেখানে জমি পাওয়া যায় সেখানে চলে যায়। অথবা কারখানায় কাজ করবার জন্য শহরে বাসা বাঁধে। কারখানায় ইংরেজিতেই পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। শুধু অন্য ভাষার শ্রমিকদের সঙ্গেই নয়, নিজেদের মধ্যেও ইংরেজিই হয় কথা চালাচালির মাধ্যম। তরুণদের এই ভাষিক আচরণে বয়স্করা উদ্বেগ বোধ করেন।

মাতৃভাষা নিয়ে এটাই যদি সমস্যা হয় তবে আপনারা জোড় আলগা হওয়ার কোনো একটা স্তরে আছেন। এটা অবশ্য সংবহনের স্তর থেকে খুব বেশি দূরে নয়। প্রত্যেকেই হয়তো পুরনো সম্প্রদায় থেকে ভাষাটা মাতৃভাষা হিসেবেই শিখছে। নিজেদের দৈনন্দিন কাজকর্মেও ভাষাটা ব্যবহার করছে। কিন্তু পৃথিবীর চার-পাঁচ হাজার ভাষার মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আন্তঃগোষ্ঠী সংজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না। এমন কি সুস্থসমর্থ বেশির ভাগ ভাষার ক্ষেত্রেও এমনটাই ঘটে। এর ফলে সঠিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে সমস্যাটিকে আপনাদের দেখতে হবে।

সমস্যাটা কি এই যে, মাতৃভাষা স্কুলের ক্লসঘরে বা সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না? এরকম হলে সমস্যাটা গুরুতর তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সাক্ষরতা ভাষাগোষ্ঠীকে পুষ্ট করে। স্থানকালের সীমানা পেরিয়ে সাক্ষরতা সংযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে। সাক্ষরতার মাধ্যমে আমরা মৃতদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমরা কথা বলতে পারি শুধু মৃত নয় অনেক দূর অতীতের মানুষের সঙ্গেও। যে ভাষায় সাক্ষরতার ব্যবস্থা নেই তেমন ভাষা যখন সাক্ষরতার ব্যবস্থা আছে এমন কোনো ভাষার সংস্পর্শে আসে তখন একটা ইজ্জতের প্রশ্ন দেখা দেয়। আর এ যুগে স্কুল তো একটা সাক্ষরতাদায়ক প্রতিষ্ঠান। এরকম কিন্তু সবসময় ছিল না। সব জায়গায়ও ছিল না। আমি আপনাদের সুনিশ্চিতভাবে আশ্বস্ত করতে চাই যে দুনিয়ার বেশিরভাগ স্বাস্থ্যবান ভাষা আজ আর সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত নয়, অথবা দৃঢ়ভাবে যুক্ত নয়। এরা অত্যন্ত বেশিমাত্রায় স্কুলের ভাষা হওয়ার যোগ্য, তেমনও নয়। তার মানে এটা যে কোনো সমস্যা নয়, সেকথা বলছি না। আপনারা যেখানে থাকেন এসমস্যা সেখানে হয়তো আছে। আপনাদের হয়তো অন্যভাষায় সাক্ষরতা অর্জন করতে হয়। ফলে যেটা দাঁড়ায়, সাক্ষরতার ভাষাটা আপনাদের ভাষা নয়, আপনাদের ভাষা সাক্ষরতার ভাষা নয়। এক মর্মান্তিক চাপ সইতে হয়। একদিকে সাক্ষরতার ভাষা, অন্যদিকে ঘরের ভাষা, অন্তরঙ্গতার ভাষা, প্রেমের ভাষা, পবিত্রতার ভাষা, দুইয়ের পার্থক্যের চাপ সহ্য করার শক্তি জোগাড় করতে হয়।

ছাপামাধ্যম ও আকাশমাধ্যমের কুপ্রভাব সংখ্যালঘু ভষাগুলোর উপর ক্রমশ বেশি বেশি করে পড়ছে। তার ফলে সংখ্যালঘু ভাষা বজায় রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ভাষায় সাক্ষরতার অভাব যদি একটা দুর্বলতাদায়ক উপাদান হয়ে থাকে, তাহলে আপনাদের ভাষায় সাক্ষরতার বিকাশ ঘটাতে হবে। কিন্তু আপনা আপনি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে এটা সংবাহিত হয়ে যাবে না। সাক্ষরতার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। যে সব ভাষায় সাক্ষরতার হার খুব বেশি সেখানেও প্রতিটি প্রজন্ম নিরক্ষর হয়েই জন্মায়। বাপ-মা সাক্ষর হলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। আমি জানি দশ-শতাংশ অভিভাবক হয়তো আছেন যারা হারভার্ডের স্নাতক। তাঁদের সন্তানরা কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়ার আগেই সাক্ষর হয়ে যায়। এরকম ঘটনা অবশ্য খুব ব্যাপকতা লাভ করেনি। প্রতিটি

প্রজন্মকে সাক্ষর করার কাজ শুরু করতে হয় শূন্য থেকে। মাতৃভাষা কিন্তু সেভাবে শিখতে হয় না। মাতৃভাষা স্বয়ংসিদ্ধ। একটা নতুন প্রজন্মকে মাতৃভাষা শেখার জন্য স্কুলে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। ঘরে গোষ্ঠীতে, পাড়াপড়শি আর প্রিয়জনদের মধ্যে থেকেই শিশুরা মাতৃভাষা শিখে যায়। এরাই তার আত্মপরিচয় গড়ে দেয়। আপনাদের ভাষায় এ কাজটারও যদি অভাব ঘটে তাহলে সেটা গুরুতর সমস্যা। অবশ্য আপনারা যদি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে মাতৃভাষা হিসেবে আপনার ভাষাটা তুলে দিতে চান। এই অবস্থাতেও কিছু করা যেতে পারে। এমন কি যখন শিশুর জন্মদাতা হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো বয়সের বাচক না থাকে, যখন স্বচ্ছন্দ বাচক খুঁজেই পাওয়া যায় না তখনও কিছু করা সম্ভব। কিন্তু 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস'-এ পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দিয়ে যে কী হবে তা নিয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

এবার নানাধরনের প্রচেষ্টার দিকে নজর ফেরানো যাক। এর মধ্যে কিছু জিনিস পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, আবার কিছু জিনিস এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় খুব বড়োমাপের কোনো কিছু নিয়ে শুরু করবেন না। যেমন, 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতলব। মাতৃভাষাকে যদি স্বয়ংসিদ্ধ করতে চান তবে খুব দূর থেকে শুরু করবেন না। ঘরসংসার, পরিবার-পরিজন বা গোষ্ঠীকে আন্তঃপ্রাজন্মিক ভিতের ওপর রেখেই মাতৃভাষাকে পরের প্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব। এর থেকে খুব বেশি দূরের জিনিস নিয়ে শুরু করলে চলবে না, বিশেষ করে ভাষাটা যখন দুর্বল, প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে, তখন তো দূর প্রসারী পরিকল্পনা না নেওয়াই উচিত। হয়তো দেখা যাবে আপনারা যখন 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস'-এ পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেওয়ার তোড়জোড় করছেন, তার আগেই এক প্রজন্মের মধ্যে ভাষার প্রাজন্মিক সেতুটা ভেঙ্গেই পড়ল।

এবার একটা অভাবিত সাফল্যের গল্প শোনাই। হিব্রুভাষার[১৯] পুনরুজ্জীবনের গল্প। যখন পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু হল তার আগের দু'হাজার বছর ধরে এভাষায় কথা বলা হয়নি। যাঁরা এই ভাষাটা সবচেয়ে ভালো জানতেন তাঁরা কথ্যভাষা হিসেবে এর ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। পরিভাষা রচনা থেকেই পুনরুজ্জীবনের শুরু। প্রথমে ছুতোর মিস্ত্রির কাজ আর শিশুপাঠশালার

কাজে লাগে এমন পরিভাষা তৈরিতে হাত দেওয়া হল। প্রতিদিন যে শব্দগুলো আপনাদের কাজে লাগে—বড়োদের প্রাত্যহিক দরকারি শব্দগুলো, আর শিশুদের শেখানোর জন্য শিক্ষকদের যেসব শব্দ দরকার সেগুলোই এর মধ্যে চলে আসে। এই শিশুরা প্রথম দলের শিশু যারা ভাষাটা শিখছে। ঘরে নয়, কারণ বাবা-মা এভাষায় কথা বলতে জানেন না। শিশুরা থাকত সমবায় সমিতির (কিব্বুৎস)[২০] শিশু আবাসে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে। এই অল্পসংখ্যক শিক্ষকরাই হিব্রুতে কথা বলতে শিখেছিলেন। বহু পরিশ্রমেই শিখেছিলেন, স্বাভাবিকভাবে না হলেও, গড়গড় করে বলতে শিখেছিলেন। এদের প্রয়োজন ছিল শিশু-পাঠশালার জন্য একটা শব্দ ভাণ্ডার। বাবা-মায়েদের জন্য খোঁজ পড়ল ছুতোরের কাজের শব্দ ভাণ্ডারের। এই জন্যই বলছি আটপৌরে বিষয় থেকে শুরু করুন। যেখান থেকে মাতৃভাষা শুরু হয় ঠিক সেখান থেকেই পুনরুজ্জীবনের কাজ শুরু করুন এবং তাতেই লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখুন। আর একটা ছোটো পারমর্শ দিতে চাই—প্রাতিষ্ঠানিক বিধি ছেড়ে দিন। ভাষা প্রাতিষ্ঠানিক নয়, বরং আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। এখানেই ভাষার বসবাস। শিশুরা প্রাণবন্ত। তারা খেলে। তারা হাসে। তারা আছাড় খায়। তারা ঝগড়া করে। তারা লাফায়। তারা আব্দার করে। তারা চিৎকার করে।

এবার আসি বাস্কজাতির কথায়। ফ্রাঙ্কো শাসিত স্পেনে তাঁদের নিজস্ব স্কুল চলত গোপনে। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে তাঁরা মরণপণ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। প্রকাশ্যে বাস্কদের মাতৃভাষায় কথাবলা ছিল নিষিদ্ধ। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হত, শাস্তি দেওয়া হত। গুলি করে মারা হত। তাঁদের ভাষাকে করা হল বে-আইনি। তাঁদের ভাষাকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে বলা হত অসভ্য, বর্বর, অশালীন, জান্তব ভাষা। এর ফলে বাস্করা প্রতিরোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্কুল চালাতে লাগল। স্কুলের পাশাপাশি তারা কচিপাঠশালা ও শিশুসেবাকেন্দ্র গড়ে তুলল। লোকে ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পেত। তাদের জাতীয়তাবাদী সংযোগের জন্য ডাক্তাররাও তাদের চিকিৎসা করতে ভয় পেতেন। এ কারণে বাস্করা নিজস্ব স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থাও করেছিল।

সংকীর্ণ ভিতের ওপর তাঁরা বাস্ক ভাষার (ভাষাটার নাম ইউসকারা: অনুবাদক) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেননি। বরং ঠিক বিপরীতটাই

করেছিলেন। স্কুল ছিল সমাজের মধ্যে লিপ্ত একটি আশ্রয়ধাম। এক সমান্তরাল গোপন সমাজের সঙ্গে মিশেছিল স্কুল। স্কুলগুলো নিজস্ব এক সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে তুলেছিল। ভাষার পক্ষে সাংস্কৃতিক পরিসর গড়ে তোলা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মনস্তত্ত্ববিদ জন ম্যাকনামারা আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। তিনি তখনও শিশু। গোটা শৈশব স্কুলে তিনি আইরিশ পড়েছিলেন। স্কুলের কাছেই এক মহিলা আচারের দোকান চালাতেন। বালক জন একদিন ওই দোকান থেকে আচার কিনেই বোনের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে লাগলেন। দোকানদার মহিলা তাকে খুব বকুনি দিলেন, 'তুমি সারাজীবন আইরিশ পড়েছ, তাও ছোটো বোনের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলছ? কোন আক্কেলে? ওর সঙ্গে তোমার আইরিশে কথা বলা উচিত।' রাস্তায় বেরিয়ে বোনটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'আইরিশ কি সত্যি সত্যি কথা বলার জন্য?' হ্যাঁ, এমনটাই ঘটেছিল। তাদের মাথায়ই আসেনি যে আইরিশ কথা বলার জন্য একটা ভাষা। মনে হয়েছিল ভূগোল বা পটিগণিতের মতো এটাও একটা পাঠ্য বিষয়। কটা লোক পথ চলতে চলতে ভূগোল বা পাটিগণিত আওড়ায়? এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক নয়, ভাষার জন্য বাস্তবিক সামাজিক পরিসর তৈরি করা দরকার। আইরিশ পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে আন্দোলনকারীরা সেই পরিসর গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। গড়ে উঠেছিল প্রাপ্তবয়স্ক তরুণ সমিতি, ক্রীড়া সমিতি এবং ভাষাসমিতি—সবগুলোই অল্পবয়সীদের জন্য। পুরো আইরিশ, প্রধানত আইরিশ ও আংশিক আইরিশ স্কুলগুলোকে সরকার স্বীকৃতি দিল। খুব সহানুভূতির সঙ্গে যে স্বীকৃতি দিল তা নয়। এটা একধরনের বাঁহাতের পুজো বা প্রতীকবাদ। স্কুলকে এই প্রতীকবাদ ছাড়িয়ে উঠতে হবে। প্রতীকবাদ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার জন্য আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে। একটা দৃষ্টান্তের কথা বলি। রোমানশ[২১] ও ফ্রিউলিয়ানদের[২২] মধ্যে একটা বিনিময় কর্মসূচি আছে। তারা উপত্যকাটার মধ্যে একে অপরের মাইল দুয়েক দূরত্বে থাকে। কিন্তু কারো সঙ্গে কারো চোখের দেখা নেই। বিনিময় কর্মসূচিতে তারা একে অপরকে টেপ পাঠায়, এটাই হল যোগাযোগ। তারা একে অপরকে খেলা ও ভিডিও পাঠায়। একসঙ্গে সবাই মিলে কিছু একটা করতে হবে, কর্মসূচিতে এমনটা বলা আছে। তাই গোটা পরিবার বসে টেপ শোনে। এটাই বিনিময়ের সুতোয় জোড়া মানুষদের যোগসূত্র রাখা। রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তাদের দেখা হয়না, কথা হয় না, তাদের সঙ্গে খেলাধুলো হয় না।

ভাষার মজবুতিকরণের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ ভাষাসম্প্রদায় গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাফল্য নাও আসতে পারে, সেটা মেনে নেওয়া যায় কারণ পূর্ণ সাফল্য বিরল। যেমন ধরুন হিব্রুর কথা। ইস্রায়েলে ভাষাটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও কথ্য ভাষায় পরিণত। এই পরিস্থিতিতে ইস্রায়েলের শিক্ষামন্ত্রী কয়েকটা ইংরেজি স্কুল খোলার পরিকল্পনা করেন। এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁকে যাচ্ছেতাইভাবে আক্রমণ ও কলঙ্কিত করা হয়। কারণ হিব্রুপন্থীদের একাংশ এখনও তাঁদের ভাষার নিরাপত্তা নিয়ে সুনিশ্চিত হতে পারেননি। অর্থাৎ বাস্তাবে হিব্রু সেখানে নিরাপদ হলেও হিব্রু ইস্রায়েলে নিরাপদ এই বোধ এখনো আসেনি। আবেগগত নিরাপত্তা আসতে একটু দেরিই হয়। কেবেকের[২৩] ফরাসিভাষী কানাডিয়ানরা এখনো নিজেদের সাফল্য নিয়ে সুনিশ্চিত নন। তাঁদের ধারণা তাঁরা নিপীড়িত। কাতালানরাও তাঁদের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা বোধ করেন না। দীর্ঘদিন ধরে যে সংস্কৃতি আঘাতের ফলে আতঙ্কিত অবস্থায় ছিল, তা কাটিয়ে আবার সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। সুতরাং আপনারা যদি পুরো সফল নাও হন, মাওরি, ব্রেটন[২৪] বা অন্য যে কোনো ভাষার নিবেদিত প্রাণ মাতৃভাষাকর্মীরা একে অপরে সঙ্গে অঙ্গীকারে বদ্ধ থাকেন। এর ফলে বিশ্বাসের এক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, এরা সেই সম্প্রদায়ের সদস্য।

উপসংহারে, আমার নাতি-নাতনিদের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলতে চাই। আমার বৌ ল্যাপটপে লেখা ছাপায়। ইড্ডিশ ভাষার এইসব লেখা আমাদের নাতি নাতনিদের জন্য। কিন্তু আসল কথাটা বুঝে নিন, সাচ্চা ল্যাপটপ আছে এখানে, আমার ল্যাপে বা কোলে, বৌ-এর কোলে আর নাতি-নাতনিদের বাপমায়ের কোলে। এটা ভাষার সঙ্গে একটা বাঁধন, যে বাঁধন আমরা বিদায় নেওয়ার অনেক পরেও থেকে যাবে। এটাই ভাষার কোল। আপনারা যদি ভাষার পুনরুজ্জীবন চান, তাহলে আপনাদেরও সন্তান নাতি-নাতনিদের বা অন্য কারো ছেলেপুলে নাতি-নাতনিদের কোলে স্থান দিন। নাতি-নাতনিদের পোষ্য নিন। দাদু দিদাকে পোষ্য নিন। (নজরটান মূলের)

পবিত্রতার সঙ্গে, আত্মীয়তার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগসূত্রের একটা অংশ আপনাদের কোল। আমাদের সম্পন্ন আমেরিকান সমাজে কী ঘটছে দেখা যাক। আমার নাতি নাতনিদের একজন ইতিমধ্যেই একটা ই-মেল অ্যাকাউন্ট খুলেছে। সে দেশের অন্য উপকূলের তুতো-ভাইবোনদের পাঠানোর জন্য আমাকে বার্তা

পাঠায়। বার্তার ভাষাটা ইড্ডিশ, কিন্তু রোমান হরফেই সেটা লিখতে হয় কারণ ই-মেলে শুধু রোমান অক্ষরই চলে। তার অনেক ভুলও হয়। কিন্তু বোঝা যায়। তার বয়স মোটে সাত বছর। এই তো সেদিন পাঠাল, 'আমি একটা কলের পাখি পেয়েছি। সেটা ইড্ডিশ[২৫] বলতে পারে। হা, হা। এটা একটা মজার কথা।'

সুতরাং ভাষালালনের জন্য কয়েকটা পূর্বকর্তব্য অবশ্যই পালন করতে হবে। পারিবারিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক আপনাদেরই গড়ে তুলতে হবে। কারণ কোনো স্কুলই সেটা করবে না। বড়জোর করণীয় কী এটা স্কুলের কর্মসূচিতে রাখা হতে পারে। স্কুলে বুদ্ধিজীবীরা আছেন। স্কুলের একটা বাড়ি আছে, বাজেট আছে, স্থান কাল আছে। কিন্তু স্কুল থেকে শুধু ভাষায় সাক্ষরতা, ভাষার ব্যাকরণ বা শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচয় ঘটালেই চলবে না, এমন কর্মসূচি রাখতে হবে যাতে ঘরের ভেতর ও সম্প্রদায়ের পরিসরে ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তাহলেই ভাষার জীবনপ্রবাহ অবাধে বয়ে যেতে পারে।

ভাষাসরণ[২৬] প্রতিরোধ করে উলটো মুখে বইয়ে দেওয়ার কাজ একটা গবেষণা ক্ষেত্র, একটা ফলিত গবেষণাক্ষেত্র। এটা একটা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্র। এর দিগন্ত নতুন নতুন দিকে বিস্তৃত করে অনেক নতুন জিনিস করবার আছে। স্কুলে যেভাবে আলোকপাত করা হয় তার থেকে অন্য দৃষ্টিকোণে বিষয়গুলোকে দেখার দরকার হতে পারে। ভাষাসরণ প্রতিরোধ করতে গেলে, মাতৃভাষাকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অবাধে প্রবাহিত করতে চাইলে একটা প্রশ্নের মুখোমুখি আপনাদের দাঁড়াতেই হবে—'স্কুলের আগে, স্কুলের ভেতরে, স্কুলের বাইরে এবং স্কুলের পরে মাতৃভাষার ক্ষেত্রে কী হয়?' আমি একটা ভালো প্রশ্ন দিয়ে বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। শেষও করছি একটা ভালো প্রশ্ন দিয়ে—'স্কুলের আগে, স্কুলের ভেতরে, স্কুলের বাইরে এবং স্কুলের পরে আপনারা মাতৃভাষা নিয়ে কী করছেন?' কারণ এই কাজই ভাষার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। ভাষাটা স্বয়ং প্রবাহিত হবে কিনা সেটাও এই প্রচেষ্টায় ঠিক হয়। আপনাদের কাছে এটাই আমার প্রশ্ন। কোনো মস্করা নয়।

অনুবাদ: সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, মে ২০১৯

টীকা

১. **জেমেলনশ্যাফট**

জেমেলনশ্যাফট ও জেসেলসশ্যাফট দুটি পারস্পরিক পরিপূরক জার্মান শব্দ। মোটামুটিভাবে জেমেলনশ্যাফট বলতে বোঝায় সম্প্রদায় এবং জেসেলসশ্যাফট বোঝায় সমিতি। পরম্পরাগত গ্রামসমাজে ও আধুনিক শিল্পসমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলোর পার্থক্য বোঝাতে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফার্ডিনান্ড জি.টনেস ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে পারিভাষিক শব্দ দুটি প্রথম ব্যবহার করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন পরম্পরাগত সমাজে সম্পর্ক আন্তরিক। অন্যদিকে আধুনিক সমাজে তা নৈর্ব্যক্তিক ও নেতিবাচক। ক্ষুদ্রায়তন সমাজে যেখানে সবাই প্রায় সবাইকে চেনে, সেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা স্থিতিশীল এবং সংস্কৃতি সমসত্ত্ব- সম্পন্ন। বৃহদায়তন নগরজীবনে গতি দ্রুততর ও বেশি প্রতিযোগিতামূলক। এখানের সম্পর্ক অনেকটা ওপর-ওপর ক্ষণস্থায়ী ও নামগোত্রহীন। ফিশম্যান পুরনো সমাজবিজ্ঞানী বলতে টনেস-কে বুঝিয়েছেন এবং ভাষা হারালে এই গোষ্ঠীবোধ হারানোর বেদনা অনুভূত হয়, এটাই তাঁর বক্তব্য।

২. **আইরিশ**

কেলটিক পরিবারের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ভাষা। গ্যালিক বা আর্স নামেও এ-ভাষা পরিচিত। প্রধানত আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে এ-ভাষার বাচকদের বাস। সবচেয়ে প্রাচীন ভাষিক নিদর্শন পাওয়া যায় ওখান শিলালিপিতে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দে। ৮ম শতক থেকে ধারাবাহিক সাহিত্যের নিদর্শনও পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আয়ারল্যান্ডে একমাত্র আইরিশ ভাষাই চলত। দুটো প্রধান কারণে এ-ভাষার ক্ষয় হতে থাকে। এক ইংরেজদের কাছে স্বাধীনতা হারানো, দুই উনিশ শতকে আইরিশভাষীদের ব্যাপকসংখ্যায় দেশত্যাগ। দ্রুত এ-ভাষার বাচক সংখ্যা কমে যায়। ১৯২২ সালে ইংরেজির পাশাপাশি আইরিশও দপ্তরের ভাষা হয়। স্কুলেও ভাষাটা পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। আইরিশ ভাষার পুনরুজ্জীবন আন্দোলন চললেও শতাংশের হিসেবে আইরিশবাচকের সংখ্যা ক্ষয় পাচ্ছে।

৩. **বাস্ক**

স্পেনের উত্তরাংশে এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে প্রধানত বাস্ক ভাষাভাষীর বাস। পৃথিবীর সবকটা ভাষাবংশের থেকে আলাদা এই ভাষা। বাচকসংখ্যা ছ'লক্ষের মতো। রোম সাম্রাজ্যের সময় থেকে এ ভাষার কিছু কিছু প্রত্নলিপি পাওয়া গিয়েছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধারাবাহিক সাহিত্যিক ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত শাসন আমলে (১৯৩০-১৯৫০) এ ভাষায় কথা

বলা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। ফ্রাঙ্কোবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাস্করা মুক্তাঞ্চলে বাস্ক ভাষায় সমান্তরাল স্কুলব্যবস্থা চালায়। এখন বাস্ক ভাষার আন্দোলন আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের অংশ হয়ে গেছে।

৪. **কাতালান**

স্পেনের উত্তর পূর্বাংশে এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ অংশে কাতালানদের বাস। মোট বাচকসংখ্যা নব্বই লক্ষ। ভাষাটি রোমান্স পবিবারের অন্তর্গত। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে কাতালান সাহিত্য ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বুরবোঁ রাজবংশের আমলে এবং ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত আমলে কাতালোনিয়ানরা ভাষিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের চাপে পড়ে যায়। স্পেন থেকে কাতালোনিয়ার স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীভূত হয় এই ভাষার পুনরুজীবন আন্দোলন। সম্প্রতি একটা গণভোটও কাতালোনিয়ায় হয়েছে। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার সেটা মানেনি।

৫. **ফ্রিজিয়ান**

জার্মানিক গোত্রের ভাষা। বাচক সংখ্যা সাত লক্ষের কাছাকাছি। বসবাস নেদারল্যান্ডের ফ্রিজল্যান্ড অঞ্চলেই প্রধানত। ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিল বর্তমান। ভাষিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ফলে ফ্রিজল্যান্ড অঞ্চলে সরকারি ভাষার মর্যাদা পেয়েছে।

৬. **কপটিক**

প্রাচীন মিশরীয় ভাষার বিবর্তিত রূপ কপটিক। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মিশরীয় ভাষার এই চূড়ান্তরূপটি দেখা দেয়। গ্রিক বর্ণমালার সংস্কার করে কপটিক লিপি গড়ে ওঠে। শব্দভাণ্ডারেও প্রচুর গ্রিক শব্দের আগমন হয়। প্রধানত কপটিক খ্রিস্টানদের ধর্মচর্চার ভাষা ছিল কপটিক। এখনও ধর্মীয় উপাসনার ক্ষেত্রে ভাষাটির ব্যবহার দেখা যায়।

৭. **আফ্রিকা-আন** (AFRIKAAN)

সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্বেতাঙ্গ ওলন্দাজরা দক্ষিণ আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার করতে থাকে। আফ্রিকার ভাষাগুলোর সঙ্গে দীর্ঘ সংস্রব ও মূল ভূখন্ড থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রবাসে মোড়লী করতে করতে ডাচ ভাষার যে পরিবর্তিতে তদ্ভব রূপ দেখা যায় সেটাই আফ্রিকা-আন। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ এই ভাষার বাচক। এই ভাষার চাপে আফ্রিকার ভূমিজ মাতৃভাষাগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন ও বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।

৮. **মাওরি**

অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষাপরিবারের অন্তর্গত এই ভাষা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের প্রধান ভাষা, বাচক সংখ্যা ষাট হাজার। ভাষাটি বুঝতে পারেন একলক্ষ মানুষ। শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়রা উপনিবেশ স্থাপন করার পর মাওরিদের ইংরেজিভাষী করার জন্য ঘর থেকে শিশুদের টেনে নিয়ে আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে দীর্ঘদিন ধরে তাদের নিজভাষা ও সংস্কৃতি ভোলানোর পরিকল্পনা করে। মাওরি ভাষীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যায়। বিশ শতকের শেষের দিকে ভাষা পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন মাওরি মাতৃভাষা প্রেমিকরা। তাঁদের পরিকল্পিত 'ভাষানীড়' পদ্ধতিতে সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের মাতৃভাষা ও মাওরি সংস্কৃতির মধ্যে কচি বয়স থেকে লালনের ব্যবস্থা হয়। এখন মাওরি নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সরকারি ভাষা ও শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম।

৯. **গ্রিকচার্চ**

খ্রিস্টধর্মের একটি শাখা সম্প্রদায়। এদের ভক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আছেন গ্রিক, রুশ, রোমানিয়ান, সার্বিয়ান, বুলগেরিয়ান, সার্বিয়ান এবং জর্জিয়ানরা। গ্রিক চার্চের কেন্দ্রীয় সংগঠন ইস্তানবুলে। কিন্তু প্রত্যেকটি দেশের চার্চ নিজের নিজের ভাষায় উপাসনা করতে পারে এবং স্বদেশী সংস্কৃতি অনুসরণ করতেও বাধা নেই।

১০. **আরমেনিয়ান চার্চ**

খ্রিস্টধর্মের একটি শাখা। আরমেনিয়ায় তৃতীয় শতাব্দীতে এর উদ্ভব। ২০ লক্ষ মানুষ এই চার্চের অনুসারী। উপাসনার ভাষা হিসেবে প্রাচীন আরমেনিয়ান ভাষা ব্যবহৃত হয়। আধুনিক আরমেনিয়ান ভাষা স্বাধীন আরমেনিয়ার সরকারি ভাষা।

১১. **হিস্পানিক**

স্প্যানিশ ভাষীদের সাধারণ পরিচয়, বিশেষত মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের স্প্যানিশভাষীদের এভাবেই পরিচয় দেওয়া হয়।

১২–১৫. **চিপ্পেওয়া, সেনেকা, ব্ল্যাকফুট, নাভাজো**

উত্তর আমেরিকার জনজাতিদের কয়েকটি ভাষা ও ভাষিক গোষ্ঠীর নাম। এদের মধ্যে এখন মাতৃভাষা সংরক্ষণের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

১৬. **পেনসিলভানিয়া**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য।

১৭. **ল্যাঙ্কাস্টার**

পেনসিলভানিয়া রাজ্যের একটি শহর।

১৮. **কানসাস**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। রাজধানী শহরের নামও কানসাস। মিসৌরি ও কানসাস নদীর সঙ্গমে এর অবস্থান। সুবিস্তীর্ন তৃণভূমিতে পশুপালন এই এলাকার বৈশিষ্ট্য।

১৯. **হিব্রু**

ইহুদিজাতির জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত একটি সেমেতিক ভাষা। ধ্রুপদী বা বাইবেলের হিব্রু থেকে আধুনিক কথ্য হিব্রু পর্যন্ত এই ভাষার ইতিহাস রোমাঞ্চকর। মুখের ভাষা হিসেবে এ ভাষা হারিয়েই গিয়েছিল। শুধু উপাসনার ভাষা হিসেবেই তা টিকে ছিল। জায়নবাদী আন্দোলনের অংশ হিসেবে উনিশ শতাব্দীতে হিব্রুকে কথ্য ও আধুনিক কাজকর্মের ভাষা হিসেবে চালানোর চেষ্টা চলে। প্যালেস্টাইনের এক অংশে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর চমকপ্রদ গণ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এক প্রজন্মের মধ্যেই হিব্রু কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। ডানদিক থেকে বাঁদিকে হিব্রুভাষা লেখা হয়।

২০. **কিব্বুৎস**

ইস্রায়েলের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত সমবায় গ্রাম সমাজ।

২১. **রোমানশ**

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের অন্যতম ভাষা লাতিন। এই ভাষার কথ্যরূপের বিবর্তনের ফলে রোমান সাম্রাজ্যের ইতালীয় পরিবারের যে ভাষাগুলোর জন্ম ও বিকাশ ঘটে তাদের সাধারণ গোষ্ঠীগত নাম রোমানশ। এই গোত্রের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে আছে ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ইতালীয় ও রোমানিয়ান।

২২. **ফ্রিউলিয়ান**

রোমানশ পরিবারের পূর্বাঞ্চলে, মূলত ভেনিসের উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত একটি ভাষা।

২৩. **কেবেক**

পূর্বকানাডার একটি প্রদেশ। ৮৩ শাতাংশ মানুষ ফরাসিভাষী। ১৭ শতাংশ ইংরেজি ভাষী। ১৯৮৯ সালের ভাষাআইনে রাস্তায় ইংরেজিভাষার কোনো পথ নির্দেশক পট লাগানো নিষিদ্ধ হয়। কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য কেবেকে যে গণভোট হয় তাতে মাত্র ১ শতাংশ ভোটে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি পরাস্ত হয়।

২৪. **ব্রেটন**

কেলটিক পরিবারের ব্রাইথনিক শাখার একটি ভাষা। ফ্রান্সের ব্রিটান্নি অঞ্চলের পাঁচলাখের মতো অধিবাসী এই ভাষায় কথা বলেন ব্রিটান্নিতে আঞ্চলিক সরকারি

ভাষা হিসেবে ব্রেটন স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ভাষাসরণের ফলে বাচক সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

২৫. **ইড্ডিশ**

নবম শতাব্দী থেকে মধ্যইউরোপে এই মিশ্রভাষাটির উদ্ভব ঘটে। সেমেতিক, জার্মানিক ও স্লাভিক তিনটি পরিবারের ভাষার উপাদান এতে দেখা যায়। ইহুদি জাতির সাধারণ ভাষা হিসেবে এটি গণ্য হয়। লিখিত সাহিত্যেই ইড্ডিশ সমৃদ্ধ। ১৯৭৪ সালে মার্কিন ইহুদি লেখক ইড্ডিশ ভাষায় লেখা সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

২৬. **ভাষাসরণ**

ধীরে ধীরে বা হঠাৎ কোনো বাচক বা কোনো গোষ্ঠীর বাচকরা যদি নিজের মাতৃভাষা থেকে অন্যভাষা ব্যবহারের দিকে সরে যেতে থাকে, তাকে ভাষাসরণ বলে। সাধারণত অভিবাসীদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এক ভাষা অঞ্চল থেকে ক্ষমতাবান কোনো ভাষা অঞ্চলে অভিবাসনের ফলেও ভাষাসরণ ঘটে। ভাষাসরণ অনেক সময় ভাষামরণের পূর্বাভাস দেয়।

বৈচিত্র্যের জন্য লিখন

ন্‌গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো

উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বায়ন ও সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে ন্‌গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তাঁর নিজের মাতৃভাষা সহ আফ্রিকার ভাষাসমূহের ভাষিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেও তিনি অগ্রগণ্য যোদ্ধা। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে ইংরেজি ভাষায় ঔপন্যাসিক হিসেবে সাফল্য ও খ্যাতি পেয়েছিলেন। তখন তিনি নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে আফ্রিকার ভাষাসমূহের অস্তিত্বকে প্রান্তে ঠেলে দিয়ে বিপন্ন করে তোলা ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ভাষা ইংরেজিতে তিনি আর লিখবেন না, নিজের মাতৃভাষা গিকুয়ুতেই লিখবেন। গিকুয়ু ভাষায় তিনি কিছু নাটক লেখেন, যার জন্য তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি গিকুয়ু ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। এরপর রাষ্ট্রের কোপে তিনি দেশ ছেড়ে নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য হন। তাঁর লেখনীতে প্রতিস্পর্ধার সুর ক্রমশ আরও খর হয়েছে। তাঁর লেখনী থেকে আমরা ক্রমাগত পেয়ে আসছি বিবিধ প্রবন্ধ, তত্ত্ব ও প্রায়োগিক উদ্যোগ, যার বিষয়: মনকে অন-উপনিবেশিত করা, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক সাম্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করে প্রতিস্পর্ধী বহুত্ববাদী পরিসর গড়ে তোলা ও সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়। ইদানীন্তন তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিষয়ক বিভাগে অধ্যাপনারত।

১৯৯৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এক সারি বক্তৃতা দেন, যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তাঁর বই: 'পেনপয়েন্টস, গানপয়েন্টস অ্যান্ড ড্রিমস: টুওয়র্ডস ও ক্রিটিকাল থিয়োরি অফ দি আর্টস অ্যান্ড দি স্টেট ইন আফ্রিকা'(ক্লারেনডন প্রেস, ১৯৯৮)। এখানে প্রথম ভাগে সেই বইয়ের তাঁর নিজের

করা একটি সারসংক্ষেপ অনূদিত হল 'লেখক, রাষ্ট্র এবং ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য' উপ-শিরোনামে। 'ভাষাসমূহের মধ্যে বৃহত্তর সাম্যের জন্য কিছু নীতি' উপ-শিরোনামের অংশে ন্গুগি ওয়া থিয়োঙ্গো উত্তর দিয়েছেন রবার্ট ফিলিপসন-এর করা তিনটি প্রশ্নের, যার মধ্য দিয়ে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রাখার সংগ্রামে তাঁর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অবস্থানের পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই গোটা লেখাটাই ইংরেজি ভাষায় ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রবার্ট ফিলিপসন, সম্পাদিত 'রাইটস টু ল্যাংগুয়েজ: ইকুইটি, পাওয়ার অ্যান্ড এডুকেশন' গ্রন্থে যা টোভ স্কুটনাব-কাঙ্গাস-এর ৬০ তম জন্মদিন উদ্‌যাপনে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকেই বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। —বিপ্লব নায়ক

লেখক, রাষ্ট্র এবং ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

এই চারটি বক্তৃতায় শিল্পকলার অবস্থা ও রাষ্ট্রের কলাকৌশল সম্পর্কে আমি বেশ কিছু আলোচনা করেছি। এই আলোচনার ইতি টানতে চাই রাষ্ট্রের ক্ষমতার প্রতি ও ব্যাখ্যার সমস্যার প্রতি শিল্পীর প্রতিক্রিয়ার বিষয় দিয়ে। এমনটা অবশ্যই সম্ভব যে শিল্পী চুপ করে গিয়ে, নিজের উপর নিজের নজরদারি লাগু করে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে পারে, অথবা নিতান্তই রাষ্ট্রের বেদিতে পুজো চড়ানোর সারিতে যোগ দিতে পারে। তা করলে সে লেখক/লেখিকা হিসেবে নিজের সত্তাকেই নাকচ করবে, কারণ, আমি আমার প্রথম বক্তৃতাতেই বলেছি যে সেই আয়না আয়নাই নয় যা তার চতুষ্পার্শ্বকে প্রতিফলিত করে না। নিজ চতুষ্পার্শ্বের মানুষদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা এবং পরিবর্তন, প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য তাদের মধ্যের গভীরতম আকুতি ও সংগ্রামকে ভাষা দেওয়া ব্যতিরেকে লেখক/লেখিকার অন্য কোনো উপায় নেই। রাষ্ট্র যেখানে চুপ করিয়ে দিতে চায়, শিল্পের কাজ সেই চুপকথাকে ভাষা দেওয়া। যেখানে, ধরা যাক, বাকি জনগণের জন্য কোনো গণতন্ত্র নেই, লেখকের জন্যও সেখানে কোনো গণতন্ত্র থাকতে পারে না। যেখানে কারাগারের বাড়বাড়ন্ত, লেখকও সেখানে কারাগারে বন্দি। ঘিঞ্জি উপেক্ষিত বস্তিতে যেখানে মানুষকে প্রান্তবাসী করে রাখা হয়, শিল্পীরাও সেখানে প্রান্তিক। তাই আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা সহ গোটা বিশ্বে লেখক/লেখিকাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে স্ব-সংগঠনের শক্তির প্রকাশস্বরূপ নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য আধিপত্যকামী রাষ্ট্রীয়

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বাকি জনগণের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। তাই শৈল্পিক প্রচেষ্টার একটি আবশ্যিক অংশ হল জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের জন্য সংগ্রাম। জনগণের প্রকৃত ক্ষমতায়নই সেই একমাত্র দৃঢ় ভিত্তি যার উপর শিল্পীর স্বাধীনতা বিকশিত হতে পারে। 'আটক: এক লেখকের কারাগার কড়চা' [ডিটেইনড: এ রাইটারস প্রিজন ডায়েরি] নামক আমার বইটা যখন আমি কাউকে সই করে দিই, তখন আমি কারাগার ও ডিটেনশন ক্যাম্প বিহীন এর পৃথিবীর আশা প্রকাশক বার্তা সঙ্গে লিখে দিই। অন্য কথায় বললে, সেই আশা এমন এক পৃথিবীর আশা যেখানে কারাগার, ডিটেনশন ক্যাম্প, সেনাবাহিনী, পুলিশ ব্যারাক—এ সব অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। সংক্ষেপে এমনটাও বলা যায় যে তা এমন এক পৃথিবী যেখানে মানবজীবন সংগঠনের জন্য আমাদের পরিচিত চেহারার রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যে সমস্ত শর্তের কারণে সেই সমস্ত শর্তকে নির্মূল করে দূর করা গেছে। একমাত্র তখনই মানবসভ্যতার সঙ্গে সেই বর্বর প্রতিমার সাদৃশ্যমোচন হবে যে প্রতিমার বর্ণনা মার্কস করেছিলেন মানুষের করোটি করে সুধাপানরত রূপে। এ হয়ত সেইসব উত্তর-আধুনিক বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে, যে বাগাড়ম্বরে সঙ্করত্ব (হাইব্রিডিটি), ধোঁয়াশা (অ্যামবিগুইটি), সিদ্ধান্তহীনতা (ইনডিসিশন), এবং বিকল্প গুলিয়ে দেওয়াকে একটি সর্বজনীন সাধারণ অবস্থা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। একটি উপাদান হিসেবে সন্দেহ সর্বদাই শিল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণ দৃষ্টিতে সম্পর্কহীন বিষয়ের মধ্যেও সম্পর্ক ও যোগাযোগ অন্বেষণ করে শিল্প। আর খুবই জরুরি হল মানুষ যাতে যে কোনো নিশ্চয়তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে, বিশেষত রাষ্ট্রক্ষমতাধারীরা যে সব নিশ্চয়তা প্রচার ও লালন করতে চায় সেসবকে সন্দেহ করে। যেমন ধরা যাক, একটি জাতির ভিতরে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে গুটিকয়ের সম্পদ ও বৃহদংশের দারিদ্রের মধ্যে যোগাযোগগুলো দেখা জরুরি। কিন্তু আমাদের সম পরিমাণেই সতর্ক থাকা উচিত তেমন কোনো বাগাড়ম্বর সম্পর্কে যা কোটি কোটি ভিখারীর কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে কোটি কোটি অর্থ আত্মস্থকারীদের তৈরি করা সমাজ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে হ্যামলেট-সুলভ সিদ্ধান্তহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়। বা, সতর্ক থাকা উচিত তেমন ভাষাব্যবহার সম্পর্কে যা সামাজিক দুর্দশা সম্পর্কে মানুষের বোধকে ভোঁতা করে দিতে পারে।

যেমন ধরা যাক, ভিক্ষা করাকে ক্রিয়া স্বাধীনতার অনুশীলন হিসেবে দেখানো বা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে ফিনান্স পুঁজির স্বাধীনতার সমীকরণ তৈরি করা। পুঁজিবাদী মৌলবাদের উত্থান এবং তা দ্বারা সঞ্চারিত ডারউইনিয় নৈতিকতার কাঠামো পৃথিবীর জন্য একটি বিশেষ বিপদ হিসেবে দেখা দিয়েছে। তা হল অন্য সমস্ত মৌলবাদের জনক—অন্য সমস্ত ধর্মীয় বা জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ তার বিরুদ্ধাচরণ করে বা তার সহযোগী হিসেবে বিকাশলাভ করছে। 'বেসরকারীকরণ কর অথবা উচ্ছন্নে যাও'—এই ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা যে সর্বনাশ সে ছড়াচ্ছে, সে সর্বনাশের মুখোমুখি হলে অপাপবিদ্ধতার মুখোশে সে তার মুখ ঢাকছে—ঠিক যেন গ্রাহাম গ্রিন-এর 'শান্ত মার্কিনী' (কোয়ায়েট আমেরিকান) বা মার্কিনী, দূরদর্শন প্রহসন 'ফ্যামিলি ম্যাটারস'-এর কোনো কৌতুক চরিত্র, আর ভান করে বলছে, 'এ কি আমার কাজ?' বস্তুতপক্ষে, কোনো জাতির ভিতরে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিক্ষাপ্রদান ও ভিক্ষাগ্রহণকে আবশ্যক করে তোলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শর্ত, সেই সমস্ত শর্তের বিলোপের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা থাকা উচিত নয় এবং সেই প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষের বোধকে তীক্ষ্ণ করে তোলার কাজ হল ভাষার কর্তব্য।

কোনো জাতির ভিতরে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে খাড়া করা নিদারুণ অসাম্যগুলোর দেখভালকারী ও রক্ষক হিসেবে যতদিন রাষ্ট্র কাজ করবে ততদিন শিল্পী ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ থাকবে সর্বক্ষণ। জুবের (Joubert) এবং সম্ভবত শেলির প্রতিধ্বনি করে ম্যাথু আর্নল্ড একদা বলেছিলেন:

> বল ও অধিকার দুই-য়ে মিলে ছিল এই জগতের প্রশাসক, কিন্তু আসল প্রশাসনক্ষমতা বল-এর হাতেই ন্যস্ত থাকবে যতদিন না অধিকার তৈরি হয়ে উঠছে। অধিকার একটি নৈতিক বিষয় এবং তার জন্য প্রয়োজন অন্তরের স্বীকৃতি, স্ব-ইচ্ছার স্বাধীন স্বীকার। এই অধিকারের জন্য আমরা প্রস্তুত নই, অধিকারও অন্তত আমাদের জন্য প্রস্তুত নয়, যতক্ষণ না আমরা এই দেখার ও স্ব-ইচ্ছার মাধ্যমে চাওয়ার বোধ আয়ত্ত করতে পারছি। আমাদের জন্য যে উপায়ে অধিকার বল-কে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করার মধ্য দিয়ে জগতের প্রকৃত প্রশাসক হয়ে উঠতে পারে তা নির্ভর করছে কীভাবে আমরা সময় হলে তাকে দেখতে ও স্ব-ইচ্ছার চাইতে

> পারছি তার উপর। [‘ম্যাথু আর্নল্ড, ‘এসেজ ইন ক্রিটিসিজম’ গ্রন্থের’ দি ফাংশন অফ ক্রিটিসিজম’ প্রবন্ধ, নিউ ইয়র্ক: চেলসি হাউস, ১৯৮৩, পৃ.]

জগতের কোনো জাতির অভ্যন্তরে বা বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের একটি নৈতিক বিশ্বকে দেখতে পারা ও স্ব-ইচ্ছার মাধ্যমে কামনা করার পথগুলোকে তৈরি করা নিশ্চিতভাবেই শিল্পকলার একটি বিশেষ কর্তব্য। স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার স্বপ্নই হল শিল্পকলা।

আশা রাখতে হবে যে এমন সময় আসবে যখন নাগরিক সমাজের ক্ষমতা এমনভাবে রাষ্ট্রকে তার অধীনস্থ করবে যে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে, ঠিক যেমন মার্কস ও এঙ্গেলস পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, এবং নেহাতই মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনার একটা সরল যন্ত্র হয়ে উঠবে, সংখ্যাগুরুকে শ্রেণিগতভাবে দমন করার হাতিয়ার হিসেবে রাষ্ট্রের চরিত্র শুকিয়ে গিয়ে বিলুপ্ত হবে। আর যেমন কোনো কোনো পুঁজিবাদ-পূর্ব সমাজে দেখা গিয়েছিল, তেমনভাবেই হয়ত পুঁজিবাদ-উত্তর এমন এক সমাজ হবে যেখানে অপরের উপর সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে উৎপাদন চালিত হবে না, বরং চালিত হবে মানবিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে, তেমন সমাজে আবার সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতা চালকের আসন নেবে। কিন্তু তা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। আমার বিবেচনায়, তেমন এক জগতের জন্মগ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিল্পকলা কেবল যে ভূমিকা নিতে পারে তা ‘জন দি ব্যাপটিস্ট’-এর ভূমিকার সঙ্গে তুলনীয়। সে ভূমিকা শিল্পকলা নিতে পারে মানব সৃজনশীলতা ও স্ব-সংগঠনের ক্রিয়াশীলতার পরিসরগুলোকে বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে নাগরিক সমাজকে শক্তিশালী করে তোলার মাধ্যমে। সেই মার্কসই বলেছিলেন যে দর্শনের উদ্দেশ্য তদবধি প্রধান হিসেবে থাকা জগতকে ব্যাখ্যা করার কাজ নয়, বরং জগতকে পরিবর্তন করা। আর গায়ানার মার্টিন কার্টার একই রকম মুখরভাবে শুনিয়েছেন তাদের কথা যারা স্বপ্ন দেখতে নিদ্রায় যায় না, বরং জেগে থেকে জগতকে বদলাবার জন্য স্বপ্ন দেখে। প্রশ্নটা হল, বদল করে কী গড়া হবে এবং কার স্বার্থে গড়া হবে? আমার বিবেচনায়, মানবজীবনকে সীমাবদ্ধতায় বেঁধে রাখে যে সমস্ত শর্ত, তাদের পাল্টানো শিল্পকলার লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যধাবনই সংঘাতের জন্ম দেয় সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে, যে রাষ্ট্রের সঙ্গে এখনও অবধি আমাদের পরিচয় হয়েছে অফ্রিকা

সহ গোটা বিশ্বে। এহেন পরিস্থিতিতে এমন এক বিশ্বের স্বপ্নকে কলম সহযোগে করে প্রকাশ করার অধিকার শিল্পকলার আছে যে বিশ্বে আর যাই হোক কোনো কারাগার ও বন্দুকের শাসানি থাকবে না।

ভাষাসমূহের মধ্যে বৃহত্তর সাম্যের জন্য কিছু নীতি

প্রশ্ন: গিকুয়ু ভাষায় আপনি একটা বড় উপন্যাস লিখেছেন, যা একই সঙ্গে গিকুয়ু ও সোয়াহিলি ভাষায় প্রকাশিত হতে চলেছে। এই বইটি প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কী অর্জিত হবে বলে আপনি আশা করছেন?

উত্তর: সদ্য যে উপন্যাসটি আমি শেষ করেছি, অন্তত তার এই তৃতীয় দফা, তার নাম দিয়েছি 'মুরোগি ওয়া কাগুগো', যার আক্ষরিক অর্থ 'আকাশ থেকে পাখি নামিয়ে আনতে পারে যে জাদুকর'। তা বেশ বড়, আন্দাজ করা হয়েছে যে তার মুদ্রিত সংস্করণ প্রায় সাতশো পাতার হবে। আফ্রিকার যে কোনো ভাষায় তা হতে চলেছে সর্ববৃহৎ উপন্যাস, অন্তত আয়তনের নিরিখে, যদিও আমার আশা যে তা সত্য হবে বিষয়বস্তুর নিরিখেও। আমি সবকিছুর আগে একজন ঔপন্যাসিক, একজন শিল্পী, যে স্বাভাবিকভাবেই আগ্রহী তার পাঠকদের মনোযোগ অধিকার করতে পারে এমন এক আগ্রহোদ্দীপক গল্প লিখতে। সেই হিসেবে আয়তন হয়ত চরম গুরুত্বের কিছু নয়। বিশেষত যদি খেয়াল করা যায় যে দীর্ঘ দীর্ঘ সময়কাল ধরে টিকে থাকা গল্পগুলোর কিছু, যেমন ঈশপ, অ্যান্ডারসন ও গ্রিমভাইদের গল্প বা আফ্রিকার ধ্রুপদী মৌখিক ধারার গল্প, কেবলমাত্র কয়েক পাতা দীর্ঘ। তবু, যাই হোক না কেন, আমার লেখা বইটি যদি শিল্পের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারে, তাহলে তার বিপুলায়তন আফ্রিকার ভাষাগুলোর সক্ষমতা ও সম্ভাব্য শক্তির দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এর জন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা ও অঙ্গিক সমগুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকার ভাষাসমূহের সঙ্গে সাধারণত এমন শীর্ণদেহ লেখনী সংযুক্ত করে ভাবা হয় যেগুলো অত্যন্ত খারাপ মানের কাগজে, নিকৃষ্ট সম্পাদনা ও প্রকাশনায় ছাপা হয়েছে। এমনকি আফ্রিকার ভাষাগুলো যাদের

মাতৃভাষা সেই বাচকদের জন্যও আফ্রিকার ভাষার সঙ্গে প্রকাশনাক্ষেত্রে সদর্থক প্রতিমা সংযুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে এটাও আমার কাছে খুশির বিষয় যে উপন্যাসটির ব্যাপ্তি ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই বিস্তৃত, সেইসঙ্গে সময় কালের দিক থেকেও তা গভীর বিস্তৃত। উপন্যাসটির মধ্যে এসেছে ভারত, লাতিন আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং আফ্রিকার কথা। মিশর ও ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন সংস্কৃতি, অভিবাসী আফ্রিকিয়দের ইতিহাসপট, সমস্তকিছুই সংক্ষেপে হলেও উল্লিখিত হয়েছে, হাজির হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে আফ্রিকা, একটি কাল্পনিক দেশ আফুরুরিয়ার মাধ্যমে। তাই আমি আশা করি যে উপন্যাসটি আফ্রিকার ভাষাসমূহের সম্ভাবনার আরও একটি নির্দেশক হয়ে উঠবে এবং সেই সূত্রেই যে সমস্ত ভাষাকে আজ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে বিপন্ন করে তোলা হয়েছে, তাদের সম্ভাবনারও নির্দেশক হবে। কেনিয়ার যে প্রকাশনা সংস্থা বইটি প্রকাশ করেছে, ইস্ট অফ্রিকান এডুকেশন পাবলিশার্স, তারা বইটির গিকুয়ু ও সোয়াহিলি সংস্করণ একসঙ্গে প্রথমে প্রকাশ করতে চায়, পরে, সম্ভবত এক বছর পরে, ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা আছে। এর মধ্যে দিয়েও আমরা আফ্রিকার ভাষাসমূহের প্রতি পক্ষপাত করতে চাই, অন্তত কোন ভাষার সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হল, সেই দিক থেকে। একই ভাবনা থেকে, আফ্রিকা ওয়ার্ল্ড প্রেস একটি গিকুয়ু ভাষার মার্কিনী সংস্করণ প্রকাশিত করতে চলেছে।

প্রশ্ন: গিকুয়ু ভাষার একটি পত্রিকা, 'মুতিরি'-র সঙ্গে আপনি যুক্ত আছেন, যে পত্রিকা সাহিত্যিক ও সমাজ- রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ধারণ করে। এই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতে কী ভূমিকা পালনের কথা আপনার ভাবনায় আছে?

উত্তর: 'মুতিরি' পত্রিকা সম্পর্কেও আমার ভাবনা একই রকম। 'মুতিরি' আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত এমন একটি পত্রিকা যা পুরোপুরি গিকুয়ু ভাষায় লিখিত। ১৯৯৫-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৯৯-এর জুলাই পর্যন্ত আমরা সাতটি সংখ্যা প্রকাশ করতে পেরেছি। এই প্রতিটি সংখ্যা

১৬০ পাতার, যাতে আছে ইতিহাস থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন বিষয়ে গদ্য, পদ্য ও প্রবন্ধ। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়-এর একটি ছোট অনুদানের অর্থানুকূল্যে এই পত্রিকাটি তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগের দ্বারা পোষিত। এটি এখন আফ্রিকা ওয়ার্ল্ড প্রেস দ্বারা প্রকাশিত হয় এবং কেনিয়াতে এর বিতরণের কাজ করে ইস্ট আফ্রিকান এডুকেশনাল পাবলিশার্স। আগে যেমন বলেছি, এক্ষেত্রেও আমার আশা যে পত্রিকাটি একটি আদর্শ ও প্রমাণস্বরূপ হয়ে উঠবে। এই মাত্রার ও বিষয়বস্তু ভাবনার এহেন বিস্তার সম্পন্ন কোনো পত্রিকা এর আগে গিকুয়ু ভাষায় হয়নি। যেহেতু গিকুয়ু ভাষার বর্তমান অবস্থা অন্য আফ্রিকার ভাষাসমূহের সাপেক্ষে একই রকম, আমার আন্দাজ যে অন্যান্য ভাষার বুদ্ধিজীবীরাও বলতে সমর্থ হবে যে 'মুতিরি' যা অর্জন করতে পেরেছে তা তাদের পক্ষেও করা সম্ভব, এমনকি অরো ভালো করাও সম্ভব। এমন একটা পরিস্থিতির কথা আমি ভাবি যখন এমনই সমস্ত পত্রিকা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন লেখা বিনিময় করতে শুরু করেছে, একে অপরে অনুবাদের মাধ্যমে ভাগ করে নিচ্ছে, আর সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আফ্রিকার ভাষাসমূহের মধ্যে এবং আফ্রিকার ভাষসমূহের সঙ্গে অন্য ভাষার মধ্যে কথোপকথন শুরু করতে সাহায্য করছে। ইতিমধ্যেই 'মুতিরি' সফল হয়েছে এমন লেখকদের আকৃষ্ট করতে যারা আগে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষাতেই লিখত। তার সঙ্গে আছে সেই সমস্ত লেখকরাও যারা গিকুয়ু ভষাতে দক্ষ কিন্তু যারা ভাবতে পারত না যে গিকুয়ু ভাষায় তাদের লেখাপত্র প্রকাশের কোনো মঞ্চ তৈরি হতে পারে। 'মুতিরি' পত্রিকা ইতিমধ্যেই সেই সমস্ত লেখকদের প্রকাশের মঞ্চ করে দিয়েছে যারা কেবলমাত্র গিকুয়ু ভাষাতেই লেখে এবং এই প্রথম লিখছে। 'মুতিরি' পত্রিকায় অন্য ভাষা থেকে অনুবাদও, যেমন স্প্যানিশ ভাষা থেকে অনুবাদ, স্থান করে নিয়েছে এবং আশা করা যায় যে তা বহাল থাকবে।

প্রশ্ন: আপনার সাম্প্রতিকতম বই, 'পেনপয়েন্টস, গানপয়েন্টস অ্যান্ড ড্রিমস' একজন স্বাধীন লেখক ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগ্রামের চরিত্র ব্যাখ্যা

করেছে। 'মনকে অন-উপনিবেশিত করার ('ডিকলোনাইজিং দি মাইন্ড') বিশ্লেষণকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তা দেখিয়েছে আদর্শ উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা নীতি কীভাবে মানুষকে তার মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বিযুক্ত করে দেয়। টোভ স্কুটনাব-কাঙ্গাস বহু দশক ধরে যার জন্য সংগ্রাম করছেন, তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, তা হল মাতৃভাষার ব্যবহার এবং ভুবনীকরণ ও মদমত্ত ফিনান্স পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রাখার অধিকার। উত্তর ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে-দানবের যে উদরে আপনার প্রবাস আপনাকে বয়ে এনেছে—উভয় ক্ষেত্রেই আপনার বার্তা কতটা জ্ঞাপন করা সম্ভবপর হচ্ছে বলে আপনি বোধ করছেন?

উত্তর: টোভ স্কুটনাব কাঙ্গাস-এর কাজকে আমি সম্মান করি, বিশেষ করে সম্মান করি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রবহমান ভাবনার মূল সূত্রটিকে,যা বলে যে সব ভাষাই সমগুরুত্বের—কেউ বড় বা ছোট নয়। এই অর্থে বড় ভাষা বা ছোট ভাষা বলে কিছু হয়না, পার্থক্য কেবল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কত সংখ্যক মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলেন, তার। আমিও তাই-ই মনে করি এবং আমার 'ডিকলোনাইজিং দি মাইন্ড' ও 'পেনপয়েন্টস, গানপয়েন্টস অ্যান্ড ড্রিমস'—উভয় বইতেই আমার অন্যতম মৌলিক প্রাথমিক অনুমান হল এই। আজকের এই পর্যায়ে এখনই এই দুটি বইয়ের ও বাস্তবত স্কুটনাব-কাঙ্গাস-এর কাজের বা আপনারও (রবার্ট ফিলিপসন) কাজের ফল মাপা কঠিন। কিন্তু এক্ষেত্রে নড়াচড়া গতির চিহ্ন নজর করা যায়। আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষায় কিছু প্রকাশনা আমার নজরে এসেছে যেখানে 'মনকে অনউপনিবেশিত করা' (ডিকলোনাইজিং দি মাইন্ড) বহুবার লেখায় উঠে এসেছে। আর যেখানেই আমি ভাষণ দিতে গেছি, যেমন ধরা যাক হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জতে, ভাষার প্রশ্নটি উঠে এসেছে। প্রান্তে ঠেলে দেওয়া বিপন্ন ভাষাগুলোর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিজ আত্মা অন্বেষণের একটা প্রক্রিয়া চলছে, আমি আশা রাখি যে এই প্রক্রিয়া সমাপনে এই সমস্ত লেখকদের ভাষিক অভ্যাসে পরিবর্তন আসবে। এই ক্ষেত্রে জরুরি আফ্রিকায় 'সব প্রতিকূলতার

বিরুদ্ধে: একুশ শতকে প্রবেশমান আফ্রিকার ভাষাসমূহ ও সাহিত্য' শীর্ষক সম্মেলন, যা ২০০০ সালে এরিত্রিয়া-র আসমারায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই সম্মেলন সমাবেশিত করবে আফ্রিকার ভাষাসমূহের সেই সমস্ত লেখক, গবেষক ও প্রকাশকদের যারা আফ্রিকার ভাষার বাচক গোষ্ঠীরা বাস্তবে যে সমস্যার সম্মুখীন তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়। সম্মেলনটির লক্ষ্য আফ্রিকার ভাষাসমূহে হওয়া লিখনকে দৃষ্টিগোচর করা, আফ্রিকার ভিতরের ও বাইরের গবেষকদের আফ্রিকার ভাষাসমূহ সম্পর্কে মনোভাব/ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে পরিবর্তিত করা, এবং এত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আফ্রিকার ভাষাগুলো যে আজও সজীব, আজও মরতে নারাজ, সেই জীবনীশক্তির উদযাপন করা। এই সম্মেলনের আহ্বানপত্রের এবং আমার বই 'পেনপয়েন্টস, গানপয়েন্টস অ্যান্ড ড্রিমস'-এর ভাবনার সঙ্গে টোভ স্কুটনাব কাঙ্গাস-এর কাজে নিহিত তাত্ত্বিক অনুমান ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্খা সম্পূর্ণ সমানুসারী। এই সম্মেলন হল সেই ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা নিয়ে দাঁড়ানো, যে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের কথা আপনি (রবার্ট ফিলিপসন) আলোচনা করেছেন। এই সম্মেলন হল ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বাস্তবতার স্বীকৃতি। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রকৃত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেই।

অনুবাদ: বিপ্লব নায়ক

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৯

আত্মহননের বহুৎসব ও জাতি-রাষ্ট্রের কারাগার

বিপ্লব নায়ক

'আমি বুঝতে পারি না কেন আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে যখন কোন জাতি তার নিজের লোকজনের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে XXXX হতে থাকে।'—আপনিও কি এমনটাই মনে করেন? সত্যি তো, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা'-র নিষ্ক্রিয়তা কী করেই বা শ্রেয় হতে পারে? আপনিও কি তাই জাতিকে তার নিজের মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার' ফল থেকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পক্ষে? একে কি আপনি সেই অপর জাতির প্রতি 'সহমর্মিতা' ও 'মানবিক কর্তব্যের' অংশ বলেই ধার্য করছেন? দাঁড়ান, এখনই সিদ্ধান্ত কবুল করার আগে আরেকটু খতিয়ে দেখা যাক যে কোনো জাতির নিজের মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' সে জাতিকে এমন কোন দুরবস্থায় ফেলতে পারে যা থেকে উদ্ধারের জন্য বাইরের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে ওঠে। এই 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা'-ই বা কীরূপ? কিছু উদাহরণ ধরা যাক:

ক) 'ক' জাতির দর্শকের মনে হল যে 'খ' জাতির মানুষরা 'অলস, নিষ্কর্মা, অনুদ্যোগী', তাই 'খ' জাতি জীবনযাত্রার 'নিম্নমান', 'অভাব-অনটন' ও 'পশ্চাৎপদতা'-র পাঁকে আটকে রয়েছে, তা থেকে তাকে মুক্ত করা দরকার।

খ) 'ক' জাতির দর্শকের মনে হল যে 'খ' জাতির মানুষরা 'বুদ্ধি ও মেধা'-য় খাটো, তাই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি 'অবিকশিত' ও 'দীন'। এর থেকে

উদ্ধারের জন্য 'ক' জাতির 'উন্নত' ভাষা ও সংস্কৃতি দিয়ে সেই 'দীন, অবিকশিত' ভাষা-সংস্কৃতিকে প্রতিস্থাপিত করে খ-জাতির 'বিকাশের দরজা' খুলে দিতে হবে।

গ) 'ক' জাতির আয়ত্ত করা 'আধুনিক' সমাজ-সংগঠনের রীতি এবং রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনার রীতি 'খ' জাতির অনায়ত্ত দেখে 'ক' জাতির দর্শকের মনে হল যে 'খ' জাতি মানবপ্রগতির 'বিবর্তনের ধারায়' বহু পিছে পড়ে আছে বলেই এহেন 'দুর্গতি'। তাই 'খ' জাতির 'প্রাগাধুনিক' রীতিরেওয়াজের লোপ ঘটিয়ে 'আধুনিক' রীতিপদ্ধতি জোর করে চালু করার মধ্য দিয়েই 'ইতিহাসের থমকে যাওয়া গতিতে' বেগসঞ্চার করতে হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আলোচনা শুরুর উদ্ধৃতিতে 'XXXX' চিহ্নিত শূন্যস্থানে 'পশ্চাৎপদ' 'অবিকশিত', 'অনাধুনিক' 'মান্ধাতার যুগে আটকে থাকা' এহেন পদ/পদসমষ্টি বসানো যায় এবং-সে জাতির নিজের লোকদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' বলতে তাদের 'অলসতা, অনুদ্যোগ, বুদ্ধিহীনতা, মেধাহীনতা, ভাষার খামতি, সেকেলেপনা' ইত্যাদি বোঝানো হতে পারে। আর সে অবস্থায় 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না দেখা'-র মানে হল 'খ' জাতির ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারের 'ইতিহাসের নিয়মে লুপ্ত হওয়ার ভবিতব্যকে' ত্বরান্বিত করে 'ক' জাতির উন্নত ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারে নিমজ্জিত হতে তাদের বাধ্য করা। এইভাবে দেখার চোখ কল্পনার বস্তু নয়। সতেরো শতক থেকে চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে ইউরোপের গুটিকয় দেশ থেকে যে 'সাদা চামড়ার পুরুষেরা' গোটা বিশ্বে উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা অপরাপর জাতিকে এই চোখেই দেখেছে। উপনিবেশের অবসানের পরও এ দেখার চোখ রয়ে গিয়েছে উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর শাসনকাজের বরাত পাওয়া জাতিগুলোর দেখার ধরনে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যের অপরাপর বিভিন্ন জনজাতিকে তারা একই চোখে দেখে। তাই এ চোখে দেখা কতটা 'সহমর্মিতা' ও 'মানবিক কর্তব্য' কারক হয়েছে তা এই দীর্ঘ সময়বিস্তারে তার ফলাফল থেকে আমরা বিচার করতে পারি। সে বিচারে যাওয়ার আগে আর একটা কথা সেরে নেওয়া যাক।

আলোচনা শুরুর উদ্ধৃতিটি কাল্পনিক নয়। এই উক্তিটি করেছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার বিশ শতকের ষাটের দশকে। তিনি তখন 'মহাশক্তিধর' মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তাব্যক্তি। তিনি এটি করেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার 'চিলি' নামক দেশ সম্বন্ধে এবং 'XXXX' চিহ্নিত স্থানে তিনি ব্যবহার করেছিলেন 'কম্যুনিস্ট' শব্দটি। চিলিতে তখন বিপুল ভোটে জিতে সালভাদোর আলেন্দের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়েছে। সেই সরকারের বিরুদ্ধে নৃশংস সামরিক অভিযান শুরু করার পূর্বকথা হিসেবেই হেনরি কিসিঞ্জার এই উক্তি করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত সেই সমরিক অভিযানে সালভাদোর আলেন্দেকে হত্যা করা হয়েছিল, নবগঠিত সরকারের আরো বহু পদাধিকারীকে হত্যা করা হয়েছিল, সরকারের সমর্থক হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করা হয়েছিল, আরও বহুজনকে দেশান্তরী করা হয়েছিল এবং এক সামরিক একনায়কের দীর্ঘ শাসনের সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল।

প্রবল পরাক্রমী রাষ্ট্রনায়করা এমনই করে থাকেন। চিলি-র মানুষদের 'শাস্তি' পেতে হয়েছিল 'সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র' গঠনে সায় দেওয়ার জন্য। এর পূর্বেকার দশকই দেখেছে কীভাবে হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ডের মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতার' সংশোধন করেছিল 'কম্যুনিস্ট রাশিয়া'-র শাসকরা। রাশিয়া নির্ধারিত 'সঠিক কম্যুনিস্ট পথে' আস্থা না রেখে সামান্য কিছু বিকল্প অনুসন্ধানের জন্য হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় রুশ সেনা দখল কায়েম করেছিল গণ আন্দোলনকে দমন করে আর পোল্যান্ডের রাষ্ট্রচালকদের সহবত শেখানো হয়েছিল বাধ্য-বাধকতার বেড়ি আরো কষে বেঁধে।

কোনো জাতির রাষ্ট্রনায়করা অন্য জাতির মানুষদের 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা' সংশোধন করতে যখন রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেয়, তখন সেই 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' মানুষদের মৃত্যুমিছিল, দেশান্তরী হওয়ার মিছিল, অধিকার হারানোর মিছিল চলতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সামরিকতার এই ঝনঝনানিতে 'সহমর্মিতা' বা মানবিক কর্তব্য'-র সুর কি কখনও বাজতে পারে?

'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা-র' সংশোধন রূপে এই সাঁজোয়া গাড়ি, বোমারু বিমান ও খুনে সেনা পাঠানোর দাওয়াই যদি 'গরম দাওয়াই' হয়, তাহলে 'নরম দাওয়াই' হল আধুনিকতা-উন্নয়নের পাঠ 'শেখানোর' জন্য শিক্ষক, প্রশাসক, অ-সরকারি সংস্থা, মিডিয়া-প্রচারক পাঠানো, এঁরা গিয়ে 'শেখাবেন' : ১) 'খ' জাতির ভাষায় কাজ চলে না, 'ক' জাতির উন্নত ভাষা শিখতে হবে ২) 'খ' জীতির জীবনযাপন

'সেকেলে' বলে তারা বহু সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত তাই নিজ পরম্পরা বিসর্জন দিয়ে 'ক' জাতিকে অনুকরণ করে জীবন-জীবিকা-খাদ্যাভ্যাস বদলে তাদের উন্নত হয়ে উঠতে হবে ৩) তাদের সমাজ গঠন ও পরিচালনার বারোয়ারি রীতিনীতিও 'অচল' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল', তাই 'ক' জাতির প্রশাসকদের শাসন তাদের মেনে নিয়ে সেই শাসনেরই দোসর হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। এহেন 'শিক্ষাদান' চলবে বিদ্যালয় কক্ষে, গণপ্রচারমাধ্যমের পরিসরে, নব প্রশাসনী বিধি নিয়ম প্রবর্তনা মাধ্যমে এবং অ-সরকারি 'উন্নয়নকামী' বিভিন্ন সংস্থার 'উপকারী' উপদেশ-আদেশ বিতরণের মাধ্যমে। আমাদের দেশে ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তনকালে এমনটাই করেছিল, তারা ছিল 'ক' জাতি আর আমরা 'খ' জাতি। (বিশ্বের যেখানে যেখানে ইউরোপিয় উপনিবেশ বিস্তারকারীরা গেছে, সেখানে সেখানেই তারা নিজেদের 'ক' জাতি হিসেবে ধরে নিয়ে সেখানকার মানুষদের 'খ' জাতি বানিয়ে এহেন প্রক্রিয়া চালিয়েছে।) সেই ঔপনিবেশিক অধিপতিদের মনোভাবে রাঙা 'ক' জাতির ভাষা-সংস্কৃতি-রীতি-রেওয়াজ-নিয়ম- কানুন-এ পাঠ নিয়ে 'খ জাতি' থেকে উপরে উঠে আসা 'স্যার-বাবু-সাহেব'-রা আজ দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দেশের আদিবাসী জনজাতির মানুষদের উপর আজও একই প্রক্রিয়া বহাল রেখেছে। আদিবাসী জনজাতিদের শিশুরা তাই নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় না, অযত্নের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে তাদের আঞ্চলিক প্রধান ভাষা বা হিন্দি বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো হয় ও সেই ভাষা বলতেই বাধ্য করা হয়। আদিবাসী জনজাতির মানুষদের পরম্পরাগত জীবন-জীবিকাকে ধবংস করে ছিন্নমূল নিরাপত্তাহীন মজুরি-শ্রমিকে পরিণত করা হয়। আদিবাসী- জনজাতিদের সমাজের বিধি-বন্ধন ভেঙে জমি-জঙ্গল-নদীর উপর সভ্যতাগর্বী মানুষের মুনাফা নিঙড়ে নেওয়ার বিষম প্রক্রিয়া চালু হয়। ধীরে ধীরে আদিবাসী জনজাতিদের নিজস্ব ভাষার ব্যবহার-ক্ষেত্র সংকুচিত হয়, তরুণদের 'ক' জাতির ভাষায় সরণ ঘটতে থাকে, নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে কদর্য অনুকরণের এক অগভীর পলেস্তরার নিচে জমতে থাকে শূন্যতা।

'খ' জাতির 'দায়িত্বজ্ঞানহীনতা-র' চিকিৎসা করে তাকে 'উন্নত' করে তোলার এহেন 'ক' জাতির কার্যক্রমের ফল তাই হয় 'খ' জাতির ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষয়ের পথে অবলুপ্তির দিকে হাঁটা। বিবিধ ভাষা-সংস্কৃতির সমাজের বদলে 'উন্নত'ক জাতি ও তার কদর্য অনুকরণকারীদের এক সমসত্ব কেয়ারী করা

সমাজ গড়ে ওঠে। বৈচিত্র্য-বিভিন্নতা ঘুচিয়ে সমরূপ সমসত্ত্বতা গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়ার শুভাশুভ বিচার কিছু দিক থেকে করে দেখা যাক :

ক) ক জাতির দর্শকের চোখে খ জাতির মানুষজন কেন 'অলস, নিষ্কর্মা, অনুদ্যোগী' বলে মনে হল? খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এই মনে হওয়া ক জাতির নিজস্ব প্রয়োজনবোধ ও স্বার্থবোধের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, ক জাতি-র ভাবনায় পাহাড় জঙ্গল কেটে রাস্তা, রাস্তার পারে খনি, খনির গহ্বর কেটে আকর তুলে আনা, দূর-দূরান্তে ব্যবসার শিকল তৈরি করে বেচাকেনা জরুরি। ক-জাতির ভাবনায় জঙ্গল কেটে ব্যবসায়ী আবাদ তৈরি ও ফসল বেচে আরও আরও মুনাফা জরুরি। ক জাতির ভাবনায় বাজারি কেনা বেচার বিজ্ঞাপনের ঝাঁ চকচকে মোড়কে ঢাকা সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তার শাসনকে বাজার থেকে বসতবাড়ির অভ্যন্তর অবধি জারি করা হল উন্নতির চালিকাশক্তি। তাই কোনো মানুষ যদি এর বিপরীত ভাবনায় সচ্ছন্দ হয় তাহলে ক জাতির চোখে সে 'অলস, নিষ্কর্মা, অনুদ্যোগী'। উল্টোদিকে খ জাতির মানুষ ছোটমাপের কৃষিকাজ, প্রাকৃতিক/বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও পশুপালনের মধ্য দিয়েই নিজেদের বস্তুগত প্রয়োজন পরিতৃপ্তির বোধ পায় বলে খনি, দূর-বাণিজ্য, মুনাফাবৃদ্ধি ইত্যাদিতে 'উদ্যোগী' নয়। বন-জঙ্গল-পাহাড়কে তারা তাদের জীবনের উৎস বা তাদের পূর্বপুরুষদের উপস্থিতি-সূচক হিসেবে দেখে বলে সেই বন-পাহাড় কেটে -খুঁড়ে বরবাদ করার তারা বিরোধী। তাই খ জাতির দর্শকের চোখ থেকে দেখলে সভ্যতা-গর্বী আধুনিকতা-গর্বী ক জাতি হয়ত 'লোভী, সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ, লুটেরা' বলে ধার্য হতে পারে। এই পরস্পর সম্বন্ধে পরস্পরের 'দাগা কাটা' এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়, তাহলে বলা যায় যে, এই দুটি ভাবনা আসলে মানবজীবনকে দেখা, প্রকৃতিকে দেখা-র দুটি ভিন্ন ও পৃথক দৃষ্টিকোণ—আবেগে দর্শনে স্বকীয় চরিত্রসম্পন্ন দুটি অস্তিত্ব-নির্যাস। এই দুইয়ের মধ্যে 'খ'-য়ের ভাবনার অস্তিত্বের অধিকার নেই, ক-জাতির ভাবনাকেই সর্বত্রচারী করতে হবে, এমনটা কীভাবে বলা যায়? ক জাতির দর্শক বলবে যে তার ভাবনাই মানুষের জীবনকে ধনে সম্পদে পূর্ণ করে তুলেছে, নিত্যনতুন ভোগের

নৈবেদ্য সাজিয়ে তুলেছে, তাই খ-য়ের অভাব অনটন কন্টকিত জীবনের ভাবনার থেকে তার ভাবনা তো শ্রেয় বটেই। কিন্তু প্রশ্ন তো থেকেই যায় যে ধন-সম্পদের সম্ভাবনাকে অসীম করে, নিত্যনতুন ভোগের নৈবেদ্য সাজিয়েও কি 'অভাববোধ' ঘোচানো গেছে? যায়নি তো। বরং ভোগের চাহিদা হয়েছে সীমাহীন আর তাই অভাববোধও হয়েছে নিত্য-জায়মান। এই নিত্য-জায়মান অভাববোধ বস্তু সম্পদকে আঁকড়ে যত নিজেকে মেটাতে চেয়েছে, ততই ঘি-ছেটানো আগুনের মতো আরও জ্বলে উঠেছে। স্বার্থচিন্তার সংকীর্ণ গুহায় দাউ দাউ করে জ্বলা এই অভাববোধের হোমাগ্নির বশে মানুষ যত বাঁধা পড়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সমস্ত নাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। নিজের বাইরে প্রকৃতির সমস্ত কিছু তার কাছে মনে হয়েছে কেবলই ভোগ্যবস্তু বা ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের উপকরণ। গাছ-পালা-জীবজন্তু-মাটি-জল-বাতাস এ সমস্ত কিছুকে ভোগের কলে নিঙড়ে নিতে নিতে সে নির্বিচারে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। মাটির উর্বরতা ধ্বংস হয়েছে, জল-বাতাস দূষিত হয়েছে, গাছপালা-জীবজন্তুর বিভিন্ন প্রজাতি ধ্বংস হয়ে বিলীন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। তাই মানুষ সহ জীবজগৎ ও প্রকৃতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য উৎকণ্ঠা থেকেই এমন প্রশ্ন ওঠে যে মানুষের জন্য কতটা 'ভোগ' দরকারি? কতটা ভোগের উপকরণ দিয়ে জীবনকে সাজানো যায়—এ ভাবনা তাই আজ শ্রেয় নয়, শ্রেয় এই ভাবনা যে কতটা তথাকথিত 'অভাব- অনটন' নিয়েও প্রকৃতির সঙ্গে নাড়ির টান বজায় রেখে জীবনাচরণ করা যায়। ক জাতির সভ্যতা-গর্বী, আধুনিকতা-গর্বী ভাবনাকে সর্বত্রচারী করে নয়, বরং খ জাতির মতো আরো বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় জীবনাচার ভাবনার সহাবস্থান, সংমিশ্রণ ও আদনপ্রদানের মধ্যে দিয়েই হয়তো সেই 'শ্রেয়'-র দিকে যাওয়ার পথ।

খ) কোনো ভাষা-সংস্কৃতিকে 'দীন' 'বা' অবিকশিত' বলে চিহ্নিত করা হয় কীভাবে? এই চিহ্নিতকরণের চালু রেওয়াজগুলোকে দেখা যাক। আদিবাসী জনজাতিদের এমন অনেক ভাষা আছে যা মৌখিক ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ, লিখনরূপ নেই। অথবা, লিখনরূপ খুবই অল্প ব্যবহৃত হওয়ার ফলে প্রাথমিক অবস্থায় সীমাবদ্ধ। এই লিখনরূপের অভাব বা অনুপস্থিতিকে ভাষার 'দীনতা' বা 'অবিকাশের' সূচক হিসেবে অনেকে

ধরেন। আবার কোনো ভাষায় 'সুশীল সাহিত্যসৃষ্টির' সম্ভার যদি কম হয়, ছাপা মাধ্যমে, গণজ্ঞাপনের মাধ্যমে, আন্তঃঅঞ্চল বা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার উপস্থিতি যদি না থাকে বা থাকলেও তা দুর্বল হয়, তাহলে তা ভাষার 'দীনতা' বা 'অবিকাশ' হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে এ সমস্তই ভাষাব্যবহারের পরিসর কতটা বিস্তৃত বা কতটা সংকুচিত, সে সংক্রান্ত বিচার, এর সঙ্গে ভাষার নিজস্ব কোনো দোষ বা গুণ জড়িত নেই, যেমন, লিখনশৈলীহীন ভাষার মধ্যে এমন কোনো দোষ নেই যার কারণে তার লিখনশৈলীর বিকাশে অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা হাজির হতে পারে। যে কোনো ভাষারই লিখনশৈলীর বিকাশ সম্ভব এবং তা সেই ভাষার বাচকরাই করতে পারেন যদি লিখিত ভাষা ব্যবহারের যাথাযোগ্য ক্ষেত্রটি উন্মুক্ত হয়। ভাষাব্যবহারে ক্ষেত্রটি সামাজিক ক্ষেত্র, ফলত সেই ক্ষেত্রের বিস্তৃতি বা সংকোচন নানা সামাজিক অবস্থা ও শর্তের উপর নির্ভরশীল। বিদ্যালয়-বাজার-থানা-দপ্তর-আদালতে ক জাতির ভাষাকে বাধ্যতামূলক করে খ জাতির ভাষা ব্যবহারের সংকোচন ঘটানো ক জাতির মানুষদের একটি সামাজিক ক্রিয়া, এর সঙ্গে খ জাতির ভাষার কোনো 'অযোগ্যতা'-র সম্পর্ক নেই। খ জাতির মানুষদের সমাজে পরম্পরাবাহিত লোকশিক্ষা, আদান-প্রদানের রীতি-নীতি-বিধি, সমাজ সংগঠন ও পরিচালনার রীতি-নীতি-বিধি সবই তাদের নিজস্ব ভাষার আধারে হত, ফলে যে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও ক্ষেত্র উন্মুক্ত হলে তা পুনর্বার হওয়ার মতো জোরও ভাষার আছে। একইভাবে 'সুশীল সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভার' ভাষাবাচকদের সমাজের অন্তর্বর্তী গঠনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ হতে পারে, ভাষার দোষ বা গুণের প্রকাশ নয়, যে কোনো ভাষাতেই সেই ভাষার মানুষদের লোককথা, লোকইতিহাস, লোকজ্ঞান, গান, গল্প, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচনের সমৃদ্ধ ধারা প্রবাহিত থাকে, যা সেই ভাষিক সমাজের জীবনশক্তিকে প্রকাশ করে। কোনো জনজাতির জীবনের মধ্য দিয়ে জড়-জীব জগতের সঙ্গে সংস্পর্শের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, যে অধ্যাত্মভাব স্ফূরিত হয়,তার সমগ্রকে প্রকাশিত করার

ক্ষমতা সেই জনজাতির ভাষার থাকে। ফলে এই বিচারে কোনো ভাষাই অন্য কোনো ভাষার থেকে ছোট নয়, দুর্বল নয়। সমস্ত ভাষার মধ্যেই বিকাশের সম্ভাবনা সমান। বিকাশের সুযোগ সবার যে সমান নয় তা তো সামাজিক ক্ষেত্রে হাজির বৈষম্যের জন্য। এই বৈষম্য তৈরি করা ও তীব্রতর করার যুক্তিই হল ক জাতির নিজের ভাষা দিয়ে খ জাতির ভাষাকে প্রতিস্থাপন করার যুক্তি। সামাজিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোয় নিজের অর্থাৎ ক জাতির ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে খ জাতির ভাষাব্যবহার ক্রমসংকুচিত করা তার লক্ষ্য। খ জাতির বাচকদের ক জাতির ভাষায় ভাষাসরণ ঘটানো তার লক্ষ্য। আর এর মধ্য দিয়ে ক্রমশ বাচকহীন হয়ে খ জাতির ভাষাকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়া তার লক্ষ্য। এভাবে খ জাতির ভাষাবিলোপ কি 'শ্রেয়'? ভাষা হারিয়ে গেলে শুধু কি ভাবপ্রকাশের কিছু চিহ্ন ও ধ্বনিই হারিয়ে যায়? না তা নয়, হারিয়ে যায় আরও অনেক অনেক কিছু। খ-জাতির ভাষা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় সেই ভাষার আধারে ধরা থাকা হাজার হাজার বছরের বিশিষ্ট এক মানব অভিজ্ঞতার ধারায় সঞ্চিত জ্ঞান, প্রকৃতিচেতনা ও অধ্যাত্মচেতনার সম্পদ। খ-জাতির ভাষাতেই তার বসবাস-অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ, জীব ও জড়প্রকৃতির নাম, পরিচয় বৈশিষ্ট্য ও মানবঅস্তিত্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের আভাস সঞ্চিত আছে, অন্য কোনো ভাষাতে তা নেই। প্রকৃতি ও মানবজীবনকে দেখার এক বিশেষ ধরন ও তার থেকে উঠে আসা উপলব্ধি খ-জাতির ভাষাতে আছে, যা হুবহু অন্য আর কোনো ভষায় নেই। খ জাতির ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সবও বিলুপ্ত হয়। মানুষের অভিজ্ঞতার ও উপলব্ধির ভাণ্ডারের একটা অংশ ধবংস হয়ে গিয়ে মানুষের দেখার ও ভাবার ক্ষমতা আরও সীমিত আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও, নিজ মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিতদের 'ক জাতির' ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আড়ষ্টতা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ সমস্যাপূর্ণ অথবা অসম্ভব করে তোলে। এভাবে সমাজে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পরিসরেরও সংকোচন ঘটে।

গ) ‘গণতন্ত্র’ নিয়ে অবশ্য ক জাতির বাগাড়ম্বর অন্তহীন। ক জাতির দাবি এই যে একটি বৃহৎ ভূখণ্ড জুড়ে কেন্দ্রীভূত শাসন জারি রাখার ‘সংসদীয় গণতন্ত্র’-এর পথই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার একমাত্র পথ। সেনা-পুলিশ-আদালত ও নজরদারি ব্যবস্থার বেড়িতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বেঁধে, কিছু পেশাদার রজনৈতিক দলের হাতে জনগণের ‘প্রতিনিধিত্ব’ করার ‘দায়িত্ব’ দিয়ে, গুটিকয় শহরের ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে জনগণকে শাসন করাই নাকি গণতন্ত্রের একমাত্র রূপ। আর আদিবাসী-জনজাতিদের নিজেদের সমাজের পরম্পরা অনুয়ায়ী যে সমাজ-সংগঠনের রীতিনীতি, তা সবই ‘অগণতান্ত্রিক’। তাই ক জাতি তার সংগঠিত সরকার- প্রশাসন-আদালতের বল ব্যবহার করে খ জাতির ‘সমাজ’ চালানোর ব্যবস্থাকে ভেঙে বা দুর্বল করে নিজেদের ‘সংসদীয় গণতন্ত্রের’ কিনারে খ জাতিকে জুতে নিতে চায়। সত্যিই এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের প্রসার হয় কিনা একটু খতিয়ে দেখা যাক। আদিবাসী জনজাতিদের সমাজ-প্রশাসনের কাঠামো সাধারণত একটি বা কয়েকটি গ্রামের ছোট পরিসরের উপর গড়া, এক বৃহৎ অঞ্চলকে কেন্দ্রীভূত শাসনে আনার কল্পনা তার মধ্যে নেই। গ্রামে সব মানুষদের অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত সভা এবং তাকে পরিচালনা করার বা কার্যনির্বাহী দেখভালের জন্য বয়স্ক অভিজ্ঞদের একটা দল থাকে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে গ্রামের প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণ করা সহজ। তা আরো সহজ এই কারণে যে সভার আলাপআলোচনা চলে অংশগ্রহণকারীদের মাতৃভাষায় এবং চেনা পরিবেশে পরিচিতদের মধ্যে অংশগ্রহণে আড়ষ্টতা থাকেনা। বেশ কিছু গ্রামের মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রয়োজনে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন গ্রামের বয়স্ক জনেদের সভা হতে পারে, কিন্তু গ্রামের জীবন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-মীমাংসা সব গ্রামসভাতেই হওয়া দস্তুর। বয়স্ক-অভিজ্ঞ জনেদের প্রতি মান্যতা, পরম্পরার প্রতি মান্যতা ও পাঁচজন মিলে নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রতি মান্যতা এখানে নির্ধারক মূল্যবোধ হিসেবে কাজ করে। এই মান্যতার মূল্যবোধ কি ‘অগণতান্ত্রিক’, তা কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের পরিপন্থী? মান্যতা যদি

প্রশ্নহীন আনুগত্যের মাত্রা অবধি বিস্তৃত হয়, মান্যতা যদি যে কোনো বিরোধিতাকে অসম্ভব করে তুলতে চায়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই অগণতান্ত্রিক। আবার অন্যদিকে, বিভিন্ন মানুষ একসঙ্গে জীবনযাপনের জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্মতির ভিত্তিতে যে নিয়ম-রীতি-র জন্ম দেয় তার প্রতি মান্যতা যখন স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই আসে, তখন মান্যতা মানেই অগণতান্ত্রিক নয়, সামাজিক প্রাধিকার যদি সবার অংশগ্রহণ ও সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ও নিরন্তর পুনরুৎপাদিত হয়, তাহলে সেই প্রাধিকারের প্রতি মান্যতা গণতন্ত্রের আবশ্যক অংশ। উল্টোদিকে ক জাতির সংসদীয় গণতন্ত্রে আপামর মানুষের অংশগ্রহণের সুযোগ আসে কেবল সংসদীয় নির্বাচনের সময়, তখনও প্রতিনিধিত্বের অধিকার যেহেতু কার্যকারীভাবে পেশাদার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং মানুষকে ভোটদানের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করার জন্য হরেক উপকরণের উপর পেশাদার রাজনৈতিক দল ও সমাজের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অংশের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম থাকে, তাই তখনও মানুষ যে মুক্তভাবে নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে এমন নয়। আর সংসদীয় নির্বাচন অতিবাহিত হয়ে গেলে তো তখন 'মান্যতা'-র বোঝা অশেষ। নেতা- মন্ত্রী সেনা-পুলিশ, সংবিধান-আদালত, অফিসার-আমলা সবার সামনে মান্যতায় মাথা ঝুঁকিয়ে না থাকলেই 'দেশবিরোধী', 'রাষ্ট্রবিরোধী' ছাপ্পা মেরে জেল-হাজত-মামলা-মোকদ্দমার জেরে নাজেহাল হতে হবে। অথচ আপামর মানুষের অংশগ্রহণ ও সম্মতির মধ্য দিয়ে এই সেনা-পুলিশ সংবিধান-আদালত, অফিসার-আমলার কাঠামোটি পুনরুৎপাদিত হচ্ছে না। বরং যে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে গোটা ভারতবর্ষে বিভিন্ন গণবিদ্রোহ হয়েছে, সেই শাসনযন্ত্রের প্রভূত আইন কানুন, দমনমূলক ব্যবস্থাকে এখনও রাষ্ট্রচালনার হাতিয়ার করে রাখা হয়েছে। ক জাতির রাজনৈতিক রাষ্ট্রগঠন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পরিসর তাই কতটুকু এবং কতটা নিরাপদ সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে। এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের প্রশ্নটিকে দেখা যাক। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে কী বুঝব? ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

অর্থ হতে পারে নিজের মতো করে স্বাধীনভাবে ভাবা, সে ভাবনা প্রকাশ করা বা অপরের কাছে জ্ঞাপন করা ও সে ভাবনা অনুযায়ী স্বতঃক্রিয়া করার অবকাশ। খ জাতির সমাজ পরম্পরাকে গুরুত্ব দেয় ও তা যৌথতা ভিত্তিক বলেই এ অবকাশ সেখানে কম হবে কেন? বরং ক জাতির আধুনিক শিল্প-সমাজে মানুষ ও উৎপাদনের যন্ত্রের মধ্যে ফারাক যেভাবে ক্রমে ঘুচে যাচ্ছে, বিশদ নজরদারি ব্যবস্থার অধীনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী উত্তেজক নেশায় বেহুঁশ করে যন্ত্রমানবদের হল্লা রাজার সেনার মতো কুচকাওয়াজে জুতে দেওয়া হয়েছে, সেখানেই তো এই অবকাশের চরম অবক্ষয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম সর্বনাশ ঘটে চলেছে। তাই তুলনায় বোধহয় খ জাতির সমাজব্যবস্থাতেই ব্যক্তির মুক্তভাবে নিশ্বাস নেওয়ার ও স্বাধীনভাবে বিকাশের অবকাশ বেশি। আরেকটি প্রশ্নও আছে। সমাজযৌথতা ও পরম্পরার মধ্যে শিকড় কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশকে খর্ব করে নাকি ব্যক্তিস্বত্ত্বা বিকাশে সার-রস যুগিয়ে মহীরুহের মত তাকে পল্লবিত হয়ে উঠতে সাহায্য করে? রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধির মতো দুই ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশ কি সমাজযৌথতা ও পরম্পরার মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েই পল্লবিত হয়নি? এ বিষয়ে আরও নিবিড় বিচার পৃথক কোনো আলোচনায় করা যেতে পারে।

এযাবৎ আলোচনা থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি যে খ জাতির তুলনায় ক জাতির শ্রেষ্ঠত্বের দাবি শূন্যগর্ভ। এ শূন্যগর্ভতা ক জাতির আত্মকেন্দ্রিকতা ও তজ্জনিত দর্পেরই জাতক বোধহয়। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে সমস্ত অপরকে নিজের আদলে দুরমুশ করে নিয়ে সমসত্ত্বতা গড়ার অভিযান মানবসভ্যতা ও প্রকৃতির মধ্যে আপদ হিসেবেই হাজির হয়। সমস্ত অপরতার বৈচিত্র্য ও বহুত্ব সম অধিকারে অস্তিত্ববান ও বিকাশমান হওয়াই বরং মানবসভ্যতা ও প্রকৃতির পক্ষে শ্রেয়। এ বিষয়ে 'ঠেকে শেখা' এক মানুষের উপলব্ধি শোনা যাক। এঁর নাম আলেস দেবেলজাক। ইনি পূর্বতন যুগোশ্লাভিয়া-র দক্ষিণী স্লাভ জনজাতির এক মানুষ। অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যকে সম্মান দিয়ে বহুত্বের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার পথ নাকচ করে সমসত্ত্ব সমাজ ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গড়ে তোলার উদ্যোগ কসোভোর সার্বদের মধ্যে মাথাচাড়া

দেওয়ার পর হিংসা-দ্বেষ-অবিশ্বাসের আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে যুগোশ্লোভিয়ার বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন:

> যখন সবাই এক চিন্তা করে, তখন আসলে কেউই চিন্তা করে না।... নিজের জনজাতির সংস্কৃতি এবং অপর জনজাতির সংস্কৃতির টানাপোড়েনের মধ্যে জীবনযাপন আপনাকে বাধ্য করে আপনার নিজের পূর্বানুমানগুলোকে সর্বদা প্রশ্নের মুখে ফেলে পরীক্ষা করে নিতে। তা অবশ্যই ক্লান্তিকর বোধ হতে পারে, কিন্তু তাই-ই একমাত্র সৃজনশীল পথ। যখনই আমরা এই টানাপোড়েন ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, তখনই তা পাল্টা প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে আবার ফিরে আসে।
>
> (বুদাপেস্তের হাঙ্গেরিয় পি.ই.এন ক্লাব থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'ওডি এট আমো: রাইটারস অন দি লাভ এণ্ড হেট অফ ফরেন নেশনস অ্যাণ্ড কালচারস' গ্রন্থে সংকলিত আলেস দেবেলজাক-এর লেখা 'ওডি এট আমো ইন দি ল্যাণ্ড অফ সাদার্ন স্লাভস' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত। ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ বর্তমান লেখকের করা।)

কিন্তু তাহলে এক ছাঁচে একভাবে এক ভাষায় সবাইকে গড়েপিটে নিয়ে সমসত্ত্বতা গড়ার বিধবংসী টান তৈরি হয় কীভাবে? দেবেলজাক এক ক্লান্তির কথা বলেছেন। মূল্যবোধ- নৈতিকতা-সংস্কৃতির বহুত্বের টানাপোড়েন সর্বদা নিজের অবস্থান বা পূর্বানুমানগুলোকে প্রশ্ন করে যাচাই করতে বাধ্য করে, 'চিরায়ত, শাশ্বত, চিরন্তন' চিহ্নিত কুলুঙ্গি থেকে প্রায় সবকিছুকেই টেনে নামায় আপেক্ষিকতার ধুলোমাটিতে। এই অস্থিরতা যেমন নবসৃজনের ভিত্তিভূমি, তেমনই কখনও তা হয়ত কারও মধ্যে ক্লান্তিরও জন্ম দিতে পারে। ক্লান্তি থেকে কেউ এই অস্থিরতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে 'চিরায়ত, শাশ্বত, চিরন্তন'-এর কুঠুরিতে নিজেকে দরজাবন্ধ করে রাখতে চাইতে পারে। এভাবে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া হয়ত সৃজনশীলতা থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেওয়া—তা নিষ্ক্রিয়তার সূচক। কিন্তু আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম এক অতি সক্রিয়তার রূপ নিয়ে যা সমস্ত বিভিন্নতা-বৈচিত্র্যকে হিংসাত্মক উপায়ে ধবংস করে নিজের ছাঁদে গড়ে নিতে চায় কারণ সে নিজের ভাবনা-মূল্যবোধ-নৈতিকতা-সংস্কৃতিকেই সবচেয়ে সঠিক বা সবচেয়ে সেরা বলে মনে করে। দরজাবন্ধ কুঠুরির নিষ্ক্রিয়তা থেকে এই

আগ্রাসী আধিপত্যবাদী সক্রিয়তায় আসা-যাওয়ার পথটা কীভাবে তৈরি হয়? এই প্রশ্ন নিয়েই এবার ভেবে দেখা যাক।

অপরাপর ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনাচারকে অস্তিত্বের সমানাধিকার না দিয়ে শ্রেষ্ঠ> < নিকৃষ্ট, কাম্য> < বাতিল বিভাজিকা টেনে ধাপবন্দি কাঠামোয় সাজিয়ে তোলা এক অতি প্রভাবশালী ধারণা বিভিন্ন ধরনের 'প্রগতির মতবাদ'-এর জন্ম দেয়। 'প্রগতির মতবাদ' অপরাপর বিভিন্নতাগুলোকে এক ক্রমবিকাশের সারণিতে সাজিয়ে 'বিকাশের নিয়ম' নির্দিষ্ট করে, সেই নিয়ম বলে যে সমগ্র মানবপ্রজাতি 'ক্রমউন্নত' হতে হতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনাচারের অভিমুখে ধেয়ে চলেছে। সেই অভিমুখে স্থিত বা তার সবচেয়ে কাছে স্থিত সমাজ-সংস্কৃতি- জীবনাচারের রূপটিই শ্রেষ্ঠ বা সর্বজনকাম্য। অপরাপর অন্য বিভিন্ন রূপগুলি আসলে সেই অভিমুখে যত্রাপথে বিভিন্ন ক্ষণজীবি মুহূর্ত, যা 'গতির নিয়মে' বিলীন হয়ে যাওয়াই ভবিতব্য। ইউরোপিয় উপনিবেশস্থাপনকারীরা তাদের নিজস্ব সমাজ-সভ্যতাকে এই মানবপ্রজাতির অভিমুখ হিসেবে হাজির করে 'প্রগতির শীর্ষবিন্দুতে' নিজেদের স্থাপন করেছিল। আর অন্যান্য অপরাপর সমাজ-সভ্যতার রূপগুলি যখন 'পশ্চাৎপদ', 'ত্রুটিযুক্ত', 'অসম্পূর্ণ' হওয়ার কারণে বিলীন হওয়াই ভবিতব্য, তখন জোর প্রয়োগ করে তাদের বিলীন করে দেওয়াও 'ইতিহাসের গতিকে সাহায্য করা' বলে আগ্রাসী আধিপত্যবাদী সক্রিয়তার 'যুক্তি' তৈরি করেছিল। এই প্রগতির মতবাদই তার মূল চরিত্র বজায় রেখে বিভিন্ন রূপ ধরে হাজির হয়েছে, যেমন, ইতিহাসের অন্তিমবিন্দু হিসেবে কখনও পুঁজিবাদী শিল্প-সমাজ, কখনও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সমাজতান্ত্রিক সমাজ, কখনও আর্য জাতির সমাজ হাজির হয়েছে। আর সেই শেষবিন্দু অভিমুখে অপরাপর সবাইকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে 'আধুনিকতা-নির্মাণ'-এর ধ্বংস যাত্রা তীব্র হয়ে উঠেছে।

এভাবে মানবপ্রজাতির বিকাশের শেষবিন্দু হিসেবে সমাজ-সংস্কৃতি-জীবনাচারের একটি রূপকে পরম মূল্যের বলে হাজির করার দম্ভ অপরাপর সমস্ত রূপ-কে মূল্যহীন বলে সাব্যস্ত করে। প্রগতির ধারণার মধ্য দিয়ে যেমন এর মতবাদিক ক্ষেত্র নির্মিত হয়, তেমনই এর সমাজ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি নির্মিত হয় 'জাতি-রাষ্ট্র'-এর রূপের মধ্য দিয়ে। 'জাতি-রাষ্ট্র'-এর প্রতিমা নির্মাণ করা

হয়েছে এইভাবে যে তা এক দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল, ছোট ছোট জনজাতিদের যৌথতা-ভিত্তিক সমাজ থেকে 'বিবর্তিত' হতে হতে ক্রমশ 'উন্নততর' রূপ নিতে নিতে সামজ সংগঠনের সবচেয়ে উন্নত রূপ হিসেবে 'জাতি-রাষ্ট্র'-এর উদ্ভব হয়েছে। একটি বড় ভূখণ্ড জুড়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার রাষ্ট্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় ভাষা', 'জাতীয় সংস্কৃতি'-র ঐক্যবন্ধন (ঐক্যের চেয়ে এখানে বন্ধনেই জোর বেশি) বাঁধা এখানে এক চরম ধাপবন্দি কাঠামো তৈরি করে। এই ধাপবন্দি কাঠামোর সর্বোচ্চ ধাপে থাকে 'জাতীয় পরিচয়' নির্মাণে ব্যবহৃত প্রমিতিকৃত এক বা কয়েক ভাষা এবং রীতি-রেওয়াজ আর সেই ভৌগলিক সীমায় বর্তমান অন্য সমস্ত ভাষা ও রীতি-রেওয়াজকে 'অযোগ্য, ত্রুটিযুক্ত, দুর্বল' ইত্যাদি নানা বিশেষণে মূল্যহীন করে তোলা হয়। এই অপরাপর ভাষা-সংস্কৃতির বিভিন্ন জনজাতির মানুষরা 'কৌতূহলপ্রদ' 'দর্শনীয়' 'অতীতের প্রদর্শনযোগ্য অবশেষ' হিসেবে জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে নির্ধারিত স্থান পেতে পারে যদি তারা নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধীন চর্চা ও বিকাশের অধিকার দাবি না করে 'জাতীয়' ভাষা-সংস্কৃতি সমূহের আধিপত্য মেনে নেয়, নতুবা তাদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে তাদের অস্তিত্বের অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। ইউরোপের দেশগুলোর জাতি-রাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে রাশিয়া বা চিনের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র বা উন্নয়নশীল দেশের জাতিরাষ্ট্র—এই আধিপত্য-নির্মাণের প্রবাহ বয়েই চলেছে।

বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলেন। জাপানে তখন জাতীয়তাবাদের তুমুল জোয়ার উঠেছে। সেখানে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

> ইউরোপের মাটি থেকে গজিয়ে ওঠা যে রাজনৈতিক সভ্যতা এখন গোটা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলছে আগ্রাসী আগাছার মতো, তার ভিত্তি হলো অপরকে বাদ দেওয়ার প্রবণতা। তা সবসময় অপরদের উপর সতর্ক নজরদারি চালায় যাতে অপরদের দূরে ঠেলে রাখা যায় বা একেবারে নিকেশ করে দেওয়া যায়। সর্বখাদক ও নরখাদক প্রবণতা আছে তার মধ্যে। অপর মানুষদের সহায়-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া ও তাদের গোটা ভবিষ্যতকেই গ্রাস করার চেষ্টা করে এই রাজনৈতিক সভ্যতা। তা সবসময় আশঙ্কা করে যে অপর কোনো জাতি বুঝি তাকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠে গেল আর সেই সম্ভাবনাকে সে 'মহা বিপদ' বলে চিহ্নিত করে।

> এই চিরসন্দিগ্ধ চিরআশঙ্কিত মানসিকতা চায় তার সীমানার বাইরের মহত্ত্বের যে কোনো লক্ষণকে দমন করতে। দুর্বলতর জাতির মানুষদের দুর্বলতার বন্ধনেই আটকে রাখতে জোর ফলায়।... তা শক্তিধর কারণ তা তার সমস্ত বল একটাই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করে, যেনবা কোনো কোটিপতি তার আত্মাকে বেচে অর্থ সংগ্রহ করছে। কোনো আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে তার বাধে না, নির্লজ্জভাবে তা মিথ্যার জাল বুনে চলে। মন্দিরে মন্দিরে তা লোভ-লালসার বিপুলাকার মূর্তি স্থাপন করে, সেই মূর্তিপুজো ও তজ্জনিত বহু ব্যয়সাপেক্ষ জাঁকজমককে 'দেশপ্রেম' নাম দিয়ে সে নিয়ে তার গর্বের শেষ নেই।... অনির্দিষ্ট কাল জুড়ে যদি এমনটাই চলতে থাকে, নির্বুদ্ধিতাকে অভাবনীয় সীমায় নিয়ে গিয়ে যুদ্ধাস্ত্র জাহির চলতে থাকে, যন্ত্র ও গুদামঘর তার আবর্জনা, ধোঁয়া আর কদর্যতা দিয়ে ঢেকে দেয় সুন্দর ধরণী, তাহলে এক আত্মহননের বহ্নুৎসবে সব শেষ হয়ে যাবে।' (রবীন্দ্রনাথ ভাষণটা ইংরেজিতে দিয়েছিলেন, যা ১৯১৭ সালে 'Nationalism' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে নির্বাচিত অংশটিকে আমি বাংলায় অনুবাদ করে উদ্ধৃত করলাম।)

জাপানের মানুষরা সেই সময় রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবার্তায় গুরুত্ব দেয়নি। শোনা যায় যে তাদের বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ এর জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর রুষ্ট হয়ে তাঁকে 'পরাজিত ধ্বংসের কিনারে দাঁড়ানো জাতির প্রতিনিধি' বলে উপেক্ষার ব্যঙ্গোক্তি করেছিল। গোটা বিশ্ব জুড়ে অবশ্য তখনও ভাষার বিলুপ্তি, জীব-পশু-পাখির প্রজাতির বিলুপ্তি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাণের উপযোগী পরিবেশের ধ্বংসপথে যাত্রা আজকের মতো এত সর্বব্যাপী চেহারা নেয়নি। আজও কি আমরা এই সতর্কবার্তাকে কোনো গুরুত্ব দেব না? জাতি-রাষ্ট্রের কারাগারের উঠোনে প্রগতির বৃন্দবাদনের তালে এখনও কি আমরা কুচকাওয়াজ করে ফিরব? নাকি সেই উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে সব ভাষার, সব সংস্কৃতির অস্তিত্বের সমানাধিকার, বিকাশের সমানাধিকার নিশ্চিত করার মতো বহুত্ববাদী সমাজ-রাজনৈতিক পরিসর গঠনের চেষ্টা করব? আত্মহননের বহ্নুৎসব নাকি বহুত্বের পরিসর—রুগ্ন অস্তিত্বের উপশম আমরা কোথায় পাব?

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ২০২০

ভাষা ও জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় রোধের জন্য জনজাতীয় জ্ঞানের গুরুত্ব

বেঞ্জামিন টি. ওয়াইলডার, ক্যারোলিন ও' মিয়ারা,
লরি মন্টি ও গ্যারি পল নাভান

জীববৈচিত্র্য, আবাসভূমি ও স্থানীয় ভাষাগুলোর বিলুপ্তির হার দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভূমিজ জনগোষ্ঠী যেভাবে প্রজাতি ও ভূখণ্ডের পরম্পরাগত বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান রক্ষা করে চলেছে তার অনুসন্ধান ও চর্চা করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। গত ২ বা ৩ দশকের মধ্যে পৃথিবীর চিহ্নিত প্রজাতিগুলোর ২০ শতাংশ বিলুপ্তির মুখোমুখি হবে।[মাফফি ২০০১, কার্ডিন্যাল এবং অন্যান্য ২০১]। সর্বনিম্ন হিসাবপত্রে দেখা যাচ্ছে মেরুদন্ডীবর্গের মধ্যে সাম্প্রতিক বিলুপ্তির হার আগের চেয়ে ১১৪ গুণ বেশি।[সেবাল্লোস এবং অন্যান্য ২০১]। একইসঙ্গে রজার্স ও ক্যাম্পবেল (২০১৬) হিসাব করেছেন যে গড়ে ৩.৫ মাসে একটা ভাষা বিলুপ্ত হচ্ছে। চিহ্নিত ৬৯০১ একটা জীবন্ত ভাষার মধ্যে ৩১৩৪টা ভাষা বিপন্ন। ভাষিক ও জীববৈচিত্র্য নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। দুটোই শোচনীয় ভবিষ্যতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। [গরেন ফ্লো ও অন্যান ২০১]

জীবকুলের স্থানীয় বর্গীকরণ এবং প্রজাতি ও বাসভূমি বণ্টনের সংশ্লিষ্ট পরম্পরাগত জ্ঞানের তথ্যনির্মাণের জন্য যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা নেওয়া হয় তা কাল সংবেদী। অনেক প্রাচীন স্থানীয় জ্ঞানতন্ত্র আছে যেগুলো প্রতীচ্য ও প্রাচ্যের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞানসূত্রের চেয়ে হাজার হাজার বছরের পুরনো। তবে অভিযোজন

সূত্রে পাওয়া বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের দ্রুত সরণ হচ্ছে, হয়তো বা নাটকীয়ভাবে ক্ষয় পাচ্ছে। [লো ও' হারমন ২০১] যেসব গোষ্ঠীর মধ্যে মাতৃভাষার ব্যবহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে এ ঘটনা বিশেষভাবে সত্যি। সাধারণভাবেই তো বলা যায়, যেসব গোষ্ঠী স্থানীয় স্বভাবের ওপর ভিত্তি করে পরম্পরাগত জীবনশৈলী ও মাতৃভাষাগুলো রক্ষার চেষ্টা করছে তাদের জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য করা দরকার। সৌভাগ্যক্রমে, জনজাতির সংস্কৃতিকে কতকগুলো প্রকল্পের অঙ্গীভূত করার প্রচেষ্টা বেড়ে চলেছে। ক্ষীয়মান প্রজাতিগুলোর বাসভূমির সংস্কার ও হারিয়ে যাওয়া আচার-অনুষ্ঠান ও জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনই এসব প্রকল্পের অন্তর্গত। এর নিদর্শন ব্যাপক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে আছে। অ্যামাজোনিয়ায় বন্যপ্রাণী ও কার্বনের পরিমাণের জনজাতি পরিচালিত বৃহদায়তন নজরদারি থেকে পানামার স্বল্পপরিচিত ডারিয়েন প্রদেশে পরম্পরাগত ভূ-মানচিত্র অঙ্কন পর্যন্ত বিশাল ক্ষেত্রে এই কাজের ব্যাপ্তি।

(বন্যপ্রাণী [লুজার ও অন্যান্য ২০১], কার্বন সঞ্চয় [বাট ও অন্যান্য ২০১], পানামা [হেরলিহি ২০০])

বহুত্ববাদী ও নানা বিদ্যার আন্তঃসম্পর্কিত ক্রিয়াকাণ্ডের ওপরই সংরক্ষণ উদ্যোগের দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য নির্ভর করে। বিশ্বজোড়া জীববৈচিত্র্যকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য লোকায়ত বিজ্ঞানীদের নজরদারির কাজের ওপর গবেষণা সম্প্রতি গুরুত্ব পেয়েছে। [থিয়োরলড এবং অন্যান্য ২০১] জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীববৈচিত্র্য বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া এগুলোর নৈতিক তাৎপর্যও দেখা দিয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যাপকতর অংশকে এই প্রাকৃতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ ও চর্চায় পুনর্নিয়োগ করার জন্য প্রশংসনীয় কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।[নিসবেট এবং অন্যান্য ২০১০, মিলার বাশিং ও অন্যান্য ২০১] পরম্পরাগত বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের মধ্যে যে প্রজ্ঞা গঠিত হয়ে আছে সেদিকে এখন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পরম্পরাগত বাস্তুতন্ত্র-জ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

> মানুষ ও অন্যান্য প্রাণবান সত্তার পরস্পরের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের যে জ্ঞান, যাপন ও বিশ্বাস, অভিযোজী প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাধ্যমে সংস্কৃতির দ্বারা পরিবাহিত হয়ে

উদ্ভূত হয়েছে তার নাম পরম্পরাগত বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান। [বার্কস ২০১] পরম্পরাগত বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান বিপন্ন অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির আবাসভূমি রক্ষার প্রচেষ্টা পরিচালনা করেছে।[নাভান ২০০০, জোহানেস ও ইয়েটিং ২০০]। কতকগুলো ক্ষেত্রে পরম্পরাগত বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান সংরক্ষণ পরিকল্পনায় সহায়তাও করেছে। [ফ্রেজার ও অন্যান্য ২০০]।

এখানে আমরা কি চাই? স্থানীয় জীববর্গীকরণের মধ্যে জনজাতির যে জ্ঞান প্রোথিত তার মূল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই প্রবণতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আমরা দেখেছি স্থানীয় পশুপালক, মৎস্যজীবী, শিকারি, কৃষক ও কারুশিল্পীদের মধ্যে স্থান-কালবাহিত জীববৈচিত্র্যের পরিবর্তনের সূক্ষ্ম জ্ঞান আছে। এদের নিয়ে লোকায়ত বিজ্ঞানের এক সম্মিলিত যুগের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। যেসব বিদ্বজ্জন পরিবেশ বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ধর্মের সেতুবন্ধন ঘটানোর কাজ করে চলেছেন তারা লোকায়ত জ্ঞানকে সাঙ্গীকরণ করার আগ্রহ বোধ করবেন। বিশ্বজোড়া পরিবর্তনের জৈব ও সাংস্কৃতিক পরিণামের মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্মিলিত প্রয়োগ, এর ফলে আরও ভালোভাবে করা যাবে।[নিসবেট এবং অন্যান্য ২০১০] খণ্ডিতভাবে জ্ঞানকে দেখার দৃষ্টিকোণ আবিষ্কারের দিগন্তকে সঙ্কুচিত করে। ওপরে আলোচিত প্রয়াস ওই দৃষ্টিকোণকে এড়াতে সাহায্য করতে পারে।

জনজাতির বিজ্ঞান ও বিদ্যায়তনিক ও লোকায়ত বিজ্ঞানের তুলনা

প্রজাতি, আবাসভূমি ও ভূবৈচিত্র্যের পশ্চিমী বর্গীকরণ ও জনজাতিক দৃষ্টিকোণে বর্গীকরণের মধ্যে সরাসরি তুলনা করা আগে কখনো সম্ভব ছিল না, এখন সেটা সম্ভব। জীববৈচিত্র্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখা ও বর্গীকরণ এক বিশাল উদার ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে যেখানে মিলিত ও সশ্রদ্ধ আন্তঃসাংস্কৃতিক জ্ঞানচর্চা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন বিশ্বদৃষ্টির যোগ-সূত্রগুলো আগামীদিনের তথ্যায়ন ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টার যাত্রাবিন্দু হতে পারে। একটা ব্যাপার খুব কৌতূহল জাগায়। সম্পূর্ণ আলাদা সংস্কৃতির মানুষরাও যে তাদের চারপাশের প্রাণী ও আবাসভূমি নিয়ে বর্গীকরণের একেবারে আলাদা কাঠামো তৈরি করেছে তা নয়। [আত্রীন ১৯৮]

পশ্চিমী ও স্থানীয় বর্গীকরণের মধ্যে একদিকে যেমন ব্যাপকভাবে ঘোষিত হয়েছে হুবহু সঙ্গতির দৃষ্টান্ত, আবার অন্যদিকে জটিল রহস্যময় বিভিন্নতা। প্রজাতিগুলোর পুরাণসম্মত ভৌগোলিক উদ্ভব ও তাদের জনজাতির মধ্যে প্রচলিত নাম আছে। প্রশ্নটা হল বৈজ্ঞানিকদের পর্যবেক্ষণগুলোর মত এসব নাম ও পুরাণ কি পরীক্ষণযোগ্য প্রকল্পের ভিত্তি হতে পারে?

বেশিরভাগ জনজাতিক বিজ্ঞানের জ্ঞানভিত্তিক শিকড় ছড়িয়ে আছে প্রাকৃতিক ইতিহাসের স্থানিক পর্যবেক্ষণের জমিতে। শত শত, হাজার হাজার বছরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার নির্যাস পাই শব্দভাণ্ডারে, পঞ্জিকায়, স্থান নামে, মানচিত্রে এবং সর্দারদের আচার-অনুষ্ঠানে। জনজাতিক-বিজ্ঞান বিদ্যায়তনিক ও লোকায়ত বিজ্ঞানের পরিপন্থী বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। [সারণী-১]। বরং সেগুলির পরিপূরক। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বর্গীকরণ ইতিমধ্যেই স্থানভিত্তিক প্রাকৃতিক ইতিহাসের বিশদ বিবরণের সঙ্গে কয়েকটা বিষয়ে সেতু গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে আছে নৈতিক মাত্রা এবং শিল্পসম্মত, কার্যকরী যোগাযোগ কৌশলের ব্যবস্থা। সম্প্রতি জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু বিজ্ঞানীদের অনেকে তা তাদের কাজের অঙ্গীভূত করার চেষ্টা করছেন। [নিসবেট এবং অন্যান্য ২০১০]

ভাষা হারানোর গতি যত বেড়ে যায়, প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক জীবনযাত্রা পদ্ধতি যত ক্ষয় পায়—সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যেতে থাকে পরম্পরাগত বাস্তুতন্ত্রের জ্ঞান। [লো এবং হীরমন ২০১৪] বিশেষ জীব বা বস্তুতান্ত্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া একসময় যেসব শব্দমালার সাহায্যে বোঝানো হত সেগুলোর অব্যবহারের ফলে জ্ঞান আধাখ্যাঁচড়া হয়ে যায়। এর ফলে বিশেষভাবে জনজাতি এবং সাধারণভাবে মানবসমাজের পক্ষে সর্বাঙ্গীন বোধোদয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিপন্ন প্রজাতি, আবাসভূমি এবং বর্তমানে তাদের ওপর যে চাপ পড়ছে সেগুলোর ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। [বার্কস ২০১২] এছাড়া বিশ্বজুড়ে ভাষা ও বাচকসংখ্যার বণ্টন অদ্ভুত চেহারা নিয়েছে। পৃথিবীর ৭ হাজার ভাষার মধ্যে মাত্র ২৪টি ভাষার কোনো না কোনো একটায় অর্ধেক মানুষ কথা বলে। অন্যদিকে পৃথিবীর ০.১ শতাংশ মানুষ, অর্থাৎ ৮০ লক্ষ মানুষ ৩৬০০ ভাষায় কথা বলে। [লো এবং হীরমন ২০১৪]

তা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। স্থানীয়ভাবে যেসব হ্রাসমান অথবা ব্যাপকভাবে বিলীয়মান প্রজাতি এখনও টিকে আছে, তারা কোথায়

কোথায় ছড়িয়ে আছে, কী তাদের আবাসভূমির প্রয়োজন এবং আচরণ, তা পশ্চিমী প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের চেয়ে জাতিগোষ্ঠী ও স্থানীয় লোকেদের কাছেই বেশি জানা থাকার কথা। [নাভান ২০০০] প্রজাতি পুনরুজ্জীবন ও আবাসভূমি সংরক্ষণ এই দু'ধরনের উদ্যোগেই দিশারী হিসেবে স্থানভিত্তিক জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি। জনজাতীয়, মৎস্যজীবী, পশুপালক ও শিকারিদের জীবনযাত্রা যেসব সম্পদ টিকিয়ে রাখার উপর নির্ভরশীল তাদের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য ওপরের উদ্যোগগুলো আবশ্যিক হতে পারে। [বার্কস ২০১২]

সৌভাগ্যক্রমে, কয়েক দশক ধরে জীববিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকেই জনজাতি গোষ্ঠীর প্রধানদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও প্রথম জাতিগুলোর জল ও স্থলভাগে যেসব জৈবসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য টিঁকে আছে তার তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধীভুক্ত করাই এই যৌথ কাজের ক্ষেত্র। [মাফফি ২০০১] অল্পদিন আগেও পেশাদারী বিজ্ঞানীদের দেওয়া প্রযুক্তিগত সমর্থনের সাহায্যে পরম্পরাগত জনজাতির প্রধানদের পরিচালনায় খুব সামান্য সমীক্ষাই চালানো হয়েছে। [গুপ্ত ও অন্যান্য ১৯৯৩] যাইহোক, এখন অভূতপূর্ব পরিমাণে জনজাতিগোষ্ঠীর প্রধানরা তাঁদের এলাকার জীববৈচিত্র্যের তথ্যায়নে পুরো নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে পানামার কুনা ইয়ালা বাসভূমি। সেখানের পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং পরম্পরাগত ভেষজ উদ্ভিদের হিসেব এভাবে নেওয়া হচ্ছে। [ভেন্টোচিল্লা ১৯৯৫]

বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে নানারকম তথ্য, মূল্যমান ও সৃষ্টিতত্ত্ব পাওয়া যায়। সেগুলোকে মেলাতে গেলে একটা সৃজনশীল টানাপোড়েন চলে। জীবকূলের শ্রেণিকরণ লোকবিজ্ঞানে একভাবে করা হয়। তার মধ্যে নিহিত নীতিতে 'সার্বজনীন নিয়ম' খোঁজেন অনেক ভাষাবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানী। তাঁরা একবগ্গা তাত্ত্বিক গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত হন বলে মনে হয়। এদের মধ্যে অনেকেই আপাতসমতা খুঁজে পেলেই খুশি হন। বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণিকরণ ও লোকবৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ সমানে সমানে মিলে গেলেই তাঁরা ধরে নেন যে এই শ্রেণিকরণগুলোই 'জীববৈজ্ঞানিকভাবে বাস্তবত বিরাজমান', আপতিক নির্মাণ নয় [বেগসিস এবং অন্যান্য ২০০৮]। সার্বজনীন নিয়মের এরকম অতিসরলীকৃত-প্রয়োগ বৈচিত্র্যের সারবস্তুকেই অবহেলা করে ফেলার ঝুঁকি

নেয়। এর বদলে দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফেরানো দরকার। বিশেষ নজর দেওয়া উচিত অসামঞ্জস্যগুলোর দিকে, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক স্ফূরণের দিকে এবং শ্রেণিকরণের কাঠামোর বৈষম্যের মধ্যে যে সংঘাত সেদিকে। ভাষাবিজ্ঞানী ও জীববর্গীকরণবাদীর্ ঐতিহাসিকভাবেই অসংগতির চেয়ে ধ্রুব নিশ্চয়তা পছন্দ করেন, এটা আমরা জানি। তবুও, আমরা সে পথে চলতে আর রাজি নই। যে-বৈচিত্র্যকে আমরা সম্মান করি তাকে বিপন্ন করে চিরাচরিত পথে চলার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়।

কয়েকটি নির্বাচিত পরম্পরাগত জ্ঞান ও জৈব সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ উদ্যোগের চালচিত্র

জীববৈচিত্র্যের অনুধাবন ও সংরক্ষণকে নানাভাবে বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে জনজাতির অর্জিত জ্ঞানকে মেলানো দরকার। এর ফলে যেসব সুফল পাওয়া যেতে পারে তার একটা সংক্ষিপ্ত চালচিত্র এখানে আমরা উপস্থিত করছি। গত দু'দশক ধরে যেসব উদ্যোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, সেগুলো এমনসব পরিপ্রেক্ষিতকে চিহ্নিত ও তথ্যায়িত করতে সক্ষম হয়েছে যাতে পশ্চিমী বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে স্থানীয় জনজাতিগোষ্ঠীর জ্ঞানের দ্বিমুখী আদান-প্রদান গড়ে উঠছে। একই সঙ্গে ক্ষমতায়নের প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য হয়ে উঠেছে জনজাতির গোষ্ঠীপ্রধান ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশে দাঁড়ানো যাতে তারা তাদের স্থলভূমি ও জলভূমিকে রক্ষা করতে পারে। আমাদের বিদ্যাচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্র জুড়েই মিলিত কার্যক্রমের পথ প্রসারিত।

বৈশিষ্ট্য	পশ্চিমী বিজ্ঞান	অপেশাদার বিজ্ঞান	পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞান
লক্ষ্য	সর্বজনীনতা খোঁজা, পরীক্ষণের সাহায্যে তত্ত্বের সত্যতা নির্ধারণ, উপাৎ বিশ্লেষণ করে মডেল নির্মাণ	সর্বজনীনতার খোঁজারুদের এবং তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য স্থানীয় উপাত্ত সরবরাহ	সাংস্কৃতিকভাবে স্থানকালের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমায় প্রাপ্ত উপাত্ত ও ছক বিশ্লেষণ হাজির করা

বৈশিষ্ট্য	পশ্চিমী বিজ্ঞান	অপেশাদার বিজ্ঞান	পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞান
অংশগ্রহণকারী	বিদ্যায়তনে প্রশিক্ষিত পেশাদার ও প্রকৌশলীরাই প্রধানত কাজটা করেন। তাঁদের মধ্যে কিছু আছেন প্রকৃতিবাদী	বিজ্ঞানীরা প্রধানত অন্য পেশায় প্রশিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত, অঙ্গীকারবদ্ধ 'শৌখিন' প্রকৃতিবাদী	প্রধানত 'প্রাক-পেশাদার প্রকৃতিবাদী পশুপালক, শিকারি, মৎস্যজীবী, কৃষক ও পুরোহিত
সংজ্ঞাপনের উপায়	প্রথমত, লিখিত বস্তু, রেখাচিত্র এবং বক্তৃতার সাহায্যে পস্থাপনা [আনুষ্ঠানিক]	প্রথমত, ক্ষেত্রসমীক্ষার খসড়া, সামাজিক মাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন উপাত্তভিত্তি ও বহির্ভূত আলোচনা	মুখে মুখে জনজাতির ভাষায় এবং গান, গল্প, মানচিত্র ও শিল্পকলার সাহায্যে
কর্মকাঠামো	সর্বজনীন উপকারের জন্য ব্যক্তি, ছোটো ছোটো দল বা বৈদ্যুতিন জালের সাহায্যে কাজ করা হয়।	ব্যক্তি বা স্বেচ্ছাসেবী দল আনন্দের জন্য অনুষ্ঠানবর্জিত কর্মজালের কাজটা করে। প্রায়ই পেশাদারী কোনো বিজ্ঞানী তাদের পরিচালনা করেন।	প্রজন্মের পর প্রজন্মের গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমত গোষ্ঠী স্বার্থেই কাজটা করা হয়।
বিশ্বদৃষ্টি	আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সতর্ক, নৈতিক আচারের বিষয়ে দ্বিধান্বিত	আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আচারের বিষয়ে সরাসরি চর্চা করে বলে তাদের কাজ মূল্যবান, কিন্তু এটা নির্ভর করে পরীক্ষেয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর এবং এব্যাপারে মনোভাব দ্বিমুখী।	নিরঙ্কুশভাবে আধ্যাত্মিক এবং নীতি আচারের বিবেচনার সঙ্গে যুক্ত
পদ্ধতিগত বিষয়	বিষয়-বিষয়ীর বিভাজনের ওপর জোর দেয়	বিষয়-বিষয়ীর বিভাজন ও দ্বৈততা সম্বন্ধে দোলাচল এদের মধ্যে বিদ্যমান।	বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈততা নির্দিষ্ট এলাকার সাংস্কৃতিক-বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের গভীরে নিহিত

বৈশিষ্ট্য	পশ্চিমী বিজ্ঞান	অপেশাদার বিজ্ঞান	পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞান
স্থান/পরিমাণ	মডেল পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে স্থাননির্বিশেষে ক্রমশ বেশি বেশি করে কাজ হচ্ছে	স্থানভিত্তিক অনুসন্ধান ভালোবাসার টানে করা	

উৎস: বার্কস (২০১২) ও মিলার রাশিং ও সহকর্মীবৃন্দ (২০১২)

নবীকরণযোগ্য [নবায়নসাধ্য] দীর্ঘকালব্যাপী কর্মকৌশলের সমর্থনে জনজাতির বিশ্বদৃষ্টি

মায়া জনগোষ্ঠী তিন হাজার বছর ধরে ইউকাটান উপদ্বীপ, দক্ষিণ মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার নানা ধরনের ভূ-ভাগে বসবাস করে এসেছে। এরা চারপাশের ভূ-ভাগের সঙ্গে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সম্পর্কিত। পদ্ধতিটা একটা ভরকেন্দ্রকে ঘিরে ঘুরতে থাকে। তার মধ্যে আছে মূল্যমান, বিশ্বাস ও প্রাকৃতিক জগতের প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের এক নিয়মতন্ত্র। অনেক স্থানভিত্তিক সমাজ সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। মৃত্তিকায় জীববৈচিত্র্যের জন্য, মাটির অসমসত্ততার জন্য এবং পরিবর্তনশীল ভূ-ভাগে সফল কৃষি কাজের অভিযোজী ক্রিয়াকর্মের রূপ বোঝাতে ছোট চাষি মায়া জনগোষ্ঠীর মৃত্তিকা বর্গীকরণে ৮০টার বেশি বর্ণনামূলক শব্দ পাওয়া যায়। মায়া গোষ্ঠীর পরিবেশ জ্ঞান বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে এসেছে—যেমন ভুট্টা চাষ, কৃষিযোগ্য বনসৃজন, উদ্যানপালন, মৌমাছি পালন, শিকার, সংগ্রহ ও মাছ ধরা।[বারেরা ও অন্যান্য ২০০] মায়া সমাজ ও বাস্তুতন্ত্র বারবার ফিরে ফিরে আসে। এই নবায়ন সাধ্যতার বৈশিষ্ট্য কী? এর সঙ্গে নিবিড় জালে জড়িয়ে আছে পবিত্রতার ধারণা। আধ্যাত্মিক ও বাস্তবক্রিয়াকর্মের এই বুনট বীজাকারে নিহিত আছে মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত এক আরোগ্য লোকাচারে। নানারকম ভূমিসংস্থান এটা নবায়নসাধ্য রাখে [ওই ২০০৫]।

জনজাতি গোষ্ঠীগুলির এই বৈশিষ্ট্য স্থানীয় বসতিভিত্তিক অন্য গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এদের নিজস্ব অভিযোজন প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতি আছে যা জনজাতি সমাজের মতোই আধুনিকীকরণের হুমকির সামনে পড়েছে। এমন একটা গোষ্ঠীর দেখা পাই লস কালিফোরনিওস এলাকায়। নিম্ন ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে পশুপালক পরিবারগুলো এমনই একটা

গোষ্ঠী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মিশনারি ও সামরিক অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সঙ্গে যেসব সৈন্য, নাবিক ও ভৃত্যরা এসেছিল তাদের অনেকে এই প্রান্তিক এলাকায় থেকে যায়। বর্তমানের পশুপালক পরিবারগুলো তাদেরই বংশধর।[ক্রসবি ১৯৮] দুশো বছরের বেশি সময় আগে যেভাবে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হত, বর্তমানের কয়েকশো পরিবার অনেকটাই সেই জীবনধারা অব্যাহত রেখেছে। পশুপালক জীবন স্বয়ম্ভর। উষর পার্বত্য এলাকার মরুদ্যানে তারা কৃষিউদ্যান গড়ে তুলেছিল। তাছাড়া চামড়ার কাজের জন্যও তাদের খ্যাতি ছিল।

সমপাতী জ্ঞানতন্ত্র

পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞান ও বিবর্তনবাদী জীববিদ্যার সংহতি বিচ্ছিন্ন এলাকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ ওইসব এলাকার অন্তর্নিবিষ্ট বৈচিত্র্য উভয় জ্ঞানতন্ত্রের নাগালের বাইরে হয়তো এতদিন থেকে গিয়েছিল। প্রজাতিস্তরের নিচের নির্দিষ্ট প্রাণীদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জনজাতি গোষ্ঠীর জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে। তেমন কয়েকটি প্রাণীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন: ক্যারিবু, ধনুকমাথা তিমি, প্রশান্ত মহাসাগরীয় হেরিং, সামুদ্রিক সবুজ কচ্ছপ এবং ভোঁতামুণ্ডু টিয়ামাছ।

ইয়ু ইশ্চি অঞ্চলের ক্রি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞানের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের সংযোগ স্পষ্টতই দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে জনজাতির জ্ঞান সংরক্ষণ পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করে। [ফ্রেজার ও অন্যান্য ২০০৬] পশ্চিমী বিজ্ঞান মরশুমি পরিব্রজনের অভ্যাস ও জনজীব বিজ্ঞানের চর্চা প্রসঙ্গে ক্রি জনজাতি ছোটনদী সংক্রান্ত পরম্পরাগত জ্ঞানের সহায়তা নিয়েছে। জ্ঞানের এই সংগ্রহ কয়েকটা ব্যাপারে একরকম ও বাড়তি কিছু তথ্য হাজির করেছে। বিষয়গুলো হল জনসংখ্যার ন্যূনতম পরিমাণ, প্রজনন এলাকা ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর পরিব্রজনের ধরন। এসব তথ্য ও জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্য সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে।

জনজাতির জীববৈচিত্র্য তথ্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা

মেক্সিকোর ওহাকা অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের তথ্য সংগ্রহের জন্য অংশগ্রাহী গবেষণা চালানো হচ্ছে। [পেরেজ বয়েজ ২০১৫] এই দলে আছেন কয়েকজন

জীববিজ্ঞানী, একজন আলোকচিত্রী, একজন ফলিত ভাষাবিজ্ঞানী এবং কয়েকজন স্থানীয় সহকারী। এরা ৪০০ প্রজাতির অন্তর্গত ১৩৬০টি উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এগুলোর পাশাপাশি জুড়ে দেওয়া হয়েছে ১০০০ স্থানীয় নাম ও ৫০০০ উচ্চমানের আলোকচিত্র। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে যে এসব গাছ-গাছড়ার নাম ও তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্বেগের বিষয়টি মাথায় রেখেই গবেষণাটার প্রয়াস।

জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় সম্বন্ধে শিশুদের সচেতন করার প্রকল্পও নেওয়া হয়েছে। এইজন্য ১০টি আন্তঃপ্রাজন্মিক কর্মশালা ও তাতে ৬ জন স্থানীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় উদ্ভিদের ব্যাপারে দ্বিভাষিক উপকরণ [ওখানে দিদ হাজা ও স্প্যানি] তৈরি করা হয়েছে।

পরম্পরাগত জ্ঞানের পুনরুদ্ধার, পুনরুজ্জীবন ও পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মে সঞ্চারিত করা

গত ১০০ বছরে পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হওয়ার কারণে নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সামাজিক মাধ্যম জায়গা দখল করে বসেছিল। বয়স্কদের মুখ থেকে শুনে শুনে জ্ঞান সঞ্চারের প্রক্রিয়াটা রাহুগ্রাসে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও জেন্ট [১৯৯৯] ও অন্যান্যরা [যেমন, নাভান ২০০৩] উপায় খুঁজে বের করেছেন। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পরম্পরাগত জ্ঞানের হারিয়ে যাওয়ার হার এইসব উপায়ে জনজাতি গোষ্ঠীরা খুঁজে বের করতে পারে এবং পরিবেশ শিক্ষা কর্মসূচি প্রয়োগ করে সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করতে সক্ষম হয়।

বয়স্করা যখন মনোযোগী শিশুদের জীবিকার কাজকর্মের মাধ্যমে শেখায়, যেমন তাঁবুতে, ফসল তোলার মাঠে, দেশি পদ্ধতিতে শিকার ও মাছ ধরায় সঙ্গে রেখে, তখনই পরম্পরাগত জ্ঞান সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ আকারে নীচের প্রজন্মে কম সঞ্চারিত হয়। শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সেটা সম্ভব হয় না। [হান ২০০২, নাভান ২০১৬] এ ব্যাপারে আমাদের একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হয়েছে। মাঠে নেমে যে জীববিজ্ঞানীরা কাজ করেন তাঁরা যখন বয়স্ক ও তরুণদের একসঙ্গে কৃষি ও চারণভূমিতে নিয়ে গিয়ে বিরল ও চিরাচরিত প্রজাতিদের

মুখোমুখি করে দেন, এবং সাংস্কৃতিক প্রতীকী ও পবিত্র মিলন স্থানে জড়ো করেন, তখন জনজাতিগোষ্ঠীর বয়স্করা এই কর্মসূচিকে সাদরে গ্রহণ করেন। বসে বসে মৌখিক ইতিহাস ও সংরক্ষণমুখী কৃষিকাজ পরের প্রজন্মকে শেখানো যায় তাদের মাতৃভাষায়। হাতেকলমে কাজ সেগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে। [নাভান ২০১৬]

জনজাতির নেতৃত্বে জ্ঞান পরিবহণ

জনজাতিগোষ্ঠীর পরিচালিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে কোনো সমাজ স্থানীয় জ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশ নির্ভর জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে। [বার্কস ২০১২] এ সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার একটা নিদর্শন দেখানো যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের নাম NAILSMA (নর্দান অস্ট্রেলিয়ান জনজাতিক ভূমি ও সমুদ্র ব্যবস্থাপনা সংহতি)। এটা জনজাতি পরিচালিত একটা আধুনিক প্রতিষ্ঠান। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সমস্ত ভূমি ও জলসম্পদকে সর্বোত্তম ব্যবস্থায় কাজে লাগানোর জন্য এই সংস্থা একদিকে অস্ট্রেলিয়ার সরকারি প্রশাসন ও অন্যদিকে বিদ্যায়তনগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র রেখে কাজ করে। ওই অঞ্চলে ১৪টি আদিবাসী ভূমি ব্যবস্থাপক সংস্থা আছে। এরা যৌথভাবে ২ কোটি ৫০ লক্ষ হেক্টর ভূমিতে কাজ করে। এই যৌথ গোষ্ঠীর নাম কিমবার্লি রেঞ্জার যোগজাল। NAILSMA এই যোগজালের মাধ্যমে কাজ করে। [NAILSMA ২০১৬] এর মাধ্যমে ভূমিনির্ভর যাদের জীবিকা তারা মজবুত যন্ত্রপাতি ও দক্ষতা অর্জন করে যাতে পরম্পরাগত বাস্তুজ্ঞান ও পশ্চিমী বিজ্ঞান প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অন্য এলাকার জনজাতির সংরক্ষণ নেতৃবৃন্দও প্রশিক্ষণ পায়। যেমন এই প্রবন্ধে আলোচিত কমক্যাকদের নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। [কেনেট ও অন্যান্য ২০১০]

কাজের অধিকার ঠিক করা

এই আন্তর্জালের যুগে বর্গীকরণের খতিয়ানকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নতুন নতুন সমন্বয়ী প্রচেষ্টা চলছে। গেউইনের (২০০২) বিবরণে এগুলোর কথা পাওয়া যায়। এসব উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রায়ই ব্যাপকতর সমন্বয় ও

অংশগ্রাহী কৌশল গৃহীত হয়। বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগে পৃথিবীর অবশিষ্ট জীববৈচিত্র্যের খতিয়ান তৈরির উদ্দেশ্যেই এসব সমন্বয়ী প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হচ্ছে। এদের মধ্যে কতকগুলোতে অপেশাদার বিজ্ঞানীদের 'পার্শ্ববর্গীকরণবিদ্' হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সব ধরনের জীববৈচিত্র্যের বর্গীকরণের খতিয়ান তৈরির কাজে বিদ্যায়তনিক বিজ্ঞানীদের সাহায্য করাই এদের কাজ। কয়েকটা দৃষ্টান্ত চোখের সামনেই আছে, যেমন কোস্টারিকার গুয়ানাকাস্টে সংরক্ষণ এলাকা (জাজেন ২০০৪)। মেক্সিকোর জীববৈচিত্র্যজ্ঞান ও প্রয়োগ সংক্রান্ত জাতীয় কমিশন (CONAIBO)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় উদ্যানের বিশাল ধূমায়মান পর্বতাঞ্চলের জীববৈচিত্র্যমূলক কার্যক্রম (শার্কি ২০০১)। অবশ্য আমরা স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের খতিয়ান সংগ্রহের ক্ষেত্রে জনজাতি ও পশ্চিমী জ্ঞানের সর্বাত্মক সমন্বয়ী কাজের পক্ষে সওয়াল করি। নীচের বিবরণ সমীক্ষা থেকে এ ধরনের কাজের নমুনাই পাওয়া যাবে। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, গ্রামের জনগোষ্ঠীর সঞ্চিত জ্ঞান পশ্চিমী জ্ঞানের সমান মূল্যবান।

শুধুমাত্র প্রজাতির খতিয়ান তৈরি করা তো নয়, তার চেয়ে অনেক জটিল ও কালসংবেদী হল জৈবসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের বর্তমান সংকট। এই পরিস্থিতিতে, আরো প্রজাতি ও ভাষা (অন্তত তাদের শব্দভাণ্ডারের উপাদান) লুপ্ত হওয়ার আগে জনজাতিক, গ্রামীণ, অপেশাদার এবং পেশাদার বিজ্ঞানীদের নিচের চারটে কাজ সম্পন্ন করতে পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হবে:

১. তথ্যায়ন করতে হবে কম আলোচিত/সংখ্যালঘু এবং একান্ত স্থানীয় ভাষাগুলোতে। যত বেশি সম্ভব উদ্ভিদ ও প্রাণীদের স্থানীয় নাম বা নামাবলি তো লিপিবদ্ধ করতেই হবে, কিন্তু শুধু এটুকু নয়, এইসব প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবরণ ও প্রাকৃতিক ইতিহাসও নথিভুক্ত করতে হবে। বিশেষ জোর দিতে হবে বিপন্ন স্থানীয় প্রজাতিগুলোর ওপর যেগুলো সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাববিস্তার করেছে বলে মনে হয়।

২. স্থানীয় বর্গীকরণ ও পশ্চিমী জ্ঞান অনুযায়ী বর্গীকরণের মধ্যে সমতাও আছে, আবার বিভিন্ন দিক থেকে উভয়ে যাত্রা শুরু করলেও এক জায়গায় মেলার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সুনির্দিষ্ট তথ্য এবং কোথায় তাদের অসমতা তার বিবরণও যুক্ত করা দরকার।

৩. জীব বৈচিত্র্য নথিভুক্ত করার জন্য জনজাতিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ করতে হবে। তদারকির ভারও তাদের ওপর দিতে হবে। সংস্কৃতি নির্ভর আন্তঃপ্রাজন্মিক মাতৃভাষামাধ্যম শিক্ষাই হবে এর উপায়। এর সঙ্গে অন্যান্য বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞান ও প্রকরণ ব্যবহার করতে হবে।

৪. কোনো কোনো জনজাতি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের বাসভূমি ও জলাশয়ে বিরল প্রজাতিগুলো বাঁচাতে নিজেদের কর্মসূচি নিয়ে এগোতে চায়। তাদের ক্ষমতায়ন করতে ও সমর্থন দিতে হবে, যাতে স্থানীয় ভাষা ও প্রথার পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণ করা যায়। পরম্পরাগত জীবন-জীবিকার ধারা বাঁচিয়ে রাখাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

মেক্সিকোর ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর অঞ্চলের কমক্যাক বা সেরি জনগোষ্ঠীর বৃত্তান্ত সমীক্ষা

একটা বৃত্তান্ত সমীক্ষা (case study) হাজির করছি। যে চার-কর্তব্যের কথা বলা হল তাকে অবলম্বন করেই মেক্সিকোর সোনোরা অঞ্চলের সেরি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একসাথে মিলে দীর্ঘস্থায়ী সমন্বয়ে যুক্ত হয়েছেন একদল ভাষাবিজ্ঞানী, নৃ-জীববিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক, ভূবিজ্ঞানী, ভূমিব্যবস্থাপক এবং সংরক্ষণ-জীববিজ্ঞানী। গত ২৫ বছর ধরে এই কাজে গতি এসেছে। সেই বিবরণ এবার দেব।

এই কমক্যাক বা সেরি জনগোষ্ঠীর লোকেরা সমুদ্রে ঘোরাফেরা করে (sea farer)। তাদের সংস্কৃতি শিকারি-সংগ্রাহী গোত্রের। তারা অথবা তাদের পূর্বপুরুষ বা পূর্বনিবাসীরা হাজার হাজার

বছর ধরে শুষ্কপ্রায় সোনোরা মরুভূমি ও ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরের তীর ঘেঁষে বসবাস করে এসেছে। (চিত্র, বাওয়েন ২০০৯) ২০০৭ সালের হিসেবে সেরি জনগোষ্ঠীর ভাষা স্মাইক আইটমের বাচক সংখ্যা ছিল ৯০০। এদের প্রত্যেকেই দ্বিভাষী। দ্বিতীয় ভাষাটি স্প্যানিশ। এই ভাষাকে বিপন্ন বলে বর্ণনা করা হলেও (মোজের ও মারলেট ২০১০) ২০১৫-তে এই ভাষাকে 'প্রাণবন্ত' বলে লুইস এবং অন্যান্যরা দাবি করেছেন। প্রতিবেশী ভাষাগুলো উটো-আজটটেক বংশের হলেও স্মাইক আইটমকে কোনো ভাষাবংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ এর কোনো আত্মীয় ভাষার খোঁজ মেলেনি। সম্পূর্ণ একক এই ভাষা।

মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল পেশাদার বিজ্ঞানী, কমক্যাক জনগোষ্ঠীর গাওঁবুড়োরা এবং তরুণ কিছু 'পার্শ্ব বাস্তুবিজ্ঞানী' একটা প্রকল্পে জোট বাঁধেন। প্রকল্পটা প্রথমে ছিল স্বল্পকালীন ও নির্দিষ্ট বিষয়ক। কিন্তু কাজের ধারাবাহিকতা সেই সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গেল। সব বর্গের জীববৈচিত্র্যের নথি এই প্রথমবার যৌথ প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হল। এর মধ্যে কী না আছে? ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরের মরুপ্রায় সোনোরা উপকূল, মিডরিফ দ্বীপপুঞ্জ ও দ্বীপাণুগুলোর স্থলভাগ ও জলভাগের মানচিত্র, জীববৈচিত্র্য, ভাষা ও অধিবাসীদের জীবনশৈলী। ওই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যের কয়েক প্রস্থ বর্গনাম একদিকে স্মাইক আইটম ভাষায় অন্যদিকে পশ্চিমী বিদ্যায়তনিক বিজ্ঞানসম্মত পারিভাষিক শব্দে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি জীববৈচিত্র্যের খতিয়ান রচনা, আবাসভূমি সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা ছটি মান্য পত্রিকা ও চারটি বিদ্যায়তনিক প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে। এগুলির অন্যতম লেখকদের মধ্যে আছেন সেরি জনগোষ্ঠীর তরুণ পার্শ্ববাস্তুবিজ্ঞানী এবং গাওঁবুড়োরা। মূল্যবান সম্মিলিত সমীক্ষার ক্ষেত্রগুলো হল, তরলবাহী শিরা বিশিষ্ট উদ্ভিদ, শামুক, মাছ, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রজাতির এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চরণ। বিপন্ন প্রজাতিগুলোর পুনরুজ্জীবন। আবাসভূমি পুনঃস্থাপন এবং জনজাতির অর্থনীতিতে প্রজাতিগুলোর ব্যবহার। জীববৈচিত্র্যের এই বহুমুখী-সাংস্কৃতিক মূল্যায়ন কোনো অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর ধারণা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে অঞ্চলটি হল আশ্চর্যরকম বহুত্ব বিশিষ্ট

ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর ও চারপাশের সোনোরা মরুভূমি। নিচে কমক্যাকদের জীবনবৃত্তান্ত সমীক্ষার ক্ষেত্রে পরম্পরাগত পশ্চিমীজ্ঞানের যোগসূত্রের একগুচ্ছ দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

সারণি-২: কমক্যাক অঞ্চলে জনজাতি ও পশ্চিমী বর্গীকরণের খতিয়ান।

	*জনজাতিক বর্গীকরণ	**পশ্চিমী বর্গীকরণ
তরলবাহী শিরাবিশিষ্ট উদ্ভিদ	২৯১	৪৯৩
শম্বুক	২৬৪	১৮৮
সামুদ্রিক মাছ	১৫৬	১১৫
সামুদ্রিক সরীসৃপ	১৪	৬
স্থলভাগের সরীসৃপ	৪২	৪৬
পাখি	১৩৯	২৬২
সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী	১৯	২০
স্থলভাগের স্তন্যপায়ী	৪৮	৪৫

টীকা: * কমক্যাকরা যে বিশেষ নামে প্রজাতিগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের সংখ্যা।

** প্রজাতিগুলোকে যে নামে চিহ্নিত করা হয় তাদের সংখ্যা।

ভূ-চিত্র ও স্থাননাম

কমক্যাকরা তাঁদের ভূ-ভাগ ও জলভাগ সম্বন্ধে কীভাবে ধারণা গড়ে তোলে, কীভাবে সে সম্বন্ধে কথা বলে, এব্যাপারে গবেষকরা (যেমন ও'মেরা ২০১০) সমীক্ষা চালিয়েছেন। স্থাননামের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ, প্রাণী ও অন্যান্য জীবনোপকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো থেকে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগসূত্রের হদিস মেলে। যেমন, একটা জায়গার নাম 'মুসনি উঁফিয়া'। সেরি ভাষার এই শব্দটার মানে 'সবুজ সাগরকাছিমরা যেটাকে ঘিরে থাকে'। সমুদ্রের

একটা অগভীর চড়া যেখানে নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণীরা একটা সময় দলবেঁধে থাকে। সেই চড়াটাকেই এভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে।

একটা জায়গার নাম 'সেনেশ ইটখো'। শব্দটার মানে 'যেখানে অনেক প্রজাপতি'। যে জায়গাটাকে এই স্থাননামের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সেখানে আছে বিরল কোনো প্রস্রবণ অথবা চুইয়ে পড়া জলধারা অথবা পুষ্পসম্পদ। ঊষর ভূ-ভাগে এরকম কোনো অঞ্চলেই প্রজাপতিরা দলবেঁধে ঘোরে। এই শব্দটি মানুষের টিকে থাকার জন্য খুব দরকার। কারণ চরম মরুপ্রায় 'সান এস্তেভান' দ্বীপে এই নামের স্থানটিতেই বিরল বৃষ্টিপাতের পর মানুষ নির্মল জলধারা পেতে পারে। সংস্কৃতিগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় জৈব সম্পদের ইশারা এসব স্থাননাম থেকে পাওয়া যায়।

ও'মেরা (২০১০) দেখিয়েছেন কীভাবে কমক্যাকরা ভূ-ভাগ সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ করে। সাধারণ বা ব্যাপকপদের সঙ্গে সংকীর্ণ বিশেষ পদ জুড়ে তারা প্রাণী, উদ্ভিদ বা বস্তুটির পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। পারিভাষিক শব্দগুচ্ছের প্রথম শব্দটি সামান্যবাচক অর্থাৎ ব্যাপক (generic) দ্বিতীয়টি বিশেষ বাচক। এই দুটি মিলে নির্দিষ্ট পদটি তৈরি হয় যেমন, 'জিনক্স' শব্দটি একটি সামান্য পদ। মানে 'বস্তু'। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল 'কোকেট', যার মানে 'যা লাফায়'। তৈরি হল 'জিনেক্'স কোকেট' আক্ষরিক অর্থ 'বস্তু যা লাফায়'। '(খেলার) বল' সেরি ভাষায় এভাবেই 'বল'-কে বোঝানো হয়। আবার 'জিনক্স কোজিপ' আক্ষরিক অর্থে 'বস্তু যা চুমু খায়'। আসলে 'গোললেজওয়ালা ভুঁই-কাঠবেড়ালি'-কে এভাবে প্রকাশ করা হয়। এরকম খুঁটিয়ে বর্ণনাত্মক প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারা যায় কীভাবে কমক্যাকরা চারপাশের জগত সম্বন্ধে ধারণা করে।

ভরা কোটাল আর মরা কোটালে ঢেউ ভাঙ্গার অন্তর্বর্তী এলাকারও সামান্য নাম কমক্যাকদের মধ্যে প্রচলিত।

'খেপ কম= সাগর শুয়ে আছে।'

'খেপ কুই আইটিল= সাগরের প্রান্ত।'

জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী সৈকতে অনেক সামুদ্রিক প্রাণীর গতিবিধি দেখা যায়। ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে সেগুলোর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। স্থলভাগের উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের ধারণার গড়ন বুঝতে পারলে

এলাকার প্রজাতিগুলোর বিন্যাসের ধরন, তাদের প্রকৃতি এবং কী প্রয়োজন তারা মেটায় সে সম্বন্ধে ইশারা পাওয়া যায়।

আঞ্চলিক জীবজগত সম্বন্ধে যে জ্ঞান লুপ্ত হয়েছে সেরি স্থলনামের মধ্যে সেগুলোর সংকেত নিহিত আছে। যেমন, ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরের একটি ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ আছে, 'রসা দ্বীপ'। ছোটো হলেও সাগর বিহঙ্গকুলের আস্তানা হিসেবে বিশ্বজুড়ে এর নাম। স্মাইক আইটম ভাষায় এই দ্বীপের নাম 'টসনি ইটি ইহিতকেট। এর অর্থ 'যেখানে পেলিকানদের ছানা জন্মায়। অনেকে এই নামটাকে পাত্তা দিলেন না (অ্যান্ডারসন ২০১৩)। কারণ বর্তমানে তো নয়ই, কোনোদিন এখানে কেউ পেলিক্যানদের দেখেননি। অবশেষে এককালের ইতালীয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী ফেদেরিকো ক্রা ভেরির একটা ভ্রমণলিপি পাওয়া গেল। তিনি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগরে সমুদ্রযাত্রার সময় রাসা দ্বীপে কচি কচি পেলিক্যানদের দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। ফলে সেরি জনগোষ্ঠীর দেওয়া নামের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল। (বাওয়েন এবং অন্যান্য ২০১৫)। এভাবে স্থাননাম প্রাণীদের বিচরণভূমির হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের সন্ধান দিতে পারে।

নতুন নতুন আবিষ্কার

হাজার হাজার বছর ধরে কমক্যাকদের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে যৌথ প্রজ্ঞা গড়ে উঠেছে। স্থানীয় জটিল ভাষিক প্রকাশরূপ ও সাংস্কৃতিক অভ্যাসের মধ্যে তা নিহিত আছে। আঞ্চলিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝেই নতুন নতুন বিস্ময়কর তথ্য সামনে চলে আসে। এলাকায় পরিবর্তন বা বিপন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে দেখা যায়। (নাভান ২০০৩)

সমন্বয়ী জ্ঞানচর্চা প্রায়ই পশ্চিমী জীববর্গবিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছে। যেসব প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণী এ পর্যন্ত তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেননি, সেগুলোর খোঁজ দিয়েছে। ধরা যাক বুনো টেপারি শুঁটির কথা। কমক্যাক গোষ্ঠীর যারা টিবুরণ দ্বীপের অনেক ভেতরের দিকে বাস করত এক সময়, এই শুঁটি তাদের খাদ্যাভ্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে টিবুরনের মতো অত শুষ্ক অঞ্চলে ওই দেশি শুঁটি জন্মাতে পারে না। যাই হোক একজন সেরি গাঁওবুড়ো রোসা ফ্লোরেস উদ্ভিদবিজ্ঞানী রিচার্ড ফ্লেজারকে

পথ দেখিয়ে একটা খুব দূরের জায়গায় নিয়ে গেলেন। জায়গাটার নাম 'হাপ কাইজি কুই: ইয়াই।' মানে 'টেপারিশুঁটি খেকোর থান।' রোসা ফ্লোরেস ও ৩০ বছর পর এই এলাকায় এলেন। এটা আগ্নেয় পাহাড়ি এলাকা। বহু কিলোমিটার দূরে একটা বড় পর্বতমালার অপরপ্রান্তে পাথরের খাঁজে খোঁদলে দেখা গেল সজীব 'হাপ' বা শুঁটির প্রাচুর্য (ফেলগার ২০০০)।

বিদ্যায়তনিক বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েনি ফলে লিপিবদ্ধও হয়নি, প্রজাতিগত এমন অনেক আচরণ কমক্যাকরা পর্যবেক্ষণ করেছে এবং স্মৃতিতে বিধৃত আছে। যেমন শীতকালে সাগর কচ্ছপরা কী করে? বিদ্যায়তনিক বিজ্ঞানীরা মনে করতেন তারা শীতল এলাকা ছেড়ে উষ্ণ এলাকায় পরিযান করে। কমক্যাকরা শীতকালেও কিছু কচ্ছপের থেকে যাওয়া ও আচরণ লক্ষ্য করেছে। (ফেলজার ১৯৭৬)

কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বড় রকমের খামতি। ধরা যাক শামুকজাতীয় প্রাণীর নানা গোত্রের নাম সংগ্রহ। হয়তো সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানীরা সবাইকে চিহ্নিত করতে পারেননি। অথবা স্থানীয় ক্ষেত্র থেকে সেগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সেরি ভাষায় তাদের নাম টিকে আছে? ক্যালিফোর্নিয়া উপসাগর বরাবর কমক্যাক জাতির পূর্বপুরুষরা সমুদ্রযাত্রা করেছে। তাঁদের গান ও গল্পে সেসব প্রাচীন সমুদ্র বিবরণের প্রসঙ্গে অনেক পৌরাণিক সামুদ্রিক প্রাণী ও সরীসৃপের বিবরণ ধরা আছে। পশ্চিমী বিজ্ঞান তার খোঁজ রাখে না। (মন্টি ২০০২)

আমদানি ও উৎসাদন

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আমরা বর্তমানে যেভাবে ছড়িয়ে থাকতে দেখি তার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের হয়তো নজর এড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝেই দেখা যায় কোনো প্রজাতিকে যেখানে পাওয়ার কথা সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে যেখানে তাদের পাওয়ার কথাই নয় সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। কারণ কী? পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ক্রমশ বেশি বেশি করে প্রমাণ জড়ো হচ্ছে যে এই অসঙ্গতির পেছনে জেনে বা না-জেনে মানুষের ক্রিয়া-কলাপই দায়ী। (হেনসন, রঙ্গন, বেল ২০১৫)

সেই অঞ্চলের মরুউদ্ভিদ ও প্রাণীদের ভৌগোলিক বিস্তার ও বর্গীকরণ নিয়ে কয়েকটা সমীক্ষা হয়েছে। তাতে জানা গেছে, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে এ

বিষয়ে যে খতিয়ান তৈরি হয়েছে তার সংশোধন দরকার। কমক্যাক জনগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের ফলেই উদ্ভিদ ও প্রাণী এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। নাভান (২০০৫)-এর সমীক্ষার বিষয় ছিল 'চাকওয়াল্লা' নামক সরীসৃপ প্রজাতির সান এস্তেবান দ্বীপ থেকে অ্যালকাতরাজ দ্বীপাণুগুলির মধ্যে স্থানান্তরকরণ। কমক্যাকদের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রচলিত যে একসময় শুধু সান এস্তেবানেই এই প্রাণীগুলো পাওয়া যেত। খাদ্য হিসেবে এদের (অনেক সময় পা ভেঙে দিয়ে) দ্বীপগুলোতে নিয়ে যাওয়া হয়। আজও পর্যন্ত যে অ্যালকাতরাজ দ্বীপাণুগুলোতে প্রাণীটির রহস্যময় উপস্থিতি চোখে পড়ে, তার কারণও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। ডেভি ও তাঁর সহকর্মীরা (২০১১) জিনবিদ্যার সাহায্যে সরাসরি একটা প্রকল্প পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। কাঁটাওয়ালা লেজবিশিষ্ট ইগুয়ানাদের দুটো প্রজাতি আছে। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন একটা প্রজাতি নোলাস্কো দ্বীপ থেকে মানুষের হস্তক্ষেপে সান এস্তেবানে এসেছে। এজন্য তাদের নামকরণে নোলাস্কো দ্বীপের আদি উৎস ধরে নোলাস্কেনেসিস করা হয়েছে। এই প্রকল্পটাই ডেভি ও তাঁর সহকর্মীরা পরখ করে দেখতে চাইছিলেন। সেরি জনগোষ্ঠী কিন্তু বরাবর বলে এসেছে না নোলাস্কো থেকে ওই প্রজাতির ইগুয়ানা মানুষ নিয়ে আসেনি। ডেভি ও সহযোগীরা প্রজাতি দুটি জীবকোষের অণু তথ্য পরীক্ষা করে জানালেন প্রজাতি দুটোর আলাদা হওয়ার কাল। সেই কালে ভূ-পৃষ্টের ওই অঞ্চলে মানুষের বসবাস শুরুই হয়নি। এক্ষেত্রে দেখা গেল কীভাবে পরম্পরাগত জ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হল। বাওয়েন (২০০৩)-এর সমীক্ষার বিষয় ছিল সান এস্তেবান দ্বীপে অর্গানপাইপ ক্যাকটাসের বিরল উপস্থিতি ও বাদুড়ের স্থানত্যাগের পেছনে কমক্যাকদের হাত এবং অণুজলবায়ু ও অতীতের জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা। যে সমীক্ষাগুলোয় পরম্পরাগত ও পশ্চিমী বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মিলন ঘটে, তাদের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় কোন কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী সেরি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির ফলে দ্বীপমালায় ও উপকূলের আবাসভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই অনুযায়ী পুরনো বর্গীকরণের সংস্কার করাও সম্ভব।

আবার কখনও কখনও জনজাতিক সমাজের সঞ্চিত জ্ঞান পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার তুলনায় পিছিয়ে আছে, এমনটাও দেখা যায়। সেরি জনগোষ্ঠীর পুরাণকথা, জৈব ইতিহাসের নথি, দুটো থেকেই জানা যায় টিবুরন দ্বীপে

বড়োশিংওয়ালা মরু মেষ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি টিবুরন দ্বীপে ১৫০০ বছর আগের মেষের নাদি পাওয়া গেছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে পুনরায় বন্যজন্তু হওয়ার আগে এই প্রজাতিটি এই দ্বীপে ছিল। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমী বিজ্ঞান এমন কিছু আবিষ্কার করেছে যা পরম্পরাগত পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েনি।

সেরি জনগোষ্ঠীর জ্ঞানকে কয়েকটা ক্ষেত্রে বেশি বেশি করে ব্যবহার করার সুযোগ আমাদের কাছে এসেছে। যেমন স্থাননাম (উদ্ভিদ ও প্রাণীর নামে এই দ্বীপের নাম এখন আর দেখা যায় না), সাংস্কৃতিক অর্থাৎ জীবন ধারার আচার-আচরণ (যেমন, প্রসূতির গর্ভফুল মাটিতে পুঁতে তার ওপর ফণিমনসার গাছ লাগিয়ে দেওয়া) যার ফলে উদ্ভিদের আবাসবণ্টনের বৈসাদৃশ্য ঘটে যায়। পুরাণকথা (যেমন, কমক্যাকদের পূর্বপুরুষরা ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে পড়েছিল, পালাতে গিয়ে তারা বুজমগাছে পরিণত হয়।) এই গাছ এখনও সোনোরা অঞ্চলে দেখা যায়। বায়া ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের বাইরে শুধু এখানেই এই উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এসব থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়ী প্রয়াসেই বৈজ্ঞানিক প্রকল্প পরীক্ষিত হতে পারে।

বাধা-বিপত্তি

সেরি ও অন্যান্য জনজাতির ভাষা ও আবাসভূমির ওপর নিরন্তর বাইরের চাপ এসে পড়ছে। যতই তারা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে, ততই অর্থনৈতিক চাপে পরম্পরাগত জীবিকা হারিয়ে জীবনধারাটাই বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীর নানা প্রান্তে বাইরের শক্তিদের গ্রাসে আদিবাসীদের বাসভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া অবিরাম চলছে। অথচ পরম্পরাগত বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানকে সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করতেই হবে। ২০০৮ সালে রাষ্ট্রসংঘ জনজাতিদের অধিকারের ঘোষণা গ্রহণ করে। সেই ঘোষণায় জনজাতিদের স্ব-শাসন, মেধাসম্পদ, ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যেকোনো পূরণযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের আগে আদিবাসীদের প্রাক-সম্মতি অবশ্যই নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাস্তু ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ভাষা পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা সহযোগী আদিবাসীদের দু'ভাবে কাজে লাগে। একদিকে সহযোগী হিসেবে তাঁরা পারিশ্রমিক পায়,

অন্যদিকে, দক্ষতাভিত্তিক ও ক্ষমতায়নের ফলে তাদের মানসিক ও আবেগগত উত্তরণ ঘটে।

সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া চালানোর ক্ষেত্রেও অনেক সমস্যা দেখা যায়। একটা বড় বাধা হল বাইরে থেকে আসা সহযোগীদের পুরো সময় উপস্থিতি না থাকলেও কীভাবে প্রকল্পটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায়, প্রকল্পটা হয়তো সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হল, কিন্তু বাইরের গবেষকরা বিদায় নেওয়ার পরে অল্প সময়ের মধ্যেই কার্যকরী অভিমুখ হারাল বা উঠে গেল। সহযোগিতার বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্কও জটিল। কারণ সময় অল্প, বাজেট কম, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্বন্ধে নানা ধরনের বক্তব্য। জনজাতিদের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক কর্মপ্রকল্পের ক্ষেত্রে একটা গুরুতর খামতির বিষয় আছে। বাইরের গবেষকরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেগুলো লিখিত আকারে আদিবাসীদের বোধগম্য ভাষায়, বিদ্যায়তনিক কাঠিন্য মুক্ত সরলভাবে আদিবাসী সহযোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। সমন্বয়ী কাজের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে অনুসারী কার্যক্রম গ্রহণ না করায় ভবিষ্যতের যৌথ কার্যক্রমের উৎসাহ বাধা পায়।

পরবর্তী পদক্ষেপ

শুধু নথিভুক্তকরণ নয় লব্ধজ্ঞান যাতে জনজাতি গোষ্ঠীর সাথে ভাগ করে নেওয়া যায় এজন্য সক্রিয় চেষ্টা চলছে। ভাষা সংরক্ষণ ও প্রয়োগের দিকে তাকিয়ে মোজের ও মার্লেট ২০১০ সালে একখানা ত্রি-ভাষিক অভিধান সংকলন করেছেন। সেরি-স্প্যানিশ-ইংরেজিতে এই অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ৫০ বছরের শ্রমের ফসল এই অভিধান।

এছাড়াও তাঁরা স্মাইক আইটম ভাষায় অনেকগুলো একভাষিক গল্পের বই ছোটো ছোটো পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছেন। মাতৃভাষার এই বইগুলো সেরি গোষ্ঠীর কাজে লাগছে। মাতৃভাষায় সাক্ষরতা প্রদানের জন্য নিবিড় পাঠক্রম ও কর্মশালা সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চালু হয়েছে। মাতৃভাষাকে চালু রাখা ও পুনরুজীবনের এই কর্মসূচিতে সেরি জনগোষ্ঠীর কয়েকডজন তরুণ যুক্ত হয়েছে। এসব প্রয়াসের ফলে বেশ কিছু বয়স্ক সেরি মানুষ নিজের ভাষায়

লিখতে পড়তে শিখেছেন। এখন সেরি তরুণ প্রজন্ম নিশ্চয়তা দিতে পারছে যে তাদের গোষ্ঠীর প্রবীণরা যে পরম্পরাগত জ্ঞানের ধারক সেই জ্ঞান নথিভুক্ত, সংরক্ষিত ও উদযাপিত হচ্ছে জনগোষ্ঠীর মধ্যেই।

সেরি জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ পার্শ্ব-বাস্তুবিজ্ঞানী হওয়ার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তারা এখন মেক্সিকোর জাতীয় সংরক্ষিত অঞ্চল কমিশন (CONAND) এবং জনজাতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ কর্মসূচিতে কাজ করছেন। তাঁদের কাজের গুণমান যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, কনজারভেশন ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি। অংশগ্রহণকারী গবেষকদের (বিদ্যায়তনিক ও কমক্যাক উভয়ই) অনেকে এখন পরবর্তী প্রাজন্মিক সোনোরা মরু-গবেষণা সংস্থার সদস্য। এই সংগঠনে ওই এলাকায় গবেষণাকারী ৩৫০-এর বেশি অগ্রণী বিজ্ঞানী আছেন। তাঁদের অর্ধেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক মেক্সিকোর। নানা সংস্কৃতির জনজাতির নেতারা এবং ওই অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্বানরা সোনোরার জৈব-সাংস্কৃতিক সংযোগজাল আহ্বান করেছেন। মেক্সিকোর জাতীয় জৈব-সাংস্কৃতিক সংযোগজালের দ্বারা এটি অনুমোদিত। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলির বাস্তুতন্ত্র যেসব মারাত্মক হুমকির সামনে পড়েছে তাদের মোকাবেলা করাই এদের উদ্দেশ্য।

জৈব-সাংস্কৃতিক সংযোগজাল ও জনজাতীয় সংগঠনগুলি এখন কমক্যাকদের বিজ্ঞান ও সংরক্ষণ প্রকল্পের অন্যতম নেতা হিসেবে সামনে তুলে আনার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পূরণযোগ্য সংরক্ষণ উদ্যোগের কর্মসূচি (PROCODES) জনজাতিদের দ্বারা প্রস্তাবিত ও পরিচালিত প্রকল্পগুলির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা যুগিয়েছে। গোটা মেক্সিকো জুড়ে জনজাতিগোষ্ঠী পরিচালিত প্রকল্পগুলোর জন্য PROCODES-এর মাধ্যমে মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। কাজকর্ম চালানো ও মাঝারি মাপের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য এক বছর করে বরাদ্দ করা হয়। একদিকে আছে প্রকৃতিকে নিংড়ে নিয়ে ক্ষয়কারী উন্নয়নভিত্তিক উপার্জন। অন্যদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবিকা টিকিয়ে রাখার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ। ওপরের প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য দ্বিতীয়টা। এর মূল্য কোনোভাবেই ছোট করে দেখা যাবে না।

কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষা ও দক্ষতাপ্রশিক্ষণের মধ্যে এক গভীর ফাঁক রয়ে

গেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটা হল—প্রস্তাব লেখা, বাজেট তৈরি করা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা। ওপরে যেসব সংগঠনের কথা বলা হল তা জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ফাঁক পূরণ করার জন্য কমক্যাকদের সামনে নানা ব্যবস্থা এনে দিয়েছে। এর মধ্যে তিনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ: ১) নিবিড় ক্ষেত্রভিত্তিক বাস্তুতন্ত্রের পাঠক্রম, ২) প্রেসকট কলেজে ও অন্যান্য গবেষকদের সঙ্গে চলমান শিক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ৩) অন্যান্য জনজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়।

পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে জ্ঞানের ধারা যাতে চলমান থাকে তার ওপর নজর রাখা হয়েছে। পরের প্রজন্ম যাতে জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারে এটাই উদ্দেশ্য। সার্বিক লক্ষ্য হল কমক্যাকদের এমনভাবে দক্ষ করে তোলা যাতে তারা গোষ্ঠীর দ্বারা নির্দিষ্ট অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং নিজেদের জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

উপসংহার

কমক্যাক তথা দুনিয়ার অন্যান্য জনজাতির সংস্কৃতিতে স্থানীয় বর্গীকরণ ব্যবস্থা প্রচলিত। এই ব্যবস্থার মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পার্থক্যের উপস্থিতির এক বিশাল ভাণ্ডার আছে। হাজার হাজার বছর ধরে এই প্রজ্ঞার ভান্ডার গড়ে উঠেছে। অথচ আজ বিস্তার ও বৈচিত্র্য—দু'দিক থেকেই তা ক্ষয় পাচ্ছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন পেশাদার বিদ্যায়তনিক বিজ্ঞান ও অপেশাদার বিজ্ঞানকে গুরুত্ব দেয় তেমনভাবে জনজাতিক বিজ্ঞানের প্রকৃত ও সম্ভাব্য মূল্যকে সম্মান দিতে হবে। অবহেলা করলে বিজ্ঞানের নানা উৎসের মধ্যে মিলনের সুযোগ হারিয়ে যাবে। সামগ্রিকভাবে মানব প্রজাতি এক হুমকির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি জাতি, সমাজ, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিরও একই বিপদ। এই পরিস্থিতিতে আমরা যদি সেই জ্ঞানের সন্ধান না করি, যা নিঃস্ব হয়ে আসা পৃথিবীতে এক সঞ্জীবনী সাড়া এনে দেবে, তা হবে আত্মঘাতী।

অনুবাদ: সজল রায়চৌধুরী

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, যুগ্ম সংখ্যা: ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ও সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০২০

তথ্যসূত্র:

[নিবন্ধটিতে বিপুল এক তথ্যসূত্রের সংকেত দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা প্রধান প্রধান গবেষণাগ্রন্থ ও নিবন্ধের উল্লেখ করছি]

১. Berkes F./Sacred Ecology (2012) Routledge.
২. Butt N. EPPs & others/Assessing Carbon stocks using indigenous peoples' Field measurement in Amazonian Ghyana (2015)
৩. Gorenflo L J and others/Co-oceurrence of Linguistic and Biological diversity in biodiversity hotspots (2011)
৪. Loh & Harmon/Biocuttural Diversity : Theatened Epecies, Endangered Langhages (2014)
৫. Nisbet M C and others/Frontiers in Ecology and Environment (2010)
৬. Rogers C. Campbell/Endangered Languages in Oxford Research Encyclopaedia of Lingustics (2015)
৭. Theobald E J, and others/Global change and Local Soleti cns : Tapping the unrealized potentisal of citizen science for biodiversity research (2015)

বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনা: কিছু উপাত্ত

আনদনি বাররেনা, ইতজিয়ার ইদিয়াজাবাল, পাতহি জুয়ারিস্তি,
কারমে জুনিয়েন্ট, পল ওরতেগা, বেলেন উরাঙ্গা

ভূমিকা

বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনা (দি ওয়ার্ল্ড ল্যাংগুয়েজেস রিভিউ)-র সূচনা ১৯৯০ দশকের শেষদিকে। বাস্ক সরকার ও ইউনেস্কোর মধ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে পারি শহরে সই হওয়া বোঝাপড়া-চুক্তির মধ্য দিয়ে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার পরিস্থিতি ও তাদের সমস্যা পর্যালোচনা করা এবং বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার বিপদের মুখে পড়া ভাষাগুলোর পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে নীতি প্রণয়নে সাহায্য করাই হল এই প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। অন্যভাবে বললে, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল বিবিধ ভাষার সামনে হাজির হওয়া সমস্যাগুলোকে তুলে ধরা যাতে বিশ্বের ভাষিক উত্তরাধিকার বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা যায়। জীবিত ভাষাগুলোকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেওয়াও এর অন্তর্গত। এই পর্যালোচনায় সঙ্কলিত কিছু উপাত্ত (data) এই লেখায় হাজির করা হচ্ছে।

বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনা

বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনা বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের নিজ ভাষার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংবাদ জোগাড় করার চেষ্টা করেছিল। সেই উদ্দেশ্য

নিয়ে চল্লিশটি প্রশ্নের একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছিল, অনেকগুলো প্রশ্নই ছিল এমন যা কোনো বিশেষ উত্তরের দিকে উত্তরদাতাকে ঠেলে দেয় না। এই প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়ে বিবিধ ভাষা ও সেই ভাষার বাচকগোষ্ঠীর চরিত্রাবলী সম্পর্কে উপাত্ত আহরণ করতে চাওয়া হয়েছিল, যেমন : সেই ভাষাগোষ্ঠীর নাম, বিবিধ ভাষা-ব্যবহার, বিবরণ ও ভাষার প্রতি মনোভাব। সমাজভাষাতত্ত্বে এখন সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য নির্ণায়ককাঠামো[১] অনুযায়ী এই প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছিল। এই প্রশ্নপত্রের অন্যতম গুণ হল যে তা উত্তরদাতাদের উত্তরদানের সময় অনেক স্বাধীনতা দেয়। উত্তরদাতারা যে তথ্যগুলোকে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে বোধ করেন, কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই সেগুলোকে তারা সামনে আনতে পারেন। একদিকে আমাদের ব্যবহৃত প্রশ্নাবলী ছিল এমন মুক্তকাঠামোবিশিষ্ট, অন্যদিকে, আমাদের উত্তরদাতারা ছিল বিবিধ রকমের (নানা সংগঠন, নানা ভাষাতাত্ত্বিক, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য, ইত্যাদি) এর ফলে সংকলিত বৈষয়িক উপাত্তের বিশ্লেষণ এবং উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে উঠে আসা ভাষাবাস্তবতার বর্ণনা নির্মাণ কঠিন ছিল। ২০০১ সালের মধ্যে হাজার জনের বেশি উত্তরদাতা স-উত্তর প্রশ্নপত্র ফেরত দিয়েছিলেন। মোট ৭২৫টি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর কাছে আমরা পৌঁছতে পেরেছিলাম। বিশ্লেষণের কাজ অবশ্য ২০০১-য়ের জুলাই মাসের মধ্যে ফেরত আসা উত্তরের থেকে চিহ্নিত করা ৫২৫-টি ভাষার একটি নমুনাক্ষেত্রের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। গোড়ায় ১০০টি ভাষা থেকে ও তার পরে ৪০০-টি ভাষা থেকে বিভিন্ন নমুনাক্ষেত্র তৈরি করে দেখে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছিল যে গোটা পর্যায় জুড়েই সাধারণ প্রবণতাগুলোর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।[২] বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনার প্রকৌশল সমিতি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার ভাষাগবেষক ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সভায় অংশগ্রহণ করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার পরিস্থিতি ও সমস্যার উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় :

- ১৯৯৯ সালের ৩ থেকে ৬ মার্চ বলিভিয়ার কোচাবাম্বায়;
- ১৯৯৯ সালের ১০ থেকে ১৬ মে কালমুকিয়ার এলিস্তায়;
- ১৯৯৯ সালের ১৪ থেকে ১৭ জুন বুরকিনা ফাসোর ওউয়াগাদোউগোউয়ে;
- ২০০০ সালের ৬ থেকে ১১ মার্চ ভারতের মাইসোরে;
- ২০০১ সালের ২৬ থেকে ২৮ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে।

এই সভাগুলোয় সংকলিত তথ্যাদির প্রতিতুলনা ও পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গবেষক, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। নির্ধারিত প্রশ্নপত্রটির উত্তর দিতে প্রস্তুত ভরসাযোগ্য উত্তরদাতাদের একটি বিশ্বজোড়া জাল তৈরি করা ছিল এই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক গুরুত্বের কাজ। বিবিধ উপায়ে এই জাল স্থাপন করা হয়েছিল, যেমন: প্রকল্পভুক্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর একটি গ্রন্থপঞ্জী ব্যবহারের মাধ্যমে; ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহ, ধর্মীয়গোষ্ঠী ও আদিবাসী জনজাতিদের সংগঠনসমূহের ঠিকানার উপাত্তনিচয়ের মাধ্যমে; ইত্যাদি।

৫২৫টি প্রশ্নোত্তর থেকে নির্বাচিত উপাত্ত

৫২৫টি নমুনা প্রশ্নোত্তর থেকে পাওয়া উপাত্তের বিশ্লেষণ কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় তুলে ধরে, যা আমরা এক এক করে নিচে আলোচনা করছি।

উত্তরদাতাগণ

প্রকৌশলী কমিটি প্রত্যক্ষ সংবাদ সংগ্রহ করতে সচেষ্ট ছিল, এবং প্রায়শই সে ব্যাপারে সফল হয়েছে। অর্থাৎ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিশ্চিত করা গেছে যাতে প্রাসঙ্গিক ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য বা সেই ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠজনেদের কাছ থেকেই তথ্য সংগৃহীত হয়। উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি (প্রায় ৬০ শতাংশ) ঘোষণা করেছিল তারা সেই ভাষাগোষ্ঠীরই সদস্য যে ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে তারা তথ্য দিচ্ছে। প্রায় ৪০ শতাংশ ঘোষণা করেছিল যে তারা ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য নয়, তবে তারা গবেষক হিসেবে বা অন্য কোনোভাবে এই ভাষাগোষ্ঠীর জন্য কাজ করছে। কিছু গবেষক অবশ্য তাদের কাজের সুবাদে বা সেই ভাষা নিজে শেখার সুবাদে ওই ভাষাগোষ্ঠীর অংশ হিসেবেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন।

কোনো ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্যজ্ঞাপক সেই গোষ্ঠীরই সদস্য হওয়ার আনুপাতিক হার যথাসম্ভব বেশি থাকা আমাদের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তা তথ্যজ্ঞাপনে বিষয়ীভাব যুক্ত করলেও এটা অনস্বীকার্য যে একটি ভাষাগোষ্ঠীকে তার নিজ সদস্যদের চেয়ে ভালোভাবে আর কেউ জানতে পারে না। ভাষাগোষ্ঠীর সদস্যদের অংশগ্রহণ তাই এই পর্যালোচনার বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্ত

করেনি, বরং এই পর্যালোচনাকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তা ছাড়া, এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য যেহেতু বৈশ্বিক ভাষিক সমরূপতার প্রবণতাকে উলটে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরি করা, তাই কোনো ভাষাগোষ্ঠীর সদস্যদের এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ নিজেদের ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের আরো ওয়াকিবহাল করে তুলে সে বিষয়ে কিছু করতে আরো দৃঢ়সংকল্প করে তোলে।

সরকারি মর্যাদা

কোনো ভাষার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গেলে বিচার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল এই প্রশ্নটি যে জাতীয় বা আঞ্চলিক স্তরে কোনো সরকারি বা আধা-সরকারি স্বীকৃতি বা মর্যাদা ভাষাটি পেয়েছে কিনা।

যে ভাষাগুলো সম্পর্কে তথ্য আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে:

- ২৮ শতাংশ ভাষা সরকারি বা আধা-সরকারি মর্যাদাপ্রাপ্ত,
- ৩৭ শতাংশ ভাষার কিছু স্বীকৃতি থাকলেও কোনো সরকারি/আধা-সরকারি মর্যাদা নেই,
- ২৮ শতাংশ ভাষার সরকারি/ আধা-সরকারি মর্যাদা তো দূরের কথা, কোনো স্বীকৃতিই নেই।

প্রারম্ভিক উপাত্ত থেকে খেয়াল করা যায় যে একটি ভাষার সরকারি মর্যাদা ও সেই ভাষার জীবনশক্তি সম্পর্কে তথ্যজ্ঞাপকের অভিমত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ফলত দেখা যায় যে সেই সমস্ত ভাষাগুলোই ক্রমশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে যারা কোনো সরকারি স্বীকৃতি পায়নি। উল্টোদিকে, যেসব ভাষার বাচকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের ৫৯ শতাংশ সরকারি মর্যাদা, আর ৪০ শতাংশ আধা-সরকারি মর্যাদা পেয়েছে।

ভাষাপ্রবাহ

ভাষার পারিবারিক প্রবাহ ঘটছে বলে বলা হয় যখন শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছ থেকে সেই ভাষা আহরণ করে। গোষ্ঠীগত ভাষা সংরক্ষণের সম্ভাবনা বিচার করতে গেলে এই পারিবারিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো সন্দেহ নেই যে

পারিবারিক প্রবাহে কোনো প্রকার ছেদ ভাষিক প্রতিস্থাপনের পথ করে দেয়, অর্থাৎ শিশুর মুখে পিতা-মাতার ভাষা অন্য কোনো ভাষা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। আর পারিবারিক প্রবাহে ছেদ যদি গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণভাবে বিরাজ করে, তাহলে গোটা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই ভাষা সরণ ঘটতে পারে।

ভাষার পারিবারিক প্রবাহ সংক্রান্ত উপাত্ত সরাসরি প্রশ্নের পিঠে উত্তরের ভিত্তিতে সংগ্রহ করে হয়েছে। সেই উপাত্ত অনুযায়ী :

- ভাষাগুলোর মধ্যে ৫৩ শতাংশের পারিবারিক প্রবাহ বজায় আছে,
- ৪৩ শতাংশের ক্ষেত্রে নিয়মিত পারিবারিক প্রবাহ বজায় নেই,
- ৪ শতাংশ তথ্যজ্ঞাপক এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি।

অর্থাৎ, বিশ্লেষণের আওতায় আসা ভাষাগুলোর মধ্যে মাত্র ৫৩ শতাংশের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যাপক প্রবাহ বজায় আছে। যাদের ক্ষেত্রে তা নেই, সেই ৪৩ শতাংশ ভাষাগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

এহেন ভাষাগোষ্ঠীদের ২৩ শতাংশের ক্ষেত্রে প্রবাহ বজায় থাকলেও অধিকতর সম্ভ্রম-আদায়কারী ভাষার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং কেবলমাত্র তুলনায় অভেদ্য একটি কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যেই ভাষা প্রবাহ প্রকৃত অর্থে বজায় আছে। ৮ শতাংশ ক্ষেত্রে কার্যত ভাষা প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেছে এবং ভাষা সরণ আসন্ন হয়ে উঠেছে। বাকি ১২ শতাংশের ক্ষেত্রে ভাষা প্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ এবং অবশিষ্ট শেষ কথকদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষাগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া যায়। এইভাবে ৪৩ শতাংশ ক্ষেত্রে যে বিবিধ মাত্রায় ভাষা প্রবাহের পথ রুদ্ধ হয়েছে, তা এক গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়।

এই আন্তঃপ্রজন্ম প্রবাহের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে কাজ করছে অপর সংস্কৃতি বা ভাষার চাপ, জনসরণ (প্রবাসন ও অভিবাসন) এবং মিশ্র বিবাহ। আরো কিছু কারণ এর সঙ্গে যুক্ত করা যায়, যেমন: সেই ভাষার প্রতি নঙর্থক মনোভাব যা চারপাশের অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা ব্যক্ত হতে পারে, আবার স্বয়ং সেই ভাষার বাচকদের দ্বারাও ব্যক্ত হতে পারে।

বিবিধ ভাষার আন্তঃপ্রজন্ম প্রবাহ সংক্রান্ত উপাত্তের পাশাপাশি আন্তঃপ্রজন্ম ভাষা ব্যবহারকেও বিচারের মধ্যে নিয়ে আসা কার্যকরী হতে পারে। পূর্বধারণা

হিসেবে বলা যেতে পারে, যে ভাষাগোষ্ঠীগুলোয় ভাষা প্রবাহ পুরোপুরি বজায় আছে, সেখানে বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে পার্থক্য ঘটে না; কিন্তু যে ভাষাগোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে ভাষা প্রবাহে ছেদ ঘটতে শুরু করেছে, সেখানে বয়স্কতর প্রজন্মের তুলনায় তরুণতর প্রজন্মে ভাষা ব্যবহারে ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে, যা সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা প্রতিস্থাপনের প্রবণতাকে প্রকাশ করে।

বিশ্লেষণের আওতায় আসা ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে, সেই গোষ্ঠীর নিজ ভাষায় কথা বলার হার এইরকম :

- বৃদ্ধতর প্রজন্মের ৬৫শতাংশ গোষ্ঠীর নিজ ভাষায় কথা বলে,
- প্রাপ্তবয়স্ক প্রজন্মের ৫৪ শতাংশ তা করে,
- তরুণ প্রজন্মের ৩৬ শতাংশ তা করে,
- শিশুদের ৩৮ শতাংশ তা করে।

অর্থাৎ, তরুণ ও শিশুদের প্রজন্মের চেয়ে বৃদ্ধতর ও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রজন্মে শতাংশ হিসেবে ভাষা ব্যবহার অনেক বেশি। অবশ্য, আমরা যদি আন্তঃপ্রজন্ম প্রবাহের উপাত্তের সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের উপাত্তকে তুলনা করি, কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। যদিও ৫৩ শতাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রবাহ ও ২৩ শতাংশ ক্ষেত্রে কিছু বাধা সহ আংশিক প্রবাহ বজায় আছে, তরুণ প্রজন্মদের মধ্যে এই প্রবাহ ক্ষীণতর হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যায় যেহেতু তরুণতর প্রজন্মদের মধ্যে মাত্র ৩৬ শতাংশই নিজ গোষ্ঠীর ভাষা সাধারণত ব্যবহার করে থাকে।

আন্তঃপ্রজন্ম ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য খেয়াল করা যায়নি।

এই প্রতিবেদনে হাজির করা উপাত্ত ভাষাবৈচিত্র্য ক্ষয়ের প্রবণতাকে দেখায় বলে মনে হয়। বহু লেখক তাঁদের লেখায় এই প্রবণতার পূর্বসংকেত দিয়েছেন।[৩]

বিলোপের বিপদ এবং ভাষার মৃত্যু

তথ্যজ্ঞাপকদের বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্লেষণের আওতায় আসা ভাষাগুলোর ৪২ শতাংশ গোটা বিশ্বে সমীক্ষীকৃত অঞ্চলের বেশির ভাগ জায়গায় বিলোপের বিপদের মুখে আছে, ২ শতাংশ কিছু অঞ্চলে বিলোপের মুখে আছে, আর

অন্যদিকে, ৪৫ শতাংশ ভাষা এমন কোনো বিপদের মুখে নেই। | তথ্যজ্ঞাপকরা ভাষাবিলোপের বিপদের মাত্রা নজরে আনার ক্ষেত্রে এ বিষয় নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিকদের[৪] মতো অত নির্দিষ্ট করে না বললেও, বিশেষ বিশেষ ভাষাকে বিলুপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া প্রক্রিয়া ও প্রবণতাগুলো সম্পর্কে বলেছেন। বিলোপের বিপদ ডেকে আনা কারণগুলো তথ্যজ্ঞাপকদের মতে এইরকম :

কারণ	পৌনঃপুন্য	শতাংশ
ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের প্রাণসংশয়ের পরিবেশ (গণহত্যা, যুদ্ধ, সেনাভিযান, ইত্যাদি)	১১	২.৮
জনসরণ (ভিটেমাটির উপর মালিকানার অভাব, দেশান্তরীকরণ, প্রবাসন, প্রব্রজন, ইত্যাদি)	৩৬	৯.৫
অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধীনতা (অপর ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব, উপনিবেশন, অর্থনৈতিক অধীনতা, ধর্মীয় প্রভাব, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, আত্তীকরণ, ইত্যাদি)	১৫২	৩৯.৭
প্রত্যক্ষ ভাষিক বৈষম্য (ভাষিক অধিকারের স্বীকৃতির অনুপস্থিতি, স্কুলে স্ব ভাষার অনুপস্থিতি, স্কুলের অবদমন, ইত্যাদি)	৩৪	৮.৯
নঙর্থক মনোভাব (বাচকের স্বল্পতা, ভাষার প্রতি বাচকের নঙর্থক মনোভাব, ইত্যাদি)	৪২	১১
অন্য কোনো কারণ	১০৬	২৭.৮

তথ্যজ্ঞাপকদের কথার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উঠে এসেছে অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নঙর্থক মনোভাব। এতদসত্ত্বেও, অন্য উঠে আসা কারণগুলোও খেয়ালে রাখা জরুরি, বিশেষ করে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা, জনসরণ, প্রত্যক্ষ ভাষিক বৈষম্যের মতো কারণগুলো সম্পর্কেও সচেতন থাকা উচিত।

তথ্যজ্ঞাপকদের নির্ধারিত করা ভাষাবিলোপের বিপদের মূল কারণকে যদি আমরা মহাদেশের ভিত্তিতে ভাগ করে দেখি, তাহলে এমন একটি বর্গীকরণ করা যায় :

মহাদেশ	ভাষাবিলোপের বিপদের মূল কারণ
আমেরিকা	অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধীনতা এবং নঙর্থক মনোভাব
আফ্রিকা	অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধীনতা এবং প্রত্যক্ষ ভাষিক বৈষম্য
ইউরোপ	অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধীনতা
এশিয়া	অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধীনতা
প্রশান্ত সাগরীয় অঞ্চল	জনসরণ এবং অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অধীনতা

ভাষাবাচকদের মনোভাব

ব্যক্তিমানুষ বা জনগোষ্ঠী, তাদের ভাষা এবং অপর ভাষার মধ্যে সম্পর্কসমূহ থেকে উঠে আসা অনুভব, ধারণা, বোধ, সংবেদনের গোটা বর্ণালীকে ভাষিক মনোভাব বলা হয়।

প্রশ্নপত্রে ভাষিক মনোভাব বিষয়ে দুটি প্রত্যক্ষ প্রশ্ন রাখা হয়েছিল একটি ছিল জনগোষ্ঠীদের সদস্যদের নিজেদের ভাষা সম্পর্কে মনোভাব নিয়ে, আর অন্যটি ছিল সেই ভাষা সম্পর্কে আশপাশের অন্য জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মনোভাব নিয়ে। এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের ভিত্তিতে তথ্যজ্ঞাপকের ভাষিক গোষ্ঠীর নিজ ভাষা ও চারদিকের অপর ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে মনোভাবের এইরকম একটা ক্রম প্রতিষ্ঠা করা গেছে :

- সদর্থক মনোভাব;
- উদাসীনতা বা অনপেক্ষ মনোভাব;
- নঙর্থক মনোভাব;
- অস্বচ্ছ মনোভাব;
- অন্য কোনো ধরনের মনোভাব।

সংকলিত উপাত্ত অনুযায়ী, একটি ভাষা সম্পর্কে সেই ভাষাগোষ্ঠীর ভিতরের বাচকদের ৬১ শতাংশের সদর্থক মনোভাব আছে, কিন্তু চারপাশের অপর ভাষাগোষ্ঠীদের মাত্র ৩৩ শতাংশের সদর্থক মনোভাব আছে। তাছাড়া, একটি ভাষা নিয়ে সেই ভাষাগোষ্ঠীর বাচকদের ৬ শতাংশের এবং চারপাশের অপর ভাষাগোষ্ঠীদের ১৭ শতাংশের উদাসীনতা বা অনপেক্ষ মনোভাব আছে। যে সমস্ত উত্তরে উত্তরদাতারা নিজগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে উদাসীনতা বা বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিবরণ দিতে অস্বীকার করে কেবল ভাষাবাচকতা উল্লেখ করেছে, সেইগুলোকে 'উদাসীনতা বা অনপেক্ষ মনোভাব'-য়ের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে।

নঙর্থক মনোভাবের প্রকাশগুলো এইরকম: তরুণরা অন্য ভাষা পছন্দ করে, নিজেদের ভাষা সম্পর্কে তাদের তেমন কোনো সহানুভূতি নেই, নিজেদের ভাষা সম্পর্কে তারা লজ্জিত, অথবা নিজেদের ভাষা বলতে তারা ভয় পায়। নমুনাক্ষেত্রে একটি ভাষা সম্পর্কে তার ভাষাগোষ্ঠীর সদস্যদের ভিতরে ১০ শতাংশ ও চারপাশের অপর ভাষাগোষ্ঠীদের ২০ শতাংশ নঙর্থক মনোভাব দেখিয়েছে।

এমন কিছু গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা গেছে, যাদের আচরণ তাদের জ্ঞাপিত মনোভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। এখানে আমরা শুধু সেই ক্ষেত্রগুলোকেই চিহ্নিত করছি যা এই অসঙ্গতিকে উত্তরদানে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেছে, যদিও অন্যান্য উপাত্ত ধরে বিচার করলে এই অসঙ্গতি আরও অনেক বেশি ঘটেছে বলেই দেখা যাবে। এই ক্ষেত্রগুলোকে আমরা 'অস্বচ্ছ মনোভাব' বলে চিহ্নিত করেছি, যেখানে একটি ভাষার নিজ ভাষাগোষ্ঠীর ১০ শতাংশ এবং চারপাশের অপর ভাষাগোষ্ঠীর ৪ শতাংশ পড়েছে।

ভাষানীতি এবং পরিকল্পক সংগঠন।

এই সমীক্ষায় যাদের উপাত্ত বিশ্লেষিত হয়েছে এমন বহু ভাষিক জনগোষ্ঠীর এমন সংগঠন আছে যা ভাষা পরিকল্পনা ও ভাষানীতি তৈরির কাজ করছে। ভাষিক জনগোষ্ঠীগুলোর ৬১ শতাংশের কোনো না কোনো ভাষিক সংগঠন আছে, যা হয়তো দেখায় যে তাদের মধ্যে ভাষা পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা মাত্রায় সচেতনতা আছে।

এই ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব এবং গোষ্ঠীর ভাষার প্রসার অথবা সংকোচন বিষয়ে তথ্যজ্ঞাপকদের ধারণা— এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কটিকেও বিচার করা হয়েছে। তা থেকে দেখা গেছে যে কোনো সংগঠন নেই এমন ভাষিক জনগোষ্ঠীর তুলনায় সংগঠন আছে এমন জনগোষ্ঠীর ভাষাপরিস্থিতির অবনতি বা ভাষা সংকোচনের শতাংশে হার কম। কোনো ভাষা পরিকল্পনার প্রয়াস নেই এমন ভাষিক জনগোষ্ঠীগুলোর ৪০ শতাংশের বাচকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, ভাষা পরিকল্পনার প্রয়াস আছে এমন ভাষিক জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে এই হার ৩০ শতাংশ। এই ধরনের সংগঠনের উপস্থিতি সেই জনগোষ্ঠীর ভাষার ভবিষ্যৎ ধারাবাহিকতার নিশ্চিতি নিশ্চয়ই দেয় না, তবে, এই ধরনের সংগঠনের অনুপস্থিতি নিশ্চিতভাবেই ভাষার অবনতির বিপদকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। ভাষা পরিকল্পনার এমন সংগঠনগুলোকে উৎসাহিত করা ও টিকিয়ে রাখা স্পষ্টতই খুব জরুরি।

শিক্ষায় ভাষার ব্যবহার

তথ্যজ্ঞাপকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৬০ শতাংশ ভাষা কোনো না কোনোভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্যবহারের মাত্রা অবশ্য বিভিন্ন :

- ১ শতাংশ শিক্ষায় উপস্থিত থাকলেও তার ব্যবহার অনির্দিষ্ট;
- ৭ শতাংশ কেবল মৌখিকভাবে ব্যবহৃত হয়, অন্য কোনো ভাষা মাধ্যমে শিক্ষাকে পড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে;
- ৮ শতাংশ একটি বিষয় রূপে পড়ানো হয় (দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে);
- ২৬ শতাংশ কেবলমাত্র প্রাক-স্কুল বা স্কুলের প্রথমদিকের বছরগুলোয় উপস্থিত;
- ১৩ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষায় বিস্তৃতভাবে উপস্থিত, মধ্যশিক্ষায় আংশিকভাবে বেশ কিছু সমস্যা সহ উপস্থিত;
- ১২ শতাংশ গোটা স্কুলব্যবস্থায় আগাগোড়া উপস্থিত, কিন্তু জনগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বত্র উপস্থিত নয়;
- ৩৩ শতাংশ ভাষা কোনোভাবেই পড়ানোয় ব্যবহার করা হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে ভাষার প্রসার অথবা অবনতি/ সংকোচনকে তুলনা করলে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত অধিকাংশ ভাষাই

এমন যাদের ভাষিক পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে ভালো বলে ধরা হয়। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা জরুরি যে কেবলমাত্র স্কুলই কোনো ভাষার পুনরুজ্জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বস্তুত, আমাদের তথ্যজ্ঞাপকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় ব্যবহৃত ভাষাগুলোর ২৮ শতাংশের ভাষিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে আর শিক্ষার কোনো স্তরেই ব্যবহৃত হয় না এমন ভাষাগুলোর ২৭ শতাংশ তাদের ভাষা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পেরেছে। সুতরাং, একটি ভাষার ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এইটিই ভাষাগুলোকে টিকে থাকতে সাহায্য করার জন্য ভূমিকাগ্রহণের একমাত্র ক্ষেত্র নয়।

সংবাদমাধ্যম ও গণজ্ঞাপন মাধ্যমে ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে আমাদের উপাত্ত দেখায় যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে বেতারসম্প্রচারে (৪৩.৬ শতাংশ), তার থেকে কম সংবাদপত্রে (২৬.৫ শতাংশ), আর তারও চেয়ে কম দূরদর্শনে (২২.৯ শতাংশ)।

উপসংহার

বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনার নমুনাক্ষেত্র থেকে সংকলিত যে উপাত্ত এখানে হাজির করা হল, তা সাধারণ বিচারে দেখায় যে গোটা বিশ্বজুড়ে ভাষিক সমসত্ত্বায়নের প্রবণতা বলবান, আবার, এই আধিপত্যকারী প্রবণতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কিছু জায়মান প্রতিক্রিয়াও মাথা চাড়া দিচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়া দুই রূপ ধারণ করছে: কিছু জনগোষ্ঠী তাদের ভাষাকে পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে; আবার কিছু জনগোষ্ঠী যাদের ভাষা প্রবাহ এখনও বজায় আছে, তারা সব ধরনের সমসত্ত্বায়নের চাপকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে।

ভাষা মৃত্যুর বাস্তব বিপদ এবং সেই বিপদ প্রতিহত করার জন্য বিবিধ জনগোষ্ঠীর প্রয়াসকে বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনার বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। প্রশ্নপত্রের জবাব থেকে ভাষাসংরক্ষণের লড়াইয়ে নানা সৃজনশীল প্রয়াসের উদাহরণ পাওয়া যায়। নিজেদের ভাষা পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া ভাষিক জনগোষ্ঠীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে: জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও তার ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বকে সজাগ করার মাধ্যমে সাহায্য করতে পারে, আবার, নিজেদের ভাষার সহায় হতে জনগোষ্ঠীর দ্বারা ব্যবহারযোগ্য নানা পথের প্রচারের মধ্য দিয়েও সাহায্য করতে পারে।

ভাষার গতিপ্রক্রিয়াকে একটি বৈশ্বিক, বহুমাত্রিক ও বহুবিষয়-প্রভাবিত ঘটনা হিসেবে যে বোঝা জরুরি তা একটি সাধারণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। তাই দুর্বল হয়ে পড়া কোনো ভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বতঃক্রিয়াকে শিক্ষার মতো কিছু নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যে সীমায়িত রাখলে হবে না, এমনকি বিচ্ছিন্ন কোনো গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও নয়।

এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমরা আরেকটি বিষয়কে উঠে আসতে দেখছি, তা হল : প্রতিটি ভাষিক জনগোষ্ঠীর বস্তুগত পরিস্থিতি ছাড়াও তাদের ভাষিক মনোভাব ভাষাবৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহুক্ষেত্রেই, একটি ভাষাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার আগে, সেই ভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেই ভাষার প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। সেই জনগোষ্ঠীর চারপাশের অন্যান্য জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে যেখানে সেই পরিবেষ্টনকারী জনগোষ্ঠীগুলো ক্ষমতাবান ভাষার বাচক— যাতে তাদের মধ্যে মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত করা যায়।

বিপদগ্রস্ত ভাষার পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবন এমন একটি প্রক্রিয়া যা চারপাশের ও দূরের অপর জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক সহ গোষ্ঠীজীবনের প্রতিটি দিকের সঙ্গে জড়িত।

উচ্চতর বলয়গুলোয় (যেমন, জ্ঞাপনের যে বলয়গুলো কিছু রীতিমাফিক ব্যবহার দাবি করে, বিশেষত প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা প্রভাবিত বলয়গুলোয়) ভাষার ব্যবহার ভাষার প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনে জোরালো প্রভাব ফেলতে পারে যেহেতু তা ভাষার সামাজিক সম্মানকে বাড়ায়। অবশ্য, প্রাপ্ত তথ্য দেখাচ্ছে যে, উচ্চতর বলয় ও জনগোষ্ঠীর প্রতিটি স্তরে উভয়তই সহযোজিত স্বতঃক্রিয়া ভাষা সংরক্ষণের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় **ভাষান্তর: বিপ্লব নায়ক**

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০২২

টীকা/সূত্র

১. দ্রষ্টব্য : ই হগেন, *দি ইকলজি অফ ল্যাংগুয়েজ*, ক্যালিফোর্নিয়া, স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২।

২. সমীক্ষার প্রশ্নপত্র ও ৭২৫-টি ভাষার নাম ও অন্য বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন : http://amarauna-languages.com।

৩. ভাষাবৈচিত্র্য ক্ষয়ের পূর্বসংকেত দেওয়া লেখকদের কিছু উদাহরণ :

- এম ক্রাউস, দি ওয়ার্ল্ডস ল্যাংগুয়েজেস ইন ক্রাইসিস, *ল্যাংগুয়েজ* ৬৮(১), ৪-১০, ১৯৯২;
- বি কোমরি, এস ম্যাথিউজ এবং এম পোলিনস্কি, *দি অ্যাটলাস অফ ল্যাংগুয়েজেস*, নিউ ইয়র্ক, ফ্যাক্টস অন ফাইল ইনকরপোরেটেড, ১৯৯৬;
- সি জুনিয়েন্ট, *লা দাইভারসিদাদ লিংগুয়িসটিকা*, বারসেলোনা, অক্টায়েডরো, ১৯৯৯;
- সি হাগিজে, হল্টে আ লা মোর্ট দেস ল্যাংগুজ, পারি, ওদিল | জাকব, ২০০০।

৪. ভাষাবিলুপ্তির বিপদ নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনার কিছু নমুনা:

- এম ডি কিনকেড, দি ডিক্লাইন অফ নেটিভ ল্যাংগুয়েজেস ইন কানাডা, আর এইচ রবিনস এবং ই এম উহলেনবেক সম্পাদিত *এনডেনজারড ল্যাংগুয়েজেস*, অক্সফোর্ড : বের্গ, ১৯৯১;
- এম ক্রাউস, দি ওয়ার্ল্ডস ল্যাংগুয়েজেস ইন ক্রাইসিস, *ল্যাংগুয়েজ* ৬৮(১), ৪-১০, ১৯৯২;
- এস এ উর্ম, *অ্যাটলাস অফ দি ওয়ার্ল্ডর্স ল্যাংগুয়েজেস ইন ডেঞ্জার অফ ডিসঅ্যাপিয়ারিং*, পারি/কানবেরা, ইউনেসকো পাবলিশিং/ পেসিফিক লিংগুয়িসটিকস, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৬ দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০১;
- ডেভিড ক্রিস্টাল, *ল্যাংগুয়েজ ডেথ*, কেমব্রিজ : কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

লেখক পরিচিতি

- আনদনি বাররেনা : ইউনিভার্সিটি অফ সালামানকা-র অধ্যাপক। ভাষা আহরণ, দ্বিভাষিকতা ও ভাষাবৈচিত্র্য তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনার কেন্দ্রীয় বিষয়।
- ইতজিয়ার ইদিয়াজাবাল : ইউনিভার্সিটি অফ বাস্ক কান্ট্রি (UPV-EHU)-র অধ্যাপক। ভাষা আহরণ এবং দ্বিভাষিক পরিবেশে ভাষা শিক্ষা তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনার কেন্দ্রীয় বিষয়।

- পাতহি জুয়ারিস্তি : ইউনিভার্সিটি অফ বাস্ক কান্ট্রি (UPVEHU)-র অধ্যাপক। বিশ্বায়ন, বাস্ক সংস্কৃতি এবং বিশ্বের ভাষাসম্পদ তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনার কেন্দ্রীয় বিষয়।
- কারমে জুনিয়েন্ট : ইউনিভার্সিটি অফ বার্সেলোনার অধ্যাপিকা এবং 'Estudi de LlenguesAmenacades'-য়ের প্রেসিডেন্ট। ভাষাবৈচিত্র্য, আফ্রিকান স্টাডিজ, ভাষিক পরিকল্পনা এবং ভাষার জীবন ও মৃত্যু তাঁর গবেষণা ও প্রকাশনার কেন্দ্রীয় বিষয়।
- পল ওরতেগা : বাস্ক প্রদেশের Etxea-Unesco Centre-য়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর, বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনা প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি।
- বেলেন উরাঙ্গা : ভাষাতত্ত্বের গবেষক, বিশ্ব ভাষা পর্যালোচনার জন্য সংগঠিত সমীক্ষার কাজে কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

উৎস

- ডেনিস কানিংহ্যাম, ডি ই ইনগ্রাম ও কেনেথ সুমবুক সম্পাদিত 'ল্যাংগুয়েজ ডাইভার্সিটি ইন দি পেসিফিক : এনডেনজারমেন্ট অ্যান্ড সারভাইভাল' গ্রন্থে দ্বিতীয় অধ্যায় (পৃ. ১৫-২৩) হিসেবে এই লেখাটি সংকলিত হয়েছে। বইটি মাল্টিলিংগুয়াল ম্যাটারস থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

ভাষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু ভাবনা

সমীর কর্মকার

১ | শুরুর প্রশ্ন

ভারতের সাম্প্রতিকতম জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গক্রমে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান নিয়ে বেজায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে সওয়াল করা হয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসঙ্গে সমসাময়িক ভারতে যে সকলেই খুব একটা ঐক্যমত্যে রয়েছেন—তেমনটা নয়। আর এই অনৈক্যের মূলে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি এইরকম:

ক) কোন কোন মাতৃভাষার কথা ভাবা হচ্ছে?

খ) মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়টিকে ঠিকঠাক করে প্রযুক্ত করতে হলে যে যে পরিকাঠামোর দরকার সেই সেই পরিকাঠামোর আয়োজন আদৌ কি আছে কিছু? নাকি, পুরোটাই নতুন করে আয়োজন করতে হবে?

গ) মাতৃভাষায় শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টি কি স্তর সাপেক্ষ? নাকি, স্তর নির্বিশেষে সেটি প্রযুক্ত হবে?

ঘ) মাতৃভাষায় শিক্ষা ভারতের মতো বহুভাষিক একটা দেশে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে নাগরিকদের অধিকারকে সংকুচিত করবে নাতো?

ঙ) সর্বোপরি, ভারতের জাতীয় জীবনে সমানুভবের বোধটিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে ঠিক কীভাবে লালন করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নগুলি যে আমরা হঠাৎ করে বিগত দশ বছরে আবিষ্কার করেছি এমনটা নয়। একই প্রশ্ন ১৯৫৬-র ভাষা সংক্রান্ত কমিশনেও উত্থাপিত হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল, আচার্য সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি এবং চিন্তাবিদ পি সুব্বারায়ানের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও, ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন ১৯৬৫-র মধ্যে মাতৃভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলোর যথাযথ উন্নয়ন সাধন করে জাতি ও রাষ্ট্রের সুস্বাস্থ্য আগামী দিনগুলির জন্যে নিশ্চিত করতে পারবে। সেটা যে খুব একটা হয়ে ওঠেনি—তা ১৯৬৫-র কোঠারি কমিশনেও যেমন স্পষ্ট, ঠিক তেমনই জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-র প্রস্তাবনাতেও স্পষ্ট। এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা সহজ সাধ্য যে নয়—সেটাও স্পষ্ট। কিন্তু কেন সহজ সাধ্য নয়? সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটা জরুরি। নইলে যতই আমরা 'মাতৃভাষা', 'মাতৃভাষা' করে চেঁচাই না কেন—অবস্থার খুব একটা হেরফের হবে না। উগ্র ভাষাবাদ রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নিকৃষ্টতম মৌলবাদের জন্ম দিয়েই যাবে।

২| যন্ত্র বা সাধনীরূপী ভাষাসংক্রান্ত কিছু ভাবনা

১৯৫৬-র ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন, ভাষার কথ্য ও লেখ্য রূপকে সমাজের সংগঠন ও তার অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অপরিহার্য যন্ত্র বা সাধনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে (তুলনীয়, 'Language, oral and written, as an indispensable tool of social organization and progress')। এহেন এক যন্ত্র বা সাধনীর কর্মকৌশল নির্ধারণের জন্যে একটি কমিশনের কথা সংবিধানে বলা আছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৭ নম্বর ভাগের নিয়ম মেনেই সেই কমিশনের লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে 'the Commission shall have due regard to the industrial, cultural and scientific advancement of India, and the just claims and the interests of persons belonging to the non-Hindi speaking areas in regard to the public services'. লক্ষ্যণীয়, যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা, রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমন একটি যন্ত্র বা সাধনী—যার দ্বারা একটি দেশের আপামর জনগণের সামাজিক সংগঠন ও অগ্রগমনের বিষয়টি নির্ধারিত হয়।

ভাষাতত্ত্বের বা সাহিত্যের ভাষার থেকে অনেকাংশেই আলাদা অষ্টম তফশীলের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি। অষ্টম তফশীলের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি

দেশবাসীদের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সংগঠনে বিন্যস্ত করার সাধনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, এক্ষেত্রে বিন্যাসের অনুক্রমিক কাঠামোর (hierarchical structure) মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকা কর্তৃত্ব (dominance) ও ভ্রাতৃত্বের (fraternity) ধারণার মধ্যে দিয়েই প্রতিসৃত হয় রাষ্ট্রীয় পরিসরের সমস্ত রকমের ক্ষমতার বয়ানগুলি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রসঙ্গটি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক বিকাশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাটা তাই মূর্খতার সামিল। কারণ, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় বুদ্ধির চাষ আবাদ রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে নির্ধারিত এমন একটি বিষয়—যার সাথে জুড়ে রয়েছে অর্থনীতির প্রসঙ্গটুকুও। 'বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে' শীর্ষক প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেই সে কবেই বলে গিয়েছেন:

> পারিপার্শ্বিকের এই প্রতিকুল ও বিভ্রান্তিকর প্রভাবকে দূর না করা অবধি মাতৃভাষায় সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে না। অতএব উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে সচেতন প্রয়াস করতে হবে এবং সরকার-প্রণোদিত না হলে, সে প্রয়াস সার্থকও হবে না।

৩ | যন্ত্র বা সাধনীরূপী ভাষার সমস্যা

কোনো যন্ত্রের বা সাধনীর ব্যবহারে পারঙ্গমতা অর্জন করতে তার উদ্বর্তনের সমাজতত্ত্ব জানার প্রয়োজন পড়ে না। সাইকেল ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন মানে যেমন সাইকেলের গঠনগত জ্ঞান বা সাইকেলের বিবর্তনের ইতিহাস নয়, ঠিক তেমনিই রাষ্ট্রীয় পরিসরে যন্ত্ররূপ ভাষার ব্যবহার তার গঠনসৌকর্য সংক্রান্ত জ্ঞান বা ঐতিহাসিক বিবর্তন সাপেক্ষ বিষয় নয়। ভাষার গঠনকাঠামো বা তার বিবর্তনের ইতিহাসের ডাক পড়ে তখনই—যখন রাষ্ট্র ও জাতির স্বাস্থ্য বড়সড় রকমের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনস্থ বিভিন্ন জনজাতির মানুষের মাপজোখ করার কাজে ভাষা তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করে :

> The language data is particularly useful in the country having diverse people since no separate question is asked on their ethnicity except in respect of the scheduled tribes.
>
> (ভারতীয় জনগণনা রিপোর্ট, ২০১১)

বলার অপেক্ষা রাখেনা এহেন একটা পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী আসলে এমন একটি কাঁচা মাল যার থেকে তৈরি হবে একজন ভবিষ্যতের ভারতীয়। আর এই তৈরি করার কাজে যেমন জরুরি মাল মশলা, ঠিক তেমনই প্রয়োজন ছেনি, হাতুড়ি, কর্ণিকের মতো যন্ত্রপাতি। ভাষা এক্ষেত্রে ছেনি হাতুড়ির মতো সাধনীগুলির সাথে তুলনীয়। শিক্ষানীতিতে তাই (মাতৃ)ভাষার এতটাই গুরুত্ব।

শিক্ষার্থীর নির্মিতিতে ইতিহাস আর সমাজকে মাতৃভাষায় শিক্ষা ঠিক ততদিন অব্দি জুড়তে পারবে না, যতদিন পর্যন্ত ভাষা যন্ত্ররূপে বিবেচিত হবে। সাধনীরূপী ভাষা বহিরাঙ্গের পার্থক্যকে অতিক্রম করে ভাবের বা অন্তরের ঐক্যকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে না। কারণ, যন্ত্ররূপী ভাষা সরকারি দপ্তরে, আদালত বা কাছারির চত্বরে, জ্ঞাপনের পরিসরে কেতাদুরস্ত হয়ে উঠলেও, ক্রমশ হারাচ্ছে সেই সকল সংলগ্নতা যা বিবিধের মধ্যে মিলনের মহানুভবতাকে মহিমান্বিত করার পক্ষে সদর্থক একটা ভূমিকা নিতে পারত। প্রশাসনিক স্বার্থে রাষ্ট্রের কারবারিরা ভাষার স্বকীয়তাকে ব্যবহার করেছেন জমি জরিপের কাজে—যার স্বীকৃতি ১৯৫৫-র স্টেট রি-অরগানাইজেশন কমিশনের রিপোর্টেও দেখতে পাই :

> ...progressive public opinion in India, ..., crystallised in favour of rationalisation of administrative units, the objective was conceived and sought in terms of linguistically homogeneous units.

এতে করে ভাগাভাগির তরজাই কেবল বেড়েছে। উচ্চারিত হয়েছে অমোঘ উপলব্ধি : 'language was not only a binding force but also a separating one'. অঞ্চলগুলির পুনর্গঠনে ভাষার ভূমিকাও পক্ষপাতদুষ্ট। ভারতীয়-আর্য ও দ্রাবিড়িয় বর্গের ভাষাগুলির দাপট একটা দীর্ঘ সময় ধরে আড়াল করে দিয়েছিল অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও কিরাত বর্গের ভাষাগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নগুলিকে। অথচ এই ভাষা বর্গগুলিই দেশের অনুভূতি প্রবণ অঞ্চলগুলিতে বিন্যস্ত। সার্বিক প্রগতির লক্ষ্যে, মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এই সকল বর্গের মানুষগুলিকে ভাষিক পরিচিতের প্রশ্নে উৎসাহিতই করবে—এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু, রাষ্ট্রের আবার এই স্বল্প পরিচিত ভাষাগুলোকে নিয়ে খুব একটা

মাথাব্যথাও নেই। মাতৃভাষা বলতে আসলে সংবিধানের অষ্টম তফশীলের ২২টি ভাষাকেই বলা হচ্ছে—যার সংখ্যাগরিষ্ঠই ভারতীয়-আর্য এবং দ্রাবিড়ীয়।

১৯১১-র জনগণনা অনুসারে, ভারতীয় ভাষার প্রাপ্ত বুলি সংখ্যা ১৯৫৬৯। এই বিপুল সংখ্যক বুলিকে ঝাড়াই বাছাই করে ১২১টি ভাষাকে চিহ্নিত করা হয়েছে—যার মধ্যে ২২টি ভাষা অষ্টম তফশীলভুক্ত। ভারতীয় শিক্ষানীতির সাম্প্রতিকতম রূপরেখা অনুযায়ী, মাতৃভাষায় যদি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে উদ্যোগী হতে হয় তাহলে ঠিক কত সংখ্যক ভাষারূপের কথা নিয়ে ভাবব সেটা একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন। আমরা কি তবে ১৯৫৬৯টি বুলিতেই শিক্ষার আয়োজন করছি? নাকি ১২১টিতে? বলার অপেক্ষা রাখে না, এই বিপুল ভাষা বৈচিত্র্যের দেশে, অষ্টম তফশীলভুক্ত ২২টি ভাষাতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আমরা যথাযথভাবে করে উঠতে পারিনি—স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও। রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ইংরেজিতে যেটি National Council of Educational Research and Training নামে পরিচিত, সাকুল্যে তিনটি ভাষায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর অব্দি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে থাকে। এবং এই তিনটি ভাষা হল, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দু। বিষয়ভিত্তিক ত্রিভাষিক শব্দকোষগুলিও—যা সংখ্যায় খুবই অপ্রতুল—ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে প্রকাশিত। যেখানে তামিল বা বাংলার মতো বৃহৎ ও জাতিসত্তার প্রশ্নে ক্ষমতাধর ভাষাগুলিরই ঠাঁই নেই, সেখানে অ-তফশীলভুক্ত ভাষাগুলির ব্যবস্থা যে খুব তাড়াতাড়ি করে উঠতে পারা যাবে—এমন আশা করাটা বাতুলতা। তাই কিছু সদর্থক পদক্ষেপের কথা ভাবা হয়েছে—যার ফলে প্রাথমিকভাবে সমস্ত তফশীলভুক্ত ভাষায় সর্বস্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার কাজটি সাঙ্গ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এমতাবস্থায়, 'গৌণ' এবং 'উপেক্ষিত' মাতৃভাষাগুলির কি পরিণতি হতে চলেছে—সে নিয়ে আদৌ কোনো ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

৪ | অ-তফশীলভুক্ত ভাষা

ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রসঙ্গে কেবলমাত্র অষ্টম তফশীলের অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির কথা ভেবে এসেছে। এর বাইরে আরও অসংখ্য ভাষাভাষী মানুষ আছেন, যাঁরা উপেক্ষিত। কমিশনের লোকজন যত বেশি চিন্তিত মৈথিলি,

বাঘেলি বা ভোজপুরি নিয়ে, তার কণার কণা চিন্তাও মেছ, খোট্টা, শেরসাবাদী, টোটো বা ভূমিজকে নিয়ে দেখি না। ভোটবাক্সের গণতন্ত্র যেহেতু সংখ্যা সাপেক্ষ একটি বিষয়, সেহেতু ভাষাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সংখ্যার অধিকারী হতে না পারলে এই কাঠামোতে বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারা আদৌ সম্ভব নয়। ফলত শত অসুবিধে সত্ত্বেও এই সকল স্বল্প পরিচিত সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর লোকজনদের অষ্টম তফশীলভুক্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান যে সকলের ক্ষেত্রেই বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়ক হবে—তেমনটা আদৌ নয়।

পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা যে একমাত্র সমস্যা এমনটা নয়। ভারতের বহুভাষিক চরিত্র অটুট রয়েছে শ্রেণিকক্ষের মধ্যেও—বিশেষত সেই সকল প্রান্তরে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। উদাহরণস্বরূপ, উত্তরবঙ্গের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে তিন চারটি ভাষার ছাত্রছাত্রী একই শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকেন। সেই ভাষাগুলির কেউ কেউ অষ্টম তফশীলভুক্ত—আবার কারুর কারুর কোনো স্বীকৃতিই নেই। এই ধরনের শ্রেণিকক্ষগুলিতে পঠন পাঠনের জন্যে কোন কোন ভাষা ব্যবহৃত হবে—সে সংক্রান্ত ভাবনা চিন্তার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। শিক্ষার্থীকে যেমন তার আঞ্চলিক ও লোকায়তিক পরিসরের সাথে যুক্ত করতে হবে, ঠিক তেমনি আবার সর্বজনীন এবং জাতীয় লক্ষ্য সম্বন্ধেও অবগত করাতে হবে। আর এই ব্যাপারে, খুব সংগতভাবে দায় এসে বর্তাবে শিক্ষাকর্মীদের উপর। শিক্ষাকর্মীদেরও তাই প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে। বরং, বলা ভালো, এই প্রস্তুতি পর্বের একটা গুরু দায়িত্ব রয়েছে শিক্ষাকর্মীদের। দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন থেকে শুরু করে একের অধিক ভাষাকে পাঠদানের প্রক্রিয়ায় কীভাবে জুড়ে নেওয়া যেতে পারে—সে সংক্রান্ত ভাবনায় এবং তার সদর্থক প্রয়োগে শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং ভাষিকগোষ্ঠীকে দেশ ও জাতির নির্মাণে যুক্ত করার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য তা ১৯৫৬-র ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনেও উল্লখিত রয়েছে। তবে এই সংযুক্তির বিষয়টি যদি কেবল মাতৃভাষায় পুস্তক প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে অবস্থার বিশেষ কোনো হেরফের হবে বলে মনে হয় না। কারণ, ছাপাইখানার প্রযুক্তি দিয়ে

খুব বেশি হলে অষ্টম তফশীলের ২২টি ভাষাকে ধরা যেতে পারে। বাকিদের সংযোজনের বিষয়টি সেক্ষেত্রে অবহেলিতই রয়ে যাবে। তবে, পঠন পাঠনের মাধ্যম হিসেবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাকর্মীরা ভাষার যে কথ্যরূপগুলি ব্যবহার করেন, তাতে যদি আঞ্চলিক কথ্যরূপগুলির স্থান সংকুলান করা যায় তাহলে হয়তো সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে বলে মনে হয়। অর্থাৎ, পাঠের সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে বিনিময় চলে সেই বিনিময়গুলো আঞ্চলিক লোকজ ভাষায় সম্ভব কিনা, সেই নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে।

৫ | ভাষানীতি ও ভাষাবিরোধ : রাষ্ট্রের নখ-দাঁত

মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করলেও, মোটের উপর তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ : একদল যখন ইংরেজির অপরিহার্যতাকে মনে করিয়ে দিতে চান, অন্যদল তখন অষ্টম তফশীলের ভাষাগুলোর গুরুত্ব বোঝাতে বদ্ধপরিকর। আরও একদল আঞ্চলিক সংখ্যালঘু লোকজ ভাষাগুলির অধিকার নিয়ে চিন্তিত। বলাই বাহুল্য, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে সকল ভাষার জন্যে সমান আয়োজন নেই। ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দি তথা অন্যান্য আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা সমেত অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ক্রিয়ার সম্পাদনে, খোদ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জির বক্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ্য :

> We want English, particularly people in the non-Hindi areas, because we love our own languages; and we want our languages to benefit to the fullest by the best minds of the peoples speaking them being provided with an easy access to the original sources of knowledge through English.

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বন্দনার দোহাই পেড়ে, এই সব বলার আরও বহু আগে, সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের কথা মনে রেখে, সেই ১৯৩৫-এ 'A Roman Alphabet for India'-য়, পারসিক-আরবীয় বা দেবনাগরীয় লিপির পরিবর্তে রোমীয় লিপির স্বপক্ষে জোর সওয়াল করছেন। সুনীতিবাবুর ১৯৫৬-র অবস্থানকে বুঝতে ১৯৩৫-এর দিকে ফিরে দেখতেই হবে : হিন্দির বিরুদ্ধে ভারতীয় ভূখণ্ডের ভাষাবৈচিত্র্যের স্বপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি বলছেন :

> It is doubtful whether Hindustani (Hindi) will ever be able to supplement English entirely as English is now not a mere national language—it has become international, the unique vehicle of World culture.

সুনীতিবাবু অবশ্য ১৯৩৫-এ সর্বভারতীয়ক্ষেত্রে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দির যে একটা গুরুত্ব আছে সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন না। এতে করে অবশ্য রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোতে ভাষিক কর্তৃত্ববাদের বিষয়টিকে খুব একটা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল—এমনটা নয়। বরং, কর্তৃত্বের হাত বদল হবে কি হবে না এই নিয়েই চলেছিল মান-অভিমানের পর্ব। এতে করে আঞ্চলিক ভাষাদের এবং সেই ভাষায় কথা বলা মানুষগুলির প্রতি কোনো ন্যায়বিচার সেদিন করা হয়নি।

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষা আর জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকাকে আলাদা করে দেখার এই প্রয়াস বেশ উল্লেখযোগ্য। জাতি এবং রাষ্ট্রের প্রশ্নে যে ভাষা যোগাযোগের মতো একটা আঠালো বিষয়ের মতো কাজ করে সেই একই ভাষা কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারেও দারোয়ানের মতো কাজ করে। এ ভাষা চমস্কি বা বাইগতস্কির ভাষা নয়। এই ভাষার দাঁত ও নখ আছে।

'মাতৃভাষা' পত্রিকা, যুগ্ম সংখ্যা: নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ও দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০২৩